শ্রীশ্রীবিজয়-কথামৃত

বা

শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদের জীবনবৃত্ত।

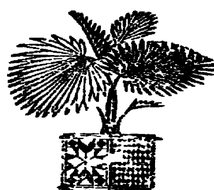
(দ্বিতীয় খণ্ড)

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী ;
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী।"
শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতম্। (ম, লী, ২২শ পরিচ্ছেদ)

শ্রীনবকুমার বাগচি (বিশ্বাস)
প্রণীত।

মূল্য- { কাপড়ে বাঁধাই দুই টাকা
কাগজে বাঁধাই দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৮নং রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা



কলিকাতা
২নং বেথুন রো, ভারত-মিহির যন্ত্রে,
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত।

নিবেদন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীশ্রীবিজয়কথামৃতের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। আমি যে সকল ঘটনা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল। আমার বিশ্বাস প্রভুপাদের জীবনের অনেক ঘটনা অজ্ঞাত রহিয়া গেল। যদি কখন তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও দিয়া প্রকাশ করান তবেই সে সকল ঘটনা সাধারণের গোচর হইবে।

প্রথমতঃ আমি ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলাম মাত্র, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারি নাই। শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ ঘোষ (পান্নালাল ঘোষ) আমার নিকট শুনিয়া এবং আমার সংগৃহীত খাতা-পত্র দেখিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম করতঃ ঘটনাবলী আদ্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ আছি।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জানাইতেছি যে, আমি এই গ্রন্থের লেখক নহি, মাত্র ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। ঘটনাবলী সংগ্রহ করার পরে শ্রদ্ধেয় শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ও অন্যান্য সতীর্থ্য বন্ধুগণ কোন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা তাহা সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী আমি তাহা প্রথমে শ্রদ্ধেয় সতীর্থ্য ৺কুঞ্জলাল নাগ এম্, এ, মহাশয়কে ও তৎপরে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়কে অর্পণ করিয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যানুরোধে তাঁহারা উক্ত বিষয় সম্পাদন করিতে পারিলেন না। এইরূপে প্রায় ৩।৪ বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল। তৎপরে শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্, এ, মহাশয়কে এই কার্য্যের জন্য অনুরোধ করাতে তিনি ইহার ভার গ্রহণ করিলেন।

তিনি বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করতঃ এই গ্রন্থ লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি সরলহৃদয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ আছি। ইহা পাঠ করিয়া যদি কেহ উপকৃত হন তবে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

অবশেষে বক্তব্য এই যে আমি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই সমস্ত ঘটনাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। ইহাতে অনুরোধ বা উপরোধ নাই। সত্য প্রকাশ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। অলমিতি।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৩৬।

বিনয়াবনত
শ্রীনবকুমার বাগচি (বিশ্বাস)।

মঙ্গলাচরণম্।

বন্দে স্বর্ণময়ীসুতং শরণদং শ্রীকর্ণধারং গুরুং
দুষ্কৃত্যেন সদা মমাব্ধিপতিতস্যাহো হতাহঙ্কৃতেঃ।
যস্যেয়ং করুণানদী সুবিমলা যাত্যেব নীচং প্রতি
ধাম্নি স্বে সততে চিদাত্মকপরানন্দে পরং রাজতঃ॥

টীকা।

গুরুং বন্দে প্রণমামি অহমিতি শেষঃ। কীদৃশং স্বর্ণময়ীসুতং শরণম্ আশ্রয়ং দদাতি যঃ তথাভূতং মম শ্রীকর্ণধারং কীদৃশস্য মম সদা দুষ্কৃত্যেন দুষ্কর্ম্মণা হেতুনা অব্ধৌ ভবসাগরে পতিতস্য অহো খেদে হতা বিনাশিতা অহঙ্কৃতিঃ পাণ্ডিত্যাদ্যভিমানঃ যস্য স তথাভূতস্য। যস্য শ্রীগুরোঃ ইয়ং প্রসিদ্ধা করুণানদী কৃপাতরঙ্গিণী কীদৃশী সুবিমলা অতিনির্ম্মলা পুরুষকারনিরপেক্ষা ইতি যাবৎ নীচম্ অধমং ব্রহ্মচর্য্যদয়াদাক্ষিণ্যাদিবিরহিতমিতি যাবৎ প্রতি তস্য পাবনায় ইত্যর্থঃ যাতি প্রবহতি। শ্রীগুরোঃ কীদৃশস্য সততে নিত্যে চিদাত্মকপরানন্দে সচ্চিদানন্দে ইত্যর্থঃ স্বে ধাম্নি স্বরূপে অন্তরঙ্গস্বরূপশক্তৌ পরং নিতরাং রাজতঃ দেদীপ্যমানস্য বহিরঙ্গাং মায়ামতিক্রম্য নিরুপাধি বর্ত্তমানস্যেত্যর্থঃ।

ভাবানুবাদ।

পূরব দুষ্কৃতিফলে পড়িয়াছি ভবজলে
চূর্ণ মোর যত অহঙ্কার,
শ্রীগুরু কর্ণধার তাঁহা বিনা নাহি আর
এ অধমে করিবারে পার।

যাঁর দয়াতরঙ্গিণী পতিত-উদ্ধারিণী
নাহি করে দোষের বিচার ;
সচ্চিদানন্দধাম আশ্রিতের প্রাণারাম
বন্দোঁ স্বর্ণময়ীর কুমার ।

কস্যচিদ্ দীনস্য ।

সূচীপত্র ।



প্রভুপাদ শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(যোগাসীন মাধর্য্য মূর্ত্তি)

শ্রীশ্রীবিজয়-কথামৃত

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

৺পুরীধামযাত্রা।

১৩০৪ সালের ২৪শে ফাল্গুন আমরা শীঘ্র আহারাদি সমাপন করিয়া ৪৫ নং হ্যারিসন রোডের বাসার ত্রিতল হইতে গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া নীচে আসিলাম. এস্থানে এবারে প্রায় তিন বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। যখন তাঁহার হস্তধারণ করিয়া দুইজন তাঁহাকে নিম্নে আনয়ন করিলেন, তখন তাঁহার কিরূপ বেশ ও ভাব হইয়াছিল, যে না দেখিয়াছে তাহার ধারণা করিবার উপায় নাই। গৈরিক বসন কটিদেশে শোভা পাইতেছে, শিরোদেশে জটাকলাপ একটি গৈরিক উষ্ণীষে সংযমিত ও মালিকামালা বক্ষঃস্থলে বিলম্বিত। মুখাম্বুজ প্রেমে ঢল ঢল করিতেছে, যেন আনন্দ হৃদয়ে স্থান না পাইয়া মুখমণ্ডলে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে, ভাদ্রমাসের ভরা নদী যেমন দুই কূল ছাপাইয়া খরস্রোতে সমতলক্ষেত্র প্লাবিত করে, সেইরূপ তাঁহারও প্রেমানন্দতরঙ্গিণী রঙ্গে ভঙ্গে নয়নের কূল দিয়া নৃত্য করিতে করিতে বহির্ভাগে প্রবাহিত হইতেছে।

এক এক বার বলিতেছেন, 'ভাল করিয়া ধর'। যেমন একদিন শ্রীমতী শ্যাম-দরশনে যাইবার সময় অঙ্গ এলাইয়া পড়ায় সখীদিগকে বলিয়াছিলেন, 'সখি, ধর ধর', তাঁহারও তাদৃশী দশা হইয়াছে; নীলাচলচন্দ্রের শ্রীমুখ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় প্রেম আবেগময় হইয়া অঙ্গকে বিচালিত করিতেছে। কৃপাময় পাঠক! আমি বর্ণনা করিতে পারিলাম না, তাঁহার কৃপায় তাঁহার তৎকালীন বেশ ও ভাব আপনার অন্তরে স্ফুরিত হউক।

অতঃপর গোস্বামী মহাশয় গাড়ীতে উঠিয়া চাঁদপাল ঘাটে আসিয়া বোটে উঠিলেন; বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বোটে উঠিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিতে হইবে ভাবিয়া ভক্তগণের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। যাঁহারা এই তিন বৎসর কাল তাঁহার মধুময় সঙ্গসুখে অতিবাহিত করিয়াছেন, মধুর উপদেশে কর্ণ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, সংকীর্ত্তনে ভুবনমোহন নৃত্য ও মহাভাবের প্রকাশ দর্শন করিয়া প্রাণ মন চরিতার্থ ও আপনাদিগের জন্ম সার্থক মানিয়াছেন, আজ তাঁহারা কোন্ প্রাণে প্রাণের বস্তুটিকে বিদায় দিয়া শূন্যমনে গৃহে ফিরিয়া যাইবেন? একদিন কালিন্দী-তীরে ব্রজাঙ্গনাগণ অক্রূরের রথ আগুলিয়া দরবিগলিতনয়নে শ্যামচাঁদের পূজা করিয়াছিলেন; চিরদিনের মত প্রাণের প্রাণকে বিদায় দিয়া, উদাস প্রাণে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। আজ সুরধুনীতীরেও যেন সেই লীলার পুনরভিনয় হইয়া গেল, যাহার চক্ষুঃ আছে, সেই ভাগ্যবান্ দেখিল, বুঝিল ও মজিল। এইরূপে ভক্তগণের প্রাণে ভাবী বিরহের তরঙ্গাঘাত হইতে লাগিল। তাহাতে যে কারুণ্যের বাণ ডাকিল, উহা উপস্থিত নর নারীকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বেলা প্রায় অপরাহ্ন হইল, তথাপি কেহ তাঁহাকে বিদায় দিতে পারিতেছেন না; চরণের ভ্রমরগণ চরণপ্রান্তে পড়িয়া পড়িয়া প্রাণের কথা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নিবেদন করিতে লাগিলেন। দুরদৃষ্ট যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের প্রাণে ইঙ্গিত করিতেছিল;

এই প্রাণের বস্তুটিকে জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও। অতঃপর গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইলে তাঁহাদিগের প্রাণের কপাট খুলিয়া গেল। ভাগ্যবান্ ভূতনাথ ঘোষ তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনোরঞ্জন বাবু সজলনয়নে চরণে প্রণাম করিলেন, অমনি গোস্বামী প্রভু দীনতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে বলিলেন আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। মনোরঞ্জন বাবু সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে আমরা কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?' তিনি বলিলেন, "এই আশীর্ব্বাদ করুন, জগন্নাথদেব যেন আমাকে গ্রহণ করেন।" মনোরঞ্জন বাবু লিখিয়াছেন,—"এই কথায় শিষ্যবর্গের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। একজন ভক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইভাবে গুরুদেবকে বিদায় দিয়া শিষ্যবর্গ শূন্যহৃদয়ে ঘরে ফিরিলেন, যাহারা তাঁহার সঙ্গী হইলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।" বিদায়কালে চারুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—আরা কি করিব?' গোঁসাই বলিলেন, 'ঘরে ঘরে কর নাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন।'

অতঃপর আমাদিগের জাহাজ দুই খানা বোট লইয়া গঙ্গার ভিতর দিয়া চলিল। গঙ্গার সুস্নিগ্ধ সান্ধ্যসমীরণে আমরা যেন নবজীবন লাভ করিলাম। জাহাজ যাইতে যাইতে হঠাৎ আমাদের বোটের সহিত অন্য জাহাজের সংঘর্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু ভগবৎকৃপায় বাঁচিয়া গেল। পরদিন জাহাজ ক্যানাল খাল দিয়া চলিল, অনুমান ১২টার সময় আমাদের জাহাজ ক্যানালের পার্শ্বে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত ডাক বাঙ্গলা দেখিয়া তথায় নোঙ্গর করিল। গোস্বামী মহাশয় বিধুবাবুকে অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিয়া সেই ডাক বাঙ্গলায় যাইয়া বসিলেন।

আজ দোল পূর্ণিমা। কোনও শিষ্য সঙ্গে আবির আনিয়াছিলেন, তিনি গোস্বামী প্রভুর চরণে আবির দিয়া প্রণাম করিলেন। পরে রন্ধন

হইলে আমরা তাঁহার সহিত বসিয়া আনন্দে আহার করিলাম। আহারের সময় কোন কারণে একটী শিষ্য অগ্রে উঠিয়া গেলেন। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন 'এরূপ করিতে নাই, ইহাতে অবশিষ্ট লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন হইয়া থাকে।' অতঃপর জাহাজ চলিতে লাগিল, পরদিন ১২টার সময় একটা মুদি দোকানের নিকট নোঙ্গর করিল। তথায় আমাদিগের আহারাদি পরমানন্দে সম্পন্ন হইল।

এই স্থান হইতে একটি সুন্দর তুলসী গাছ লওয়া হইল। পূর্ব্ব গাছটি জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল। গোস্বামী মহাশয় নিজের আসনের নিকট তুলসী গাছটি রাখিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে গ্রন্থসাহেব ও অন্যান্য দুই একটি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। সন্ধ্যাকালে হরিসংকীর্ত্তন হইলে তুলসী-বৃক্ষমূলে হরি লুঠ দিতেন। এই সময় আমাদের দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রায়ই আমরা তাঁহার সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে ও তদীয় মধুর উপদেশামৃতে এতই নিমগ্ন হইতাম যে, সময় আমাদের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাইত। এখন সেই সকল আনন্দের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে প্রাণ যে কোন্ আনন্দরাজ্যে বিচরণ করে তাহাপ্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। কেবল এই কথাই পুনঃ পুনঃ মনে হয় যে, যাঁহারা সেকালে গোঁস্বামী প্রভুর সহযাত্রী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য হইয়াছে। মনোরঞ্জন বাবু তাঁহার 'প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষেত্র পৌঁছছা পর্য্যন্ত গোঁসাইজীকে লইয়া যাত্রিগণ যেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিলেন, তাহার বর্ণনা হয় না। সকলেই দিবারাত্রি তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে ডুবিয়া গেল।"

অতঃপর মুদিদোকানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামের পর জাহাজে উঠিলাম। জাহাজ পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু নোঙ্গর করিবার উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেল না। অবশেষে অনুমান ৪॥ টার সময়

একটা ব্লকে জাহাজ নোঙ্গর করিল। আহারাদি করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। আমরা এই স্থানেই রজনী যাপন করিলাম। এক্ষণে আমাদের এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইল। যে সকল খাদ্যসামগ্রী আনা হইয়াছিল, তাহা প্রচুর হইলেও লোকসংখ্যার আধিক্যহেতু ২।৩ দিনেই নিঃশেষ হইয়া গেল। এই সময় আমাদিগকে বহুকষ্টে খদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইত; সুতরাং তাহাতে অধিক সময় ব্যয়িত হওয়ায় জাহাজ প্রত্যহ অল্পই অগ্রসর হইতে পারিত; কিন্তু এই অভাবের সময়েও রঙ্গরসের অভাব ছিল না। কেহ কেহ কলিকাতা হইতে আমার আনীত খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য্য দেখিয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা গোস্বামী প্রভুর মধুর 'ওলাহন' প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহার মধুর চরিত্রে ক্লেশও সুখে পরিণত হইল। যেমন প্রভু, তেমনি ভক্ত। তিনি যখন আহারের নিমিত্ত নৌকা হইতে তীরে আসিতেন, তখন বন্ধুর পথে তাঁহার কষ্ট হইবে বিবেচনায় ভক্তগণ কম্বল, শতরঞ্চ ও গাত্রবস্ত্র বিছাইয়া দিতেন। তিনি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার উপর ভর দিয়া আহারের স্থানে যাইতেন ও আহারান্তে পুনর্ব্বার আসিয়া নৌকায় স্বীয় আসনে উপবেশন করিতেন।

এইরূপে আমরা সেদিন তথায় থাকিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পরদিন প্রায় ১১ টার সময় একটা পুরাতন পাকা বাঙ্গলার নিকট আমাদিগের জাহাজ থামিল। বিধুবাবু এইস্থান হইতে তাঁহাকে নীলগিরি দেখাইলেন। তিনি উহা দর্শন করিয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কি অনুপম সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতেছিলেন অথবা কি প্রাচীন ইতিহাস দিব্যনেত্রে পাঠ করিতেছিলেন তাহা কে বলিবে? আমরা বাহ্যদৃশ্য দেখিয়াই পরিতৃপ্ত হইলাম। আজ উৎকল দেশ দিয়া জাহাজ চলিয়াছে। এই সেই রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র গজপতির দেশ; এই উৎকল খণ্ডের বক্ষে কত প্রাচীন ইতিহাসের উজ্জ্বল মধুর পংক্তি বিন্যস্ত রহিয়াছে; ইহা কত

প্রতিদ্বন্দ্বীর শাণিত কৃপাণাঘাত, কত আশার ঘাত প্রতিঘাত ও কত নৈরাশ্যের অশ্রুবিন্দু হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এই মনোহর ভূখণ্ডের সহিত কত অতীত মধুময় স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। একদিন এই দেশে প্রবেশ করিয়া গৌরসুন্দর পাগলপ্রায় হইয়া নাচিতে নাচিতে গমন করিয়াছিলেন। আহা! ধন্য উৎকলভূমি, তুমি কলিপাবন প্রেমাবতারের চরণরেণুবিভূষিত হইয়া এখনও মরজগতে স্বীয় সৌভাগ্যগর্ব্বে অটল হইয়া বিরাজ করিতেছ। আমরা যখন অগ্রসর হইতে লাগিলাম কি অপূর্ব্ব নৈসর্গিক রমণীয়তা আমাদিগের প্রাণ-মনকে অধিকার করিয়া বসিল। উভয় তীরে পুষ্পিত-লতালিঙ্গিততরুগুল্মরাজি মনোহরবেশে প্রকৃতই আমাদের নয়ন মন হরণ করিতে লাগিল; কিন্তু মরজগতে অবিচ্ছিন্ন সুখের বিধান বিধাতা করেন নাই। চণ্ডীদাস সুখ দুঃখ দুইটি ভাই বলিয়াছেন; সুতরাং সুখদুঃখের নিত্যসম্বন্ধহেতু সুখের নিকটে দুঃখ আসিয়া অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইল। হঠাৎ আমাদের বোটের হাল ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাতে ষ্টীমারের পশ্চাতে বাঁধা বোট টলমল করিতে লাগিল। আরোহিগণ মহাবিপত্তি গণিলেন। তখন অনেক কষ্টে হালটাকে বাঁধিয়া দেওয়ায় কোন প্রকারে বোট চলিতে লাগিল, আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বৈকাল বেলা কতকগুলি ছেলে 'পয়সা দাও', 'পয়সা দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বোটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগকে কিছু দিতে বলায় কেহ কেহ বোট হইতে পয়সা ছুড়িয়া দিতে লাগিলেন; কিন্তু অনেক পয়সা জলে পড়ায় ও হারাইয়া যাওয়ায় তাহারা পাইল না। তাহাদিগের মধ্যে একটি কুব্জা মেয়ে ছিল। সে পয়সা পাইতেছে না দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় দুঃখ করিলেন, তাহাতে বিধুবাবু একটি টাকা ও কতকগুলি পয়সা কাপড়ে বাঁধিয়া চলন্ত বোট হইতে লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন এবং সাঁতার দিয়া গিয়া তাহাদিগকে পয়সাগুলি ও

কুব্জা মেয়েটিকে টাকাটি দিয়া পুনরায় আসিয়া বোটে উঠিলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহার খুব প্রশংসা করিলেন এবং আমরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। এইরূপে নানাবিধ কমনীয় দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা-কালে আমরা কটকে আসিয়া পঁহুছিলাম। গোস্বামী মহাশয় তথায় জাহাজের খালাসিদিগকে ১ পাউণ্ড চা, মাঝিদিগকে বক্‌সিস্ ও সকলকে আহারের জন্য ১০৲ টাকা দিলেন। এদিকে গঙ্গাধর খুটিয়া পূর্ব্বেই কটকে আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বোটে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আত্মপরিচয় গোপন করিয়া হরেকৃষ্ণ খুটিয়া বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন গোস্বামী মহাশয় ২০৲ টাকার একখানা নোট দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অতঃপর গোস্বামী মহাশয় জানিতে পারিলেন, যাত্রিগণের কটকসহরের মধ্য দিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ, অথচ সহরের বাহির দিয়া যে রাস্তা আছে তাহাতে গাড়ী চলিতে পারে না; সুতরাং মিউনিসিপালিটির অনুমতির প্রয়োজন হইল এবং ব্যারং ষ্টেশন পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিবার নিমিত্ত কতিপয় গাড়ীরও বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইল। তখন গোস্বামী প্রভুর আদেশানুসারে আমাকেই হরিবল্লভ বাবুর বাসায় যাইতে হইল। তাঁহার বাসা ষ্টীমার ঘাট হইতে প্রায় তিন মাইল হইবে। আমি প্রস্থান করিলাম, এদিকে একটি ভাড়াটিয়া ঘরে আহারাদির আয়োজন হইতে লাগিল। হরিবল্লভ বাবু তখন কটক মিউনিসিপালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান্ ছিলেন। তিনি একখানা অনুমতিপত্র লিখিয়া আমাকে দিলেন, আরও বলিলেন, তিনি পুরীতে বাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। ২৫৲ টাকার বেশী ভাড়া হইবে না; এ সম্বন্ধে বেশী গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। গাড়ীর বিষয় তাঁহার দেওয়ানজীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যেন

তিনি প্রাতঃকালে গাড়ীগুলি ষ্টীমার ঘাটে পাঠাইয়া দেন। আমি তথা হইতে হরিবল্লভ বাবুর পত্র লইয়া চলিয়া আসিলাম। অধিক রাত্রি হইয়াছিল; সুতরাং আমার ভাগ্যে শুষ্ক অন্ন জুটিল। অতঃপর শুনিলাম সকলে পরামর্শ করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত ঠিক করিয়াছেন তাঁহারাই এখান হইতে গাড়ী আনিয়া চলিয়া যাইবেন। শুনিয়া আমার দুঃখ ও বিরক্তি হইল। আমি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, প্রাতঃকালে সেই লোকগুলি গাড়ী লইয়া এতদুর পথ অতিক্রম করিয়া আসিবে, তাহাতে তাহাদের যথেষ্ট ক্লেশ হইবে; তাহাদের কি অপরাধ যে তাহারা অনর্থক ক্লেশ পাইবে, এবং হরিবল্লভ বাবুও আমাদিগের এই ব্যবহারে কি মনে করিবেন? ইহাতে যোগজীবন ২টা টাকা দিয়া বলিল 'আপনি দুঃখ করিবেন না। প্রত্যুষে গাড়ী করিয়া গিয়া গাড়োয়ানদিগকে আসিতে নিষেধ করিয়া সেই পথে ব্যারং ষ্টেশনে চলিয়া যাইবেন।' তখন ব্যারং হইতে পুরী পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছিল। অগত্যা আমি তাহাই করিলাম। ব্যারং ষ্টেশনের পথে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইলাম। তিনি আমাকে তাঁহার গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, এক্ষণে আর বেশী দূর নাই, ষ্টেশনে আমি হাটিয়াই যাইতে পারিব। পূর্ব্ব হইতে গঙ্গাধর খুটিয়া সঙ্গে ছিলেন, এক্ষণে আমাদিগকে ব্যারং ষ্টেশন হইতে পুরী লইয়া চলিলেন। আমরা সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পুরী পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে পুরী প্রবেশের রাস্তায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয় কিছুকাল বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত একটি বটবৃক্ষের তলে বসিলেন। এদিকে হরেকৃষ্ণ, গণেশ ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহাদের লোকজন আসিয়া গাড়ী করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের আদেশমত স্ত্রীলোকদিগকে ও দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গেলেন। উহাঁরা জানিতেন না যে পূর্ব্ব হইতে হরিবল্লভ বাবুর বাটী স্থিরীকৃত আছে। এইজন্য উহাঁরা

গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে বহু লোক জন আছে জানিয়া একটি বড় বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাতেই দ্রব্যাদি সহ সকলকে লইয়া গেলেন। গোস্বামী মহাশয়ও জানিতেন না যে পাণ্ডা ঠাকুরেরা একটি পৃথক্ বাটী স্থির করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পদব্রজে চলিলেন, গাড়ীতে উঠিলেন না, সুতরাং আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন "জগন্নাথদেবের কিছুই অসাধ্য নাই। এই যে খোঁড়া আমি, আমাকেও দেখ কি অপূর্ব্ব-শক্তিতে লইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব করুণা।" এইরূপে চারিনালায় পঁহুছিলে গঙ্গাধর তাঁহাকে বলিলেন, ঐ দেখুন জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা দেখা যাইতেছে। তখন তিনি একেবারে পাগলপারা হইয়া উঠিলেন। সেইস্থানে সঙ্গীদিগকে বলিলেন, তোমাদের যাহার সঙ্গে যাহা কিছু টাকা আছে, তাহা ঐ পাণ্ডার চরণে অর্পণ কর। কে কত দিলে মনে রাখিও, বাসায় যাইয়া আমি তাহা তোমাদিগকে দিব। এইরূপ প্রায় শতাধিক টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি বাসায় গিয়া ঐ টাকা দিয়াছিলেন।

চারিনালা হইতে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল :—

"গৌর চলিল ব্রজনগরে, জয় রাধে
শ্রীরাধের জয় দিয়ে।"

এইরূপে নরেন্দ্র সরোবরের নিকট আসিলে গোস্বামী প্রভু ঐ সরোবরের জল গণ্ডূষ করিয়া পান করিলেন ও মস্তকে দিলেন।

অতঃপর অমৃত বাবু ছুটিয়া গিয়া জগন্নাথবল্লভ মঠের বাবাজীদের নিকট হইতে খোল, করতাল আনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বিধু বাবু গান ধরিলেন, "যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে,
ঐ দ্যাখ তারা দুভাই এসেছে রে।

এই কীর্ত্তনে তিনি এরূপ প্রমত্ত হইলেন যে, তথা হইতে বাসা পর্য্যন্ত প্রায় ১ মাইল পথ নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। যিনি যষ্টি ভর না দিয়া উঠিতে বসিতে পারেন না, তিনি এ কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

অতঃপর বাসায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর মহাপ্রসাদ পাইবার আয়োজন হইল; আমরা বাটীর প্রাঙ্গণে উপবেশন করিলে তিনিও আমাদিগের সহিত বসিয়া গেলেন। পার্শ্বে মণীন্দ্রবাবুকে বসাইলেন। আহারকালে গঙ্গাধর বলিলেন, বিনা আসনে ও কলাপাতায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়।" গোস্বামী মহাশয় তাহাই করিলেন ও বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি ত নিয়ম-প্রণালী কিছুই জানি না, আপনারা আমাকে শিখাইবেন।"

প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতেই তিনি মণিবাবুর পাতা হইতে কিঞ্চিৎ প্রসাদ লইলেন এবং বলিলেন, "মণি, প্রতি পাতা হইতে কিছু কিছু প্রসাদ আমার পাতে আনিয়া দাও।" মণিবাবু তাহাই করিলেন, তিনি সেই প্রসাদ পরম আগ্রহে ভোজন করিলেন। তখন মণিবাবুও এই সুযোগে গোস্বামী মহাশয়ের পাতা হইতে ভাল ভাল প্রসাদ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত উদরস্থ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভক্তবৃন্দও মণিবাবুর পাতা লুঠ করিলেন। তখন সমবেত ভক্তবৃন্দের চিত্তবৃত্তি কিরূপ সুখময়ী হইয়াছিল, জগৎ কিরূপ মধুময় বলিয়া সকলের প্রতীতি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তখন ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের ভোজন-লীলার স্মৃতি ভক্তগণের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল কিনা কে বলিবে? এইরূপে মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গোস্বামী প্রভু শ্রীমুখদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন; তিনি বলিলেন, "আজই দর্শন করা চাই, কারণ, মৃত্যুর স্থিরতা নাই; পাছে দর্শনের পূর্ব্বে মৃত্যু হয়।" এই বলিয়া

প্রায় রাত্রি ৮॥ টার সময় বিধু বাবুকে অবলম্বন করিয়া যষ্টি ভর দিয়া পাণ্ডার সহিত শ্রীজগন্নাথদর্শনে চলিলেন। আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহোৎসাহে গমন করিলাম। যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বহু বাধা বিঘ্ন সহ্য করিয়া সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। সেই প্রিয়তমের দর্শনে চলিয়াছেন, হৃদয়ে কিরূপ মিশ্রভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা কে বলিবে? এইরূপে তিনি প্রথমতঃ অরুণস্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলেন; তথায় দর্শনী ৫৲ টাকা দিলেন। অতঃপর সিংহদরজা দিয়া প্রবেশকালে পতিতপাবন ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ৫৲ টাকা প্রণামী দিয়া দ্রুতপদে শ্রীমন্দিরের প্রথম চন্দন কাঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় অনন্তরাম ছড়িদার গোঁসাইর মস্তকে বেত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন "আমরা দ্বারী, কিছু ভিক্ষা চাই।" গোঁসাই বলিলেন 'কি চাও?' অনন্তরাম বলিলেন, "একটি মোহর।" তিনি যোগজীবনকে তাহাই দিতে অনুমতি করিলেন। এই সময় ঠাকুরের দ্বার বন্ধ থাকায় কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। অনন্তর প্রথম চন্দনকাঠ অতিক্রম করিলে তাঁহার তৃষিত নয়ন-চকোর শ্রীমুখচন্দ্রের সুধাপানে প্রমত্ত হইল। প্রিয়তমের মধুর সম্মিলনে বিশাল অঙ্গ যেন অপ্রাকৃত অনঙ্গভরে বিবশীকৃত হইল; দাঁড়াইয়া থাকিবার সামর্থ্য রহিল না, তিনি বসিয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ ভাবে বিভোর হওয়ায় তাঁহাকে মাতালের ন্যায় দেখাইতে লাগিল; তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্‌গদ্ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই নৃসিংহদেব, এই গোপাল, জগন্নাথদেব হইতে প্রকাশ পাইতেছেন।" অনন্তর কিছুক্ষণ বসিয়া ভাবসংবরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। এক্ষণে পাণ্ডাগণ দর্শনী চাহিলে তিনি তাঁহাদিগকে দিবার নিমিত্ত গঙ্গাধর খুটিয়াকে ১০৲ টাকা দিলেন। অতঃপর গরুড়স্তম্ভ, শ্রীমন্দিরের ভিত্তিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গুলিচিহ্ন ও অন্যত্র তদীয় শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন

করিয়া ও প্রত্যেক স্থানে ৫৲ টাকা করিয়া দর্শনী প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে বাসায় চলিলেন।

আমরা সেই গৃহে রজনী যাপন করিলাম। একতালার একটী ঘরে গোস্বামী মহাশয়ের আসন হইল। কারণ বলিতেছি। এই বাড়ীটা পাণ্ডারা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; উপরে যাইবার সিঁড়ি এত সরলভাবে উত্থিত যে, তদ্দ্বারা গোস্বামীমহাশয়ের উপরে উঠা অতীব অসুবিধাজনক, সুতরাং নীচেই তাঁহার আসন হইল। ঘরটি আর্দ্র, তাহাতে আবার যাত্রীদিগের পায়খানা অতি নিকটে থাকায় দুর্গন্ধ আসিতে লাগিল; এইজন্য ধূপ ধূনা দিয়া অতিকষ্টে থাকিতে হইল।

১লা চৈত্র গোস্বামী মহাশয় ফুল জল দিয়া পাণ্ডা শ্রীহরেকৃষ্ণ খুটিয়ার পা পূজা করিলেন ও ১০৲ টাকা প্রণামী দিলেন। আমরাও কেহ কেহ তাঁহার পা পূজা করিলাম, ও ১৲ টাকা করিয়া প্রণামী দিলাম। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গাধর আসিয়া পা-পূজা করাইয়া অনেকের নিকট প্রণামী লইয়াছিল। গোঁসাইর আদেশানুসারে যোগজীবনের নিকট আমরা ঐ টাকা লইলাম। এক্ষণে গণেশ ঠাকুর হরেকৃষ্ণ খুটিয়ার পরিচয় দিলে গোস্বামী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে ইনি কে?' তাহাতে গণেশ ঠাকুর বলিলেন, 'ইনি গঙ্গাধর খুটিয়া, হরেকৃষ্ণের পিতৃব্য। ইনিই নাবালক হরেকৃষ্ণের তত্ত্বাবধান করেন, ইনি অন্য বাটীতে পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় গঙ্গাধরের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। প্রথম কয়েক দিন তাঁহাকে কিছু বলিতেন না, পরে তাঁহার আরও দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ায় একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া মিথ্যা কথা বল?" ইহাতেও তাঁহার চৈতন্য হইল না। মহাপুরুষেরা ইচ্ছা করিলে সকল ঘটনাই জানিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদা ভজনেই মগ্ন থাকেন, এই জন্য কথন কথন লোকে

তাঁহাদিগকে ঠকাইতে পারে। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস দেব বলিতেন, "আমি কাহারও আপাদমস্তক দৃষ্টি করিলে তাহার ভিতরের অবস্থা সকলই জানিতে পারি; তাহার শরীর আমার নিকট স্বচ্ছ হইয়া যায়।

গোস্বামী মহাশয় অতিকষ্টে ২।৩ দিন এই বাসায় রহিলেন, পরে অসহ্য হওয়ায় হরিবল্লভ বাবুর নির্দ্দিষ্ট বাটীতে যাইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, ও আমাকে তাহা পাইতে পারি কি না দেখিতে বলিলেন। ইহা নীলমণি বর্ম্মণের বাড়ী, বড়দাণ্ড রাস্তার পার্শ্বেই অবস্থিত। আমি নীলমণি বর্ম্মণের দৌহিত্র ক্ষীরোদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, এই সমগ্র বাটী আমরা পাইতে পারি কি না। তিনি বলিলেন, পাইতে পারেন, কিন্তু আপাততঃ ৩।৪ জন যাত্রী আছে, তাহারা ৩।৪ দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবে, তখন সমগ্র বাটী পাইবার কোন বাধা থাকিবে না। এই কথা গোস্বামী মহাশয়কে বলায় তিনি তখনই যাইতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, যে ঘরে আপনি থাকিবেন সে ঘরটী ধৌত করিয়া চুণকাম করাইয়া লওয়া আবশ্যক। তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন। পরে ক্ষীরোদ বাবু সমস্ত করাইয়া দিলেন এবং আমি তাঁহাকে খরচের টাকা দিলাম। পরে যথাসময়ে গোস্বামী মহাশয় আহারান্তে ঐ বাটীতে আগমন করিলেন। এই বাড়ী উত্তম দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সম্মুখের বড় ঘরে তাঁহার আসন স্থাপিত হইল। শ্রীমতী শান্তিসুধা দোতালায় এক ঘরে রহিলেন, অপর ঘর পান্নার মাতার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে ভক্তবৃন্দ স্বস্বস্থান মনোনীত করিয়া আসন পাতিলেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে আমি স্থান পাইলাম। আমরা পুরী আসিলে এই মঠের একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমরা শুনিতে পাই, মহাপ্রভুর দর্শনে বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ বৎসর বৎসর এখানে আগমন করিতেন। গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে এত লোক জন দেখিয়া এ যে সেই লীলা বলিয়া মনে হয়। দেখিতেছি স্ত্রী পুরুষ

সকলেরই গোস্বামিপ্রভুগত প্রাণ। ধন্য! ধন্য! ধন্য! দর্শন করিয়া জন্ম ও চক্ষুঃ সার্থক হইল।"

এইরূপে কিছুদিন এই বাটীতে অবস্থানের পরে লোকাধিক্য হওয়ায় এই বাটীর সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে মাতাজীর বাড়ীও ভাড়া করা হইয়াছিল। এই বাটীও শ্রীঅদ্বৈতবংশের সোণা গোঁসাইদের ছিল। পুরীতে ইঁহাদিগকে কোর্টভোগের গোঁসাই বলে। গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথদেবের ভোগের জন্য যে টাকা দিতেন, তাহা কোর্ট হইতে আনিয়া উক্ত গোস্বামিগণ সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহারা বহুকাল হইতে পুরীধামে বাস করিয়া ঐ দেশী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিবাহ-আদি সামাজিক অনুষ্ঠান বঙ্গদেশের সহিতই হইয়া থাকে।

ইঁহারা অদ্বৈতবংশের গোস্বামী, সীতাদেবীর সন্তান। ইঁহাদের বংশধরগণ এখনও শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। বাঁশবেড়ে গোস্বামী বলিয়া ইঁহারা তথায় পরিচিত। ইঁহাদের বাটীর চতুষ্পার্শ্বে অনেক বাঁশবন ছিল বলিয়া ইঁহাদের উক্ত পরিচয় হইয়াছে।

আমরা দিবাভাগে নূতন বাটীতে আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যা সমাগত হইলে গোঁসাইর ঘরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তনে ভাবের প্রবল বন্যা বহিতে লাগিল। গোস্বামী প্রভু ও ভক্তবৃন্দ ঘর হইতে বারাণ্ডায় যাইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, গোঁসাই কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া পাষাণবৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে বসিয়া পড়িলেন। রাস্তায় বহুলোক অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে তিনি হরির লুঠ দিলেন। কীর্ত্তনের সময় তাঁহার মনোহর নৃত্য যাঁহারা দর্শন করিতেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন। নৃত্য দেখিয়া আমাদের বোধ হইত তিনি যেন নিত্য নূতন নূতন ভাবে নৃত্য করিতেছেন। ভাবাবেশে কখন কটিদেশ হইতে বহির্ব্বাস খুলিয়া ঘোমটা দিতেছেন, কখন বা 'জয় শচীনন্দন,

জয় শচীনন্দন' বলিয়া ডাকিতেছেন, কখন দরবিগলিত অশ্রুধারে অভিষিক্ত হইতেছেন। বিধুবাবু নৃত্যকালে তাঁহার পশ্চাতে থাকিতেন, কিন্তু তিনিও অনেক সময় তাঁহাকে সামলাইতে পারিতেন না, গোঁসাই ভাবের প্রভাবে 'জয় জয়' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেন। এইরূপে আনন্দে কিছু দিন কাটিয়া গেল।

একদিন গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন, হরিদাস বাবু যে প্রতি বৎসর পট্ট ডুরী দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার রাজসরকারে জমা হয় কি না, আপনি সংবাদ লইয়া আসুন। আমি গোপীনাথ বাবুর নিকট সংবাদ লইলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ বাবু রাজসরকারে কার্য্য করেন। ইহাঁরা কুলীনগ্রামনিবাসী বসু রামানন্দের বংশধর ও হরিদাস বাবুর ভ্রাতা। শ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতে পুরীধামে বাস করিয়া ঐ দেশী হইয়া গিয়াছেন। গোপীনাথ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানাইলেন যে, হরিদাস বাবুর নামে কোন পট্টডুরী রাজসরকারে জমা হয় না। পাণ্ডা শ্রীভুবন শিঙ্গারী প্রতি বৎসর পট্টডুরী দিয়া মূল্য ও শ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদী সাড়ী লইয়া থাকেন। আমি এই কথা গোস্বামী মহাশয়কে নিবেদন করিলাম। অতঃপর তাঁহার আদেশ মত ৺শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় হরিদাস বাবুকে ম্যানেজারের নিকট আবেদন পাঠাইতে লিখায় তিনি তাহা পাঠাইয়া দিলেন। সে সময় কমিশনার প্রাইজ সাহেব শ্রীজগন্নাথমন্দিরের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি হরিদাস বাবুর আবেদনপত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ ভুবন শিঙ্গারীকে আদেশ করিলেন তুমি এ যাবৎ পট্টডুরী দিবার জন্য যত টাকা পাইয়াছ, তাহা শীঘ্র আনিয়া দাও, নতুবা তোমাকে পুলিশে দিব। পাণ্ডাঠাকুর অগত্যা সমস্ত টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া নিস্তার পাইলেন।

এস্থলে এই পট্টডুরী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রথযাত্রাকালে দয়িতা পাণ্ডারা এই পট্টডুরীর সাহায্যে শ্রীজগন্নাথ

ও বলভদ্রকে রথে উত্তোলন করেন। শ্রীমহাপ্রভু এই পট্টডুরী নির্ম্মাণের ভার কুলীনগ্রামনিবাসী বসু রামানন্দের উপর অর্পণ করেন এবং এই সেবাকার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার দেশে কিছু ভূমি অমৃতমণি (দেবোত্তর ভূমি) করিয়া দেওয়া হয়। তদবধি বসু রামানন্দ ও তদীয় বংশধরগণ এই পট্টডুরী প্রতি বৎসর প্রেরণ করিতেন। কালক্রমে বসু ঠাকুরের নিকটবর্ত্তী বংশধর লোপ হওয়ায় ঐ সম্পত্তি দৌহিত্রের হস্তে পড়িল। কালক্রমে তিনি উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। বসুবংশের অন্যান্য যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা দারিদ্র্যপ্রযুক্ত ও মতিগতির অভাবে উহার কোন প্রতীকার করিলেন না। এদিকে পুরাতন ডুরীতেই সেবাকার্য্য একরূপ নির্ব্বাহিত হইত। অনন্তর শ্রীজগন্নাথ-দেবের কৃপায় বসুবংশের একজন পূর্ব্বোক্তসেবাগ্রহণের অধিকারী হইলেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরে তাঁহার এই শুভমতির উদয় হইল। তিনি গোঁসাইকে ইহা জানাইলে গোঁসাই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এই সেবাগ্রহণের নিমিত্ত প্রোৎসাহিত করিলেন। হরিদাস বাবুর দেশে তখন একটি মাত্র লোক পট্টডুরী নির্ম্মাণ করিতে জানিত, অন্যান্য সকলে পরলোকগত হইয়াছিল। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের প্রেরণায় উক্ত লোকের সাহায্যে পট্টডুরী নির্ম্মাণ করাইয়া প্রেরণ করিলেন; অদ্যাবধি এই সেবা করিয়া প্রতিবৎসর তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী বস্ত্র পাইয়া থাকেন। এদিকে ভুবন শিঙ্গারী বিফলমনোরথ হইয়া একজন শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

প্রত্যহ প্রাতে পাণ্ডা শ্রীহরেকৃষ্ণ খুটিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের চরণতুলসী আনিয়া গোস্বামী মহাশয়কে দিতেন এবং তাঁহার নিকটে পা-দুখানি একত্র করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। বালক হরেকৃষ্ণকে এই ভাবে বড়ই মনোহর দেখাইত। গোঁসাই ভাব বুঝিয়া একটি প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে তিনি চলিয়া যাইতেন। একদিন গোঁসাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

আসিবার দিন যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তোমার খুড়া তোমাদিগকে দিয়াছেন কি?' তিনি তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন তাঁহারা সে টাকা পান নাই। অতঃপর একদিন গঙ্গাধর আসিলে গোঁসাই তাঁহাকে তীব্রবাক্যে শাসন করিলেন। গঙ্গাধর বাটীতে গিয়া হরেকৃষ্ণের মাতাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে টাকা দিতে ভুলিয়া গিয়াছি; এই ত্রিশ টাকা পাইয়াছিলাম তোমাকে দিতেছি, ইহা লইয়া তুমি বলিয়া পাঠাও যে টাকা পাইয়াছ; নতুবা আমার আর সেখানে যাওয়া হইবে না।" তাঁহার অনুরোধে হরেকৃষ্ণের মাতা হরেকৃষ্ণকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি টাকা পাইয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "বেশ ত! তোমরা টাকা পাইলেই হইল।" এ দিকে গণেশ ঠাকুর আসিয়া প্রকৃত তথ্য বিবৃত করিল; গোঁসাই ত্রিশ টাকার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবনে যখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছিলেন, তখনও জীবের কথা ভুলেন নাই। তিনি একটি শস্য-ক্ষেত্রকে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া কৃষ্ণের লুপ্তকীর্ত্তির উদ্ধার করিয়াছিলেন; এ দিকে শ্রীপুরুষোত্তমে আমাদিগের প্রভুও যখন 'শচীনন্দন, শচীনন্দন' বলিয়া কাঁদিয়া দিনপাত করিতেছিলেন, তখনও লোকব্যবহার ভুলেন নাই। যথাযোগ্য উপায় প্রয়োগ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর লুপ্তকীর্ত্তি পট্টডুরী সেবার পুনরুদ্ধার করিলেন। আর এক কথা এই যে, গোঁসাই জীব-সেবার নিমিত্ত সহস্র মুদ্রা মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন, তবে কেন কয়েকটা টাকার জন্য এত অনুসন্ধান করিলেন? উত্তর এই যে, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা-রক্ষার নিমিত্ত তিনি ইহা করিয়াছিলেন। যদি সত্য ও ন্যায় পদদলিত হয়, তবে সাধন, ভজন ও ধর্ম্ম দাঁড়াইবে কোথায়? এই ঘটনাও শ্রীমহাপ্রভুর লীলা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রায় ভবানন্দের বংশ শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত ছিল। শ্রীরামানন্দ রায় প্রভুর প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু

তদীয় ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথকে রাজস্ব আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে যখন চাঙে চড়ান হইয়াছিল, তখন পুনঃ পুনঃ লোক আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট তাহার দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া উদ্ধার প্রার্থনা করিল; কিন্তু প্রভু কি করিলেন? তিনি বলিলেন, যিনি রাজার ন্যায্য প্রাপ্য রাজাকে না দিবেন, তিনি ন্যায়তঃ দণ্ডার্হ হইবেন; এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। আমাদিগের প্রভুও ন্যায়ের মর্যাদারক্ষার জন্য এই সমস্ত বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়া অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন; আমাদিগের প্রভু কি গৌরাঙ্গলীলা আস্বাদন করিয়া অভিনয় করিয়া দেখাইতেছেন? তাঁহারা ই ধন্য, যাঁহারা ইহা দর্শন করিয়া জন্ম সফল করিয়াছেন।

গোস্বামী প্রভু দীনের দীন ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে বজ্র অপেক্ষাও কঠোর হইতে পারিতেন। কবিবর শ্রীভবভূতি বলিয়াছেন,—

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোনু বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥'

অর্থাৎ, যাঁহারা লোকোত্তরচরিত্র, কে তাঁহাদিগের হৃদয় বুঝিতে পারে? তাঁহাদিগের হৃদয় কখন বজ্র অপেক্ষা কঠোর, কখন বা কুসুম অপেক্ষাও কোমল হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ ছোট হরিদাসকে মর্কটবৈরাগ্যহেতু জন্মের মত বর্জ্জন করিয়াছিলেন; গোস্বামী প্রভু কি করিলেন বলিতেছি। তিনি শ্রীমন্দিরের পাণ্ডাদিগকে পাঁচ শত টাকা দিয়াছিলেন। একদা তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, তাঁহারা ও ষোলশাসনী ব্রাহ্মণগণ এক এক খণ্ড করিয়া কাটিয়া বস্ত্র যাচ্ঞা করেন। তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা জানিতে চাহিলেন; গঙ্গাধর প্রায় চারি হাজার লোকের তালিকা আনিয়া দিল; কিন্তু অন্যান্য তালিকায় দেখা গেল যে, প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোকের বেশী হইবে না। গঙ্গাধর প্রায় পাঁচশত বাজে লোকের

নাম দিয়াছিল। তৎপরে একদিন গঙ্গাধর আসিলে গোস্বামী মহাশয় তাহাকে বলিলেন, "তুমি আর এখানে আসিও না, তোমাকে দেখিলে বুক শুকাইয়া যায়, তুমি শনি।" অতঃপর তাহার শত্রুতা গাঢ়তর হইল। তদবধি গঙ্গাধর আর আসিত না; কিন্তু এখানে ওখানে ও ভক্তদিগের নিকট গোস্বামী প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইত। এই গঙ্গাধর রামচন্দ্রপুরীর ছায়ামূর্ত্তি নয় ত? যাহা হউক, দোকানদারেরা কাটিয়া বস্ত্র দিতে অসমর্থ হওয়ায় এই বস্ত্রবিতরণ ঘটিয়া উঠিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীক্ষেত্রভ্রমণ।

১৩০৪।৫ সাল। ২রা চৈত্র হইতে ১২ই বৈশাখ।

আজ ২রা চৈত্র। আজ আমরা ৺পুরীধামের দর্শনীয় পবিত্র স্থান সকল দর্শন করিতে বাহির হইব। ভক্তগণের মনে আনন্দের হিল্লোল খেলিতেছে, পূর্ব্বস্মৃতি প্রাতঃকালীন কুসুমকলিকার ন্যায় এক একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রভাতসমীরণ আজ যেন কি এক নূতন বার্ত্তা লইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। বিহঙ্গকাকলী যেন নীলাচলধামের সাদর আহ্বান বলিয়া বোধ হইতেছে। আহা! এই সেই নীলাচলধাম যথায় গৌরাঙ্গসুন্দর অষ্টাদশবর্ষকাল অন্তরঙ্গভক্তসঙ্গে মধুরতম লীলা সম্ভোগ করিয়াছিলেন, এই সেই সমুদ্র যাহার কৌমুদীধবলিত নীলাম্বুমধ্যে গৌরচন্দ্র গগনচন্দ্রের মধুরিমায় মোহিত হইয়া ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রাচীন স্মৃতি সকল সহসা জাগিয়া উঠিয়া সকলের চিত্তকে সুখময়, আবেগময়, উৎকণ্ঠাময় করিয়া তুলিল। গোস্বামী মহাশয় প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক বিধুবাবুকে অবলম্বন করিয়া দর্শনে বাহির হইলেন। কোন ভক্ত

তাঁহার কৌপীন ও বহির্ব্বাস বহিয়া চলিলেন। আমরা সকলে পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। এদিকে স্ত্রীলোকেরাও দিদিমাকে আশ্রয় করিয়া মহোল্লাসে দর্শনে চলিলেন। গোস্বামী মহাশয় বাসা হইতে বাহির হইয়াই শ্রীমন্দিরকে প্রণাম করিলেন এবং পতিতপাবন ঠাকুর দর্শন করিয়া তৈলঙ্গী গরু সকলকে ঘাস ক্রয় করিয়া দিলেন। তিনি যখনই বাহির হইতেন গোসকলকে ঘাস ক্রয় করিয়া খাওয়াইতেন। অনন্তর শ্রীরাধাকান্ত মঠ দর্শন করিবার নিমিত্ত চলিলেন। ইহাই সেই 'পরম নির্জ্জনে' কাশী মিশ্রের একখানি ঘর।' ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ ইহারই গম্ভীরায় স্বরূপ রামরায়ের গলা ধরিয়া কলসী কলসী নয়নজল ঢালিয়াছিলেন ও দিব্যোন্মাদে 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কৃষ্ণ-বিরহপাথারে ডুব দিয়াছিলেন। একদিন রজনীতে শ্যামবিরহে আকুল হইয়া গোরাচাঁদ ইহারই ভিত্তিতে চাঁদমুখ ঘর্ষণ করিয়া শোণিতপাত করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রভু শচীনন্দন নামে আঁখিজলে ভাসিয়া যান; আজ তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গলীলাস্থলে উপস্থিত। তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা ক্ষুদ্র কীট আমরা কিরূপে ধারণা ও বর্ণনা করিব? বাহ্য দৃষ্টিতে যাহা দেখিলাম, তাহাই বলিতেছি। তিনি বহির্দ্বারে প্রণাম করিয়া ভাবে ডগমগ হইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভিতরে প্রবেশ করিয়া গম্ভীরা দর্শন করিবামাত্র তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, ভাবের প্রবল তরঙ্গ ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহাকে জর্জ্জর করিয়া তুলিল; তিনি অধীর হইয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গম্ভীরা লীলা খরস্রোতে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। এইরূপে কিয়ৎকাল অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলে তিনি অপূর্ব্ব ধৈর্য্যসহকারে ভাবসংবরণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর ছিন্নকন্থা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "আহা! সেবকেরা এই স্থানের প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; এখন

যেটি গম্ভীরা বলিয়া কথিত, এইস্থানে পূর্ব্বে একখানা কুটীর ছিল, তাহাতেই মহাপ্রভু অবস্থিতি করিতেন; এখন সেখানে দালান হইয়াছে।"

অতঃপর আমরা সমুদ্রস্নানে চলিলাম। কিছুদূর হইতে অপার জলরাশির গভীর নীলিমা ও উত্তাল তরঙ্গ দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় সকলেরই মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উথলিয়া উঠিল। আমরা চরিতামৃতোক্ত চটক পর্ব্বত প্রভৃতি কোথায় বলিয়া পরস্পরকে প্রশ্ন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম। গোঁসাই বিধুবাবুকে অবলম্বন করিয়া স্বর্গদ্বারে স্নান করিলেন এবং পথে কাঙ্গালদিগকে কিছু পয়সা দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই সমুদ্রস্নান করিতেন।

অন্য এক দিবস আমরা ভক্তচূড়ামণি হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান দর্শন করিতে চলিলাম। গোঁসাই শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদক্ষিণ কোণের রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া টোটা গোপীনাথের সম্মুখস্থ বটবৃক্ষমূলে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল গোপীনাথের বিগ্রহ দর্শন করিয়া সমাধিস্থান দর্শন করিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে গদাধর পণ্ডিতের সর্ব্বস্ব ছিলেন বলিয়া অদ্যাপি তাঁহাকে ভক্তগণ 'গদাধরের প্রাণ' বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন, সেই গদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্রসেবা অবলম্বন করিয়া এই গোপীনাথের সেবা করিতেন। কথিত আছে মহাপ্রভু এই বিগ্রহে বিলীন হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন; এই বিগ্রহের উরুদেশে একটি স্বর্ণরেখা আছে, সেবকগণ তাহাই মহাপ্রভুর চিহ্ন বলিয়া যাত্রিগণকে দর্শন করাইয়া থাকেন। পূজারি দ্বার খুলিয়া দিলে গোঁসাই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলেই দর্শন করিলাম। গোঁসাই পূজারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'গোপীনাথের উরুদেশে যে স্বর্ণ-রেখা মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান আছে তাহা দেখাইতে পার?" পূজারি ।৴০ দর্শনী চাহিল; তাহাতে তিনি দর্শন না করিয়াই চলিয়া আসিলেন।

বোধ হয় তাহাকে শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, মূর্খ পূজারি যদি কিছু না চাহিত, তাহা হইলে আশাধিক ফললাভ করিত। অতঃপর আমরা হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান দর্শন করিতে চলিলাম। মনে কত কথাই উঠিতে লাগিল। এই হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু স্বয়ং বালুকা খুঁড়িয়া সমাধিস্থ করিয়াছিলেন; ইহাঁরই জন্য স্বয়ং আনন্দবাজারে অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন লীলা এক একটি করিয়া চিত্তে উদিত হইয়া দর্শনে ঔৎসুক্য জন্মাইতে লাগিল। এইরূপে ধীরে ধীরে বালুকারাশি অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমরা সমাধি স্থানে উপনীত হইলাম। পথে ক্ষুদ্র দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ প্রাপ্ত হইলাম। সম্মুখে দুইটি চিত্র প্রকাশিত হইল। পুরোভাগে জলনিধি অগাধ গম্ভীর, আমাদের সমক্ষেও গোস্বামী মহাশয়ের ভাব অগাধ, গম্ভীর। সমুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু তিনি ধৈর্য্যে সমুদ্রকে পরাজিত করিয়া ছন। তিনি সমাধি দর্শন, প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিয়া ধীরে ধীরে স্বর্গদ্বারের ঘাটে চলিলেন। পথিমধ্যে বিদুরের মঠে উপস্থিত হইলেই তথাকার পূজারি কিছু খুদের পিঠা, তুলসীর শাক ও পানীয় জল দিলেন। আমরা গোস্বামী মহাশয়ের চতুর্দ্দিকে বসিয়া মহানন্দে উহা ভোজন করিলাম। যোগজীবন তিন টাকা প্রণামী দিলেন। মণিবাবু অনেক শাক ও কুলের আচার চাহিয়া লইয়া ভোজন করিলেন। এইরূপে ক্লান্তি দূর করিয়া সমুদ্রস্নান করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে গোঁসাই নানাবিধ গল্প করিয়া সকলকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

পরদিন গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্বোক্ত রাস্তা দিয়াই চটকপর্ব্বতদর্শনে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপদামোদরের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি গোঁসাইর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। গোঁসাই আরও বলিলেন, অদ্যাপি মহাপ্রভু নিশীথসময়ে টোটা

গোপীনাথ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সৈকত ভূমিতে বিচরণ করেন। এই কলিকাল ভরিয়া তাঁহার চিন্ময় দেহে লীলা চলিবে। চটকপর্ব্বত বালুকার পাহাড়; এই চটকপর্ব্বত দর্শন করিয়া দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধনভ্রম হইয়াছিল; গোঁসাই এই সকল কথা স্মরণ করিয়া আকুল হইয়া দর্শনে চলিলেন। তিনি বহুকষ্টে চটকপর্ব্বতে উঠিয়া কিছুক্ষণ দর্শনাদি করিয়া ধীরে ধীরে নামিলেন; অতঃপর হরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকট দিয়া আসিতে আসিতে আমাদের সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমরা খুব সতর্ক হইয়া সমুদ্রস্নান করিবে। আমার মনে হইল তোমাদের মধ্যে একজনকে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।' আমরা এই কথায় বিশেষ মনোযোগ করি নাই। কে জানিত কিছুদিন পরে নিয়তির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে সমুদ্র স্বামী দেবপ্রসাদকে গ্রাস করিবে? অতঃপর আমরা বাসায় ফিরিলাম। এই সময় একদিন শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় শ্রীমন্দির হইতে আসিয়া বলিলেন, 'আমি মন্দিরে যাইয়া খুঁজিতেছি রাধারাণী কোথায়? দেখি তিনি রত্নসিংহাসনের এক কোণে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এ স্থানে কি ব্রজলীলাও হয়?' গোঁসাই বলিলেন, 'হাঁ, তাও হয়, এস্থানে সকল লীলাই হইয়া থাকে।'

একদিন আমরা গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী দর্শন করিতে চলিলাম। এই মঠকে এখন গঙ্গামাতার মঠ বলে। তিনি যে গৃহে বেদান্ত পড়াইতেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মহাপ্রভু এই স্থানেই তাঁহার নিকট সাত দিন বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, পরে কৃপা করিয়া ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইলে তিনি মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্রিত ষড়্ভুজ মূর্ত্তি অদ্যাপি ঐ গৃহের ভিত্তি অলঙ্কৃত করিতেছে; তিনি শ্রীমন্দিরের মুক্তিমণ্ডপেও একখণ্ড প্রস্তরে ঐ মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে স্থানে যাহা

আছে, গোস্বামী মহাশয় তন্ন তন্ন করিয়া তৎসমুদয় দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

আমরা আর একদিন গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সিদ্ধবকুল মঠ দর্শন করিতে চলিলাম। এই স্থানে হরিদাস ঠাকুর ভজন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতিদিন এই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া যাইতেন। গোস্বামী মহাশয় মঠের ভিতরে গিয়া ষড়্ভুজ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। মহান্ত বাবাজী তাঁহাকে খুব সম্মান ও আদর করিয়া এক খানা নামাবলী দিলেন। তিনি উহা আদর ও যত্ন করিয়া মাথায় বাঁধিয়া লইলেন। এই স্থানে কিছু অধিক দর্শনী দেওয়া হইল। অমৃত বাবু একটি পাকা বকুল ফল কুড়াইয়া আনিয়া গোঁসাইর হাতে দিলেন; তিনি তখনই উহা খাইয়া ফেলিলেন। মহান্ত বাবাজী কিছু দিন তাঁহাকে পুরীতে থাকিতে অনুরোধ করিলে গোঁসাই বলিলেন, 'মহাপ্রভু এখানে ১৮ বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, আমি কি ১৮ মাসও থাকিতে পারিব না?' তাঁহার ইচ্ছা প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি ১৫ মাস এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে গোঁসাই একদিন কুঞ্জ ও সারদাকে বলিলেন, ঐ যে সিদ্ধ বকুল বৃক্ষটি দেখিয়াছ, উহা হরিদাস ঠাকুরের তপঃপ্রভাবের ও মহিমার নিদর্শনস্বরূপ একটি বীজরূপে পরিণত হইয়াছে।' আমরা একদিন উহা অনুসন্ধান করিতে সিদ্ধ বকুলে গিয়া দেখিতে পাইলাম, বৃক্ষটি যথার্থই বাঁকিয়া বাঁকিয়া একটি প্রণবাকারে পরিণত হইয়াছে।

একদিন আমরা চক্রতীর্থ দর্শন করিতে চলিলাম। গোঁসাই অদ্য অতি প্রত্যূষে বাহির হইয়া মন্দিরের নিকটে টিনদাস বাবাজী ও অন্য একটি সাধুকে কিছু পয়সা ও গো-সকলকে ঘাস ক্রয় করিয়া দিলেন। বালির মাঠ দিয়া চলা বড় ক্লেশকর বলিয়া কাছারির রাস্তায় চলিলেন। চক্রতীর্থের নিকটে দুই একটি মন্দির আছে, তথা হইতে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া ঐ স্থানে

অবশ্যকরণীয় ক্রিয়াকলাপ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চক্রতীর্থে জল অতি অল্প, গোঁসাই কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উঠিলেন, আমরা শুইয়া স্নান করিলাম। পাণ্ডাদের আদেশে বালুকায় মন্দির প্রস্তত করিতে লাগিলাম; কেহ কেহ তীর্থের কার্য্য-কলাপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, ক্ষীরোদসাগর হইতে আসিয়া ব্রহ্মদারু ইহার চড়ায় লাগিলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অতিসমাদরে অর্চ্চনা করিয়া উহা যজ্ঞবেদিমন্দিরে লইয়া যান এবং স্বয়ং ভগবানই বিশ্বকর্ম্মা হইয়া উহা হইতে চারি বিগ্রহ প্রকাশিত করেন। এইস্থানে চক্রনারায়ণ বিগ্রহ আছেন; আমরা গোঁসাইর সহিত তাহা দর্শন করিলাম। পূজারি ভাল মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার জন্য গোঁসাইকে ২৫৲ টাকা চাহিলেন। তখন টাকা সঙ্গে ছিল না, তিনি বাসায় আসিয়া ঐ টাকা লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা গোস্বামী মহাশয়ের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে বিমল আনন্দলাভ করিতাম, ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ গল্প করিয়া আমোদিত করিতেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের বিবিধ সারগর্ভ উপদেশ ও আখ্যায়িকা প্রাণে কতই যে শান্তি ও আনন্দধারা বর্ষণ করিত তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

একদিন গুণ্ডাবাড়ী, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মার্কণ্ডেয় সরোবর; একদিন চটক পর্ব্বত, গোবর্দ্ধনমঠ; এবং অপর দিন নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব, মাসীর বাড়ী প্রভৃতি স্থানে যাইয়া গোঁসাই অর্থ ও বস্ত্র প্রভৃতি দিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব দর্শনের সময় শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্র, শ্রীমতী শান্তিসুধা ও তৎপুত্র দাউজী সঙ্গে ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় দাউজীকে বলিলেন, 'তুই এই মহাদেবের নিকট প্রার্থনা কর, তোর যেন বিবাহ করিতে না হয়।' পরে তাহার বিবাহযোগ্য বয়স হইলে তাহার অনিচ্ছায় পিতামাতা তাহাকে বিবাহ করাইলে কিছু দিন পরে সে দেহ ত্যাগ করিল। তখন গোঁসাইর নিষেধের কারণ বুঝিতে পারিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁহারা ম্রিয়মাণ হইলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্নে গোস্বামী মহাশয় কচ্ছপদিগকে আহার প্রদান করিয়া তাহাদের ভোজন সন্দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দুই একটী ঘটনা ঘটে, তাহা এই স্থানেই শেষ করিয়া রাখি। একদিন দুইজন সাহেব গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন কি না ও কোন্ সময়ে সুবিধা হইবে তাহা জানিতে চাহেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আসিয়া দেখা করিতে পারেন, তাঁহার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। যদি তাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তবে পরদিন প্রাতে ১০টার মধ্যে আসিবেন। তাঁহারা এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের সম্মানার্থ বসিবার জন্য দুইখানা চেয়ার অন্য স্থান হইতে আনাইয়া রাখিলেন। পরদিন তিনি তাঁহাদের আসিবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু তাঁহারা যথাসময়ে না আসায় তিনি নিজের প্রাত্যাহিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু কাল পরে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন, 'আমি তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া এখন আমার নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি; সুতরাং এখন সাক্ষাৎ হইবে না, ক্ষমা করিবেন।' তাঁহারা এই সংবাদ শ্রবণে নিজেদেরই ত্রুটি হইয়াছে স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। গোঁসাই প্রতিমুহূর্ত্তটী কিরূপে নিয়মে কাটাইতেন তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

অন্য একদিন একটি সাহেব আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আহার করিতে চাহিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আহার করিতে আপনার ইচ্ছা? তিনি বলিলেন, 'আপনি যাহা দিবেন তাহাই আহার করিব। তখন তাঁহাকে তিনি একটি টাকা দিতে বলিলেন। সাহেব বলিলেন, 'আমি টাকা লইয়া কি করিব? ক্ষুধার সময় আমাকে খাইতে দিন।' তিনি বলিলেন, "এখানে আমাদের আহারের জন্য মহাপ্রসাদ

আছে, তাহা খাবেন কি?” সাহেব বলিলেন, তাহাই খাইব। তখন মহাপ্রসাদ তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি খুব তৃপ্তি ও আনন্দের সহিত উহা আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বানরবধ।

গোস্বামী মহাশয়ের ৺পুরীধামে অবস্থানকালে বানরবধের মহাধূম পড়িয়াছিল, মিউনীসিপালিটী লোক নিযুক্ত করিয়া বন্দুকের গুলিতে বানর বধ করিতেছিলেন। এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে বধ করা কতদুর অন্যায় ও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

গোস্বামী মহাশয় প্রাতে সমুদ্রস্নানে যাইয়া এবং অপরাহ্ণে রাস্তায় বাহির হইয়া যেখানে সেখানে এই হৃদয়বিদারক বীভৎস কাণ্ড দর্শন করিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিতেন না। স্থানে স্থানে বানরগুলি মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইতেন। কোন স্থানে মাতৃহীন শিশু বাচ্চাটী তাহার মাতৃ-অঙ্কে লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে। মা যে মৃত, অবোধ হতভাগ্য শিশু তাহা বোঝে না, লোকের ভয়ে মার ক্রোড়ে যাইতে পারিলেই সে নিরাপদ্ মনে করে, তাই মাকে টানিতেছে; কিন্তু মা, তাহাকে ধরে না, কোলে করে না, সে জন্য মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন নির্দ্দয় লোক দেখা গেল যে, মা-মরা বাচ্চাগুলিকে নিরর্থক ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কোথাও মা ও সন্তান মৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও বা এক একটা বানর বীরপুরুষের মত পড়িয়া রহিয়াছে, রক্তে সে স্থান ভাসিয়া যাইতেছে। সেই সময়ে আমরা এক

আশ্চর্য্য কাণ্ড দর্শন করিয়াছিলাম। কোন কোন পুরুষবানর মাতৃহীন শিশু-বানরকে পৃষ্ঠে ও বক্ষে বহন করিয়া পালন করিতেছে।

এই বীভৎস নিষ্ঠুর কাণ্ড দর্শন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের কোমল প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিল। চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সমুদ্রস্নানে ও মন্দিরে যাইতে এবং রাস্তায় বাহির হইলে যেখানে সেখানে এই প্রকার নির্দ্দয় কার্য্য দেখিতে পাইয়া ইহার প্রতিকারের জন্ম দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তিনি এমন ধীরভাবে সংবাদপত্রসকলে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করাইয়াছিলেন যে, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষময়, কি বাঙ্গলা কি ইংরেজী পত্রিকাসমুদয়ে বানরবধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইল। ইহা দেখিয়া একজন বিজ্ঞলোক বলিয়াছিলেন, আন্দোলনকারী অতিশয় অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এই সময় মন্দিরের প্রাচীরসংলগ্ন একটা পায়খানা নির্ম্মিত হইতেছিল; তাহাও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত করাইয়াছিলেন। বানরবধ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য পুরী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইল।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ এই সময়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থানীয় লোকদের সহিত মিশিয়া কে কি বলে খবর সংগ্রহ করিয়া গোঁসাইকে জানাইত। একজন উড়িয়া কমিশনর পান্নার নিকটে বলিল, "অমৃত বাজার পত্রিকা" আমাদিগকে ভীরু উড়িয়া বলিয়া গালি দিয়াছে। আচ্ছা—দেখিব, তোমরা কি করিয়া বানর মারা বন্ধ কর।

এদিকে চেয়ারম্যান সাহেব দরখাস্ত পড়িয়া বানর মারা সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি কি, ইহা স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে সংগ্রহার্থে একমাসকাল বানর মারা বন্ধ রাখিলেন।

শ্রীমন্দিরের গায়ে পায়খানা হইতেছে, ইহা শুনিয়া সংবাদপত্র-

সম্পাদকেরা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন; কমিশনরসকল ও চেয়ারম্যান সাহেব ইহা দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র সভা আহ্বান করতঃ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে স্থির করিলেন। একদিন সহকারী চেয়ারম্যান শ্রীযুত জগবন্ধু পট্ট-নায়ক মহাশয় গোঁসাইর নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমরা শীঘ্রই পায়খানা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এ বিষয়ে আপনারা আর আন্দোলন করিবেন না।

একমাস বানর মারা বন্ধ হইল। এ বিষয়ে শাস্ত্রবিধি চেয়ারম্যান সাহেব জানিতে চাহেন, এই বলিয়া সংবাদপত্রসমূহে তার করা হইল। এই স্থানের জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মহাশয় একদিন গোঁসাইর সহিত সন্ধ্যাকালে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইনি জাতিতে উড়িয়া ব্রাহ্মণ। গোঁসাই বানর মারা শাস্ত্রসংগত কি না প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ইনি বলিলেন, আমাদের দেশে বানর মারা ত দূরের কথা, একটী আরশুলা মারিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইত্যাদি।

স্বামী দেবপ্রসাদ ও সতীশচন্দ্র (ছোট সতীশ) বানর মারা বন্ধ করাইবার নিমিত্ত গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশমতে খুব খাটিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে বানরবধ অশাস্ত্রীয় ও অন্যায় উল্লেখ করিয়া আরও বহুতর লোকের স্বাক্ষর করাইয়া আর একখানা দরখাস্ত করা হইল। স্বামী দেবপ্রসাদ মঠে মঠে যাইয়া নাম সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; সতীশও বহুতর লোকের নাম স্বাক্ষর করাইলেন।

এই সময়ে স্বামী দেবপ্রসাদ একখানা অতি সুন্দর সংস্কৃত পাতী প্রস্তুত করিলেন; উহাতে শাস্ত্র হইতে বানরবধ অন্যায়, এইরূপ বহুতর যুক্তিযুক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। স্থানীয় পণ্ডিতেরা উহার প্রশংসা করিয়া উহাতেই আপনাদের নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিলেন। গঙ্গামাতার মঠে, রাজগোপাল মঠে, গোবর্দ্ধন মঠে, ও অপরাপর মঠে, স্বামীজি যাইয়া পণ্ডিতদের মত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। গঙ্গামাতার মঠের

একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অন্যান্য বহু সাধু ও সজ্জন লোক উহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

এক দিন গোঁসাই সতীশকে উকীল হরিবল্লভ বসু মহাশয়ের নিকটে পাঠাইলেন। তিনি এস্থানে একজন বিশেষ সম্মানিত ও বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার কথা সকলেই সাদরে ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। তিনি উকীল ছোট হরিশ বাবু ও জগবন্ধু পট্টনায়ককে বলিয়া কহিয়া একার্য্য বন্ধ করাইতে পারেন কিনা, এই অভিপ্রায়েই সতীশকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। হরিবল্লভ বাবুও বানর বধ করা অন্যায় বলিয়া দুঃখ করিলেন, কিন্তু মন্দিরের গায়ে কেন পায়খানা হইবে না তজ্জন্য প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সতীশ যথাযথ সকল কথার উত্তর দিয়া চলিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে ২।৩ জন প্রসিদ্ধ কমিশনর, বানর বধ করিতেই হইবে, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উড়িয়া লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উল্লিখিত কমিশনরগণ জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিতকে এজন্য ধরিলেন এবং বলিলেন আপনাকে বানরবধ করা উচিৎ এই সম্বন্ধে একখানা পাতী প্রস্তুত করিতে হইবে। তিনি ষোল পৃষ্ঠা ভরিয়া বানরবধের যৌক্তিকতা দেখাইয়া একখানা পাতী প্রস্তুত করিলেন, এবং ঐ পাতী শনিবারে স্কুল গৃহে সকলের নিকট পাঠ করিলেন। শুনিলাম, উহাঁরা ঐ পাতীর বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কমিশনরদের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তি পণ্ডিতদের নাম ঐ পাতীতে স্বাক্ষর করাইতে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা অনুকূলে কোন সুপণ্ডিত প্রাপ্ত না হইয়া, ছাত্রপণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজনের নাম স্বাক্ষর করাইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য মনে করিলেন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে এই হেড্ পণ্ডিত মহাশয় যাহা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মনে আছে। এইরূপ পরমুখাপেক্ষী পণ্ডিতেরাই দেশের সমূহ অকল্যাণ করিয়াছেন। ইহাঁদের পণ্ডিত উপাধি

অপাত্রে ন্যস্ত করা হইয়াছে মনে হয়। পুনরায় এক দিন ইনি গোঁসাইর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। স্থানীয় বড় বড় পণ্ডিতগণ স্বামীজির পাতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া গোঁসাই তাঁহাকে সেই পাতিতে স্বাক্ষর করিতে বলেন; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়, অম্লানবদনে আজ বলিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে আমাকে নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, যথার্থই বানর বধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না? গোঁসাই শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে শুনিলাম, হেড্ পণ্ডিতের ভ্রাতার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, পরিবারে নানা উৎপাত, বিপদ-আপদ উপস্থিত হইয়াছে। গোঁসাই শুনিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণের পাপের ফল আশু ভোগ করিতে হয়। এইরূপ বিপদে পতিত হইয়া পুনরায় একদিন হেড্ মাষ্টার সহ কাতরভাবে গোঁসাইর নিকটে আসিয়াছিলেন।

স্থানীয় উকীল শ্রীযুত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিউনীসিপালিটীর একজন কমিশনর। সতীশ একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বানর-বধসম্বন্ধে আলোচনা করে। বিধুবাবু বানর মারার বিরুদ্ধে সভাস্থলে বাদ-প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া স্বাক্ষর করিলেন। তিনি অতঃপর এ বিষয়ে শাস্ত্রসংক্রান্ত যৌক্তিকতা শুনিতে ২।৩ দিন আমাদের বাসায় আসেন। সকল বিষয় তিনি গোঁসাইর নিকটে জানিয়া শুনিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি লইয়া যান। তিনি গোঁসাইর নিকটে আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হন। তিনি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং বলেন বানর মারার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদ পাইবেন। তিনি ভিন্ন মিউনীসিপালিটীতে বানরদের প্রাণরক্ষার জন্য দুটা কথা বলে এমন কেহ ছিল না।

শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রও বহু যত্ন করিয়া শাস্ত্র হইতে বানরবধ যে অসঙ্গত ও অহিংসাই পরমধর্ম্ম এ সম্বন্ধে নানাবিধ শাস্ত্রবাক্য সংগ্রহ করিয়া এক পাতী

তৈয়ার করিলেন, গোঁসাই এই পাতী শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে তত্ত্ববাগীশ উপাধি দিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামী দেবপ্রসাদ সমুদ্রে ডুবিয়া প্রাণ হারাইলেন। ইহা শুনিয়া বানরবধের পক্ষপাতী দল উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, মরিবে না ? আমাদের বিরুদ্ধে চেষ্টা ; দেখ, ধর্ম্ম আছে কি না।

যে দিন বানর মারা সম্বন্ধে মিউনীসিপালিটীর সভাতে শাস্ত্রীর যৌক্তিকতা লইয়া আলোচনা হইবে, বিধুবাবু স্বামী দেবপ্রসাদের লিখিত পুরীর প্রসিদ্ধ সাত জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত পাতী ও সতীশের শাস্ত্রোদ্ধৃত বচন সকল, মহাভারতের অহিংসাসংক্রান্ত হরগৌরীসংবাদ প্রভৃতি সভাস্থলে পাঠ করিবার জন্য লইয়া যান ; কিন্তু মিউনীসিপালিটী অভিসন্ধিপূর্ব্বক পূর্ব্বেই সভা আহ্বান করতঃ বিধুবাবুর সভাস্থলে যাইবার আগেই সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বানর মারার স্বপক্ষে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের মিউনীসি-পালিটীর নিকটে আবেদন, নিবেদন ও সকল প্রকার শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ এবং চেষ্টা পণ্ড হইল।

তৎপরদিবস মিউনীসিপালিটী যুক্তি করতঃ যে প্রকারে অতিসত্বর বানর-বংশ ধ্বংস করা যায়, তাহার উপায় স্থির করিয়া চারি পাঁচ জন শিকারী বানর-বধের জন্য নিযুক্ত করিলেন। পুনরায় প্রবল উদ্যমে বানরবধসাধন হইতে লাগিল। তাহাদের রক্তে আবার পুরীধামের ধরাতল সিক্ত হইতে লাগিল।

এই ঘটনা দেখিয়া ও শুনিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। যোগজীবন গোঁসাই ক্রোধে ও ঘৃণায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন গোঁসাইর আদেশমতে সমস্ত ঘটনা ভার করিয়া অমৃত বাজার, মিরার, বেঙ্গলী ও বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় পাঠান হইল। সমস্ত বঙ্গদেশ, বেহার, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এই ব্যাপার লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় উড়িয়াদের এই অসঙ্গত ও অন্যায় কার্য্যের জন্য তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মিষ্টভাবে গালি দিয়া সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। মিরার, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পত্রিকার সম্পাদকেরা একবাক্যে এই নৃশংস কার্য্যের অন্যায্যতা দেখাইয়া তুমুল আন্দোলন করতঃ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।

নানাস্থানে আহূত সভা হইতে বানরবধ অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় এই মর্ম্মে ছোট লাট বাহাদুরের নিকট আবেদন হইতে লাগিল। কাশী হইতে পণ্ডিতগণ সভা করিয়া, ঢাকা হইতেও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের উদ্যোগে, পণ্ডিতেরা এক সভা করিয়া ছোট লাটের নিকট আবেদন প্রেরণ করিলেন। মান্দ্রাজ, কলিকাতা ও অন্যান্য বহুস্থান হইতে ঐরূপ আবেদন পুরী মিউনীসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ সাহেবের নিকটে করা হইয়াছিল।

এই সময়ে ভবানীপুরের উকিল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বানরবধের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরসহ এক পাতী পাঠাইলেন। ৺ রাজেন্দ্রলাল শাস্ত্রী ও কতিপয় পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত পাতি শ্রীযুক্ত মণিবাবু ছাপাইয়া পাঠাইলেন এবং বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া ও তাঁহাদের পাতিসকল একখানা পুস্তকাকারে ছাপাইয়া মণিবাবু পুরী মিউনীসিপালিটীর সভাপতির নামে পাঠাইলেন। আমাদিগকেও উহা দুই চারি খণ্ড পাঠাইয়াছিলেন। ঐ পুস্তিকায় বঙ্গদেশ ও নানাস্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর মত ছিল। সকলেই একবাক্যে ইহার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া প্রতিবাদ করিলেন।

মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর এইরূপ নানাস্থানে ভয়ানক আন্দোলন দেখিয়া কটকের কমিশনর সাহেবের নিকট বানরমারা বন্ধ করাইতে তার করেন। কমিশনর সাহেব উহা পুরী মিউনীসিপালিটীর সভাপতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে তখন বানরবধ বন্ধ হইল।

এক মাস বানরমারা বন্ধ থাকার পরে যখন মিউনীসিপালিটী পুনরায় প্রবলবেগে উহাদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে সময়ে উহারা কোথাও লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। রাস্তায়, ঘাটে, গাছে, দালানে বা বাড়ীর চালে, কোথাও নিরাপদে থাকিবার স্থান না পাইয়া ও উপায়ান্তর না দেখিয়া কতকগুলি বানর গোঁসাইর ঘরে প্রবেশ করিল। যেস্থানে সকলে বসে, সেই স্থানে তাহারা বাচ্চাগুলি কোলে লইয়া অতি বিমর্ষভাবে একদৃষ্টে গোঁসাইর পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে কেহ তাড়াইলেও আজ আর বাহির হইতে চায় না। তাহাদিগকে আহার দিলেও খায় না; কেবল বসিয়া বসিয়া অব্যক্ত ভাষায় কাতর প্রাণে যেন গোঁসাইর নিকটে তাহারা মনোবেদনা ব্যক্ত করিতেছে বোধ হইল।

শিকারীরা বাহির হইতে গোঁসাইকে দেখাইয়া দেখাইয়া বানরদিগকে লক্ষ্য করতঃ বন্দুক উঠাইয়া ধরিতে লাগিল। বোধ হইল যেন কাহারও ইঙ্গিতে তাঁহাকে অপমানিত ও অগ্রাহ্য করিবার অভিপ্রায়েই এরূপ ব্যবহার চলিয়াছে।

মহামান্য ছোটলাট উড্‌বরণ সাহেব যখন পুরীতে আগমন করেন, স্থানীয় মিউনিসিপালিটি তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র দেন। অভিনন্দনপত্র পঠিত হইলে তিনি বলিলেন—"আপনারা বানর মারার কথা ত কিছু উল্লেখ করেন নাই। এ বিষয় লইয়া দেশময় আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু আপনারা সে বিষয়ে একেবারে নীরব কেন?" উত্তরে তাঁহারা বলেন—"এ বিষয়ে আপনাকে অন্য সময়ে বলিব।" তিনি বলিলেন—"না, বানর মারিতে পারিবেন না।" তাঁহারা বলিলেন, "বানর বড় উদ্বেগ করে।" তাহাতে তিনি বলিলেন—"বানর কোন উদ্বেগ জন্মাইলে না মারিয়া, ধরিয়া অন্যত্র পাঠাইলেই হইবে। যদি সহজে ধরিতে না পারা যায়, তাহা হইলে খাদ্যের সহিত কিঞ্চিৎ অহিফেন মিশাইয়া দিলে বানরেরা একপ্রকার অবশ হইয়া পড়িবে, তখন

সহজেই ধরিতে পারা যাইবে।' তাহাতে আপত্তি করায় তিনি নিজের একটী অভিজ্ঞতার ঘটনা বলিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি যখন ফৈজাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, তখন তাঁহার কুঠীতে বানর সকল আসিয়া উপদ্রব করায় একদিন তিনি একটা বানরকে গুলি করিয়াছিলেন। বানরটী আহত হইয়া উঁহার নিকটে আসিয়া এরূপ যন্ত্রণার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাহাতে তিনি মনে করিলেন যেন একটী নরহত্যা করিয়াছেন। এই অনুতাপ তিন বৎসর কাল তাঁহাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়াছিল। এই ঘটনাটী বলিয়া তিনি বানরবধসম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

সপরিষদ লাটসাহেব পরদিন সকালবেলা হাতীতে চড়িয়া যখন চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া মন্দিরাদি দর্শন করিতেছিলেন, তখন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোককে পশ্চিম দরজায় জিজ্ঞাসা করেন, "বানরমারা কি উচিত?" ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন, 'না।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'ঠিক সাচ্চা বাত বলিয়াছ।'

ছোট লাট সাহেব যখন তাঁহার কুঠিতে গমন করিলেন, তখন কতকগুলি উড়িয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে কুঠী পর্য্যন্ত যাইয়া চীৎকার করিয়া কেবল মাকড়, মাকড় বলিতে লাগিল। তাহাতে তিনি হাতী হইতে নামিয়া প্রহরীদিগকে আদেশ দিলে তাহারা উহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল। বানরগুলি গোস্বামী প্রভুকে এতই বিশ্বাস করিত যে, ঘরে তাঁহার নিকট ছোট ছোট বাচ্চাগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া সুখে নিদ্রা যাইত। বাচ্চাগুলিও তাঁহার নিকটে বসিয়া অসঙ্কোচে আহারাদি করিত। আমাদের হাত হইতে কখন কখন উত্তরীয় বা পরিধেয় বস্ত্র উঠাইয়া আহার্য্য বস্তু পাইলে গ্রহণ করিত। ইহারা গোঁসাইর হাত হইতেও আহার লইয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আহার করিত। জনৈক হিন্দুস্থানী গোঁসাইর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ইনি ত সহজ লোক নন, ভালবাসিয়া বনের পশুকেও বশ

করিয়া ফেলিয়াছেন।” আমরা পূর্ব্বে গোঁসাইর নিকটে শুনিয়াছিলাম, “যাঁহার হিংসা দূর হইয়াছে ও সর্ব্বজীবে ভালবাসা জন্মিয়াছে, তাঁহার নিকট পশুপক্ষী কোন প্রাণীই ভয় প্রাপ্ত হয় না। অধিকন্তু তাহারা তাঁহাকে আপনার মনে করিয়া তাঁহার বশবর্ত্তী হয়।”

অতঃপর ধীরে ধীরে চন্দনযাত্রার সময় আসিল। বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়া হইতে এই যাত্রা আরম্ভ হয় এবং একুশ দিন ব্যাপিয়া ভগবানের এই জলকেলিলীলা হইয়া থাকে। পুরীবাসী সেবক ও জনগণ এই উৎসবে মাতিয়া নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। ইহা পুরীবাসী-দিগের জাতীয় উৎসব।

শ্রীশ্রীমদনমোহন (স্থানীয় লোকেরা কেহ কেহ মদনগোপালও বলেন)। ও রামকৃষ্ণ প্রতিদিন অপরাহ্নে স্বীয় মহিষীদের সহিত অপূর্ব্ব ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া বড়দাণ্ডের রাস্তা দিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে নানারূপ সংকীর্ত্তন, চামরের ব্যজন, গীতবাদ্য ও স্তুতির সহিত অগ্রসর হইতে হইতে চন্দন পুকুরে আসিয়া নৌকায় বিহার করেন। রামকৃষ্ণ এবং পঞ্চ মহাদেব এই দুই বিগ্রহ অন্য নৌকায় আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন। মদন-মোহনের সম্মুখে দেবদাসীরা জয়দেব গান ও নৃত্য করেন। স্থানীয় আখ্‌ড়া পিলা নামক ছোট ছোট ছেলেরা অন্য নৌকায় রামকৃষ্ণ ও পঞ্চ মহাদেবের সম্মুখে অপূর্ব্ব নৃত্য ও গান করিয়া থাকে। বাদ্যকরেরা অন্য নৌকায় দুন্দুভি ও শানাই প্রভৃতির মধুর বাদ্যে আমোদিত করে।

এই নরেন্দ্র সরোবরের ভিতর একটী মন্দির আছে, তাহাতে ভোগ-শালা, ছোট ছোট চৌবাচ্চা ও পঞ্চ মহাদেবের থাকিবার জন্য অপর একটি ছোট মন্দির আছে।

মদনমোহনকে স্বীয় মহিষীদের সহিত তাঁহার স্বকীয় মন্দিরে, চৌবাচ্চায়, অবগাহনচ্ছলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখে ; ইহাতে গ্রীষ্মের তাপ বিদূরিত

হয় ও কিছুক্ষণ তাহাতেই কেলিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। অতি সুগন্ধি বস্তুতে সেই চৌবাচ্চার জল সুবাসিত করা হয়। রামকৃষ্ণ ও পঞ্চ দেবতা অপর চৌবাচ্চায় তদ্রূপভাবে অবস্থিতি করেন।

তৎপর ইহাঁদিগকে তথা হইতে উত্থাপিত ও পুনরায় অপূর্ব্ব ফুলসাজে সজ্জিত করিয়া ভোগ দেওয়া হয়। একুশ দিন প্রত্যহ এক একরূপ নূতন মনোহর সাজে ঠাকুর সুসজ্জিত হন। ফুলসাজ সম্পূর্ণ হইলেই ঠাকুরের ভোগ হয়। অনন্তর বারান্দায় সেই সাজে ঠাকুরকে আনিয়া বসাইলে তাঁহার সম্মুখে আখ্‌রাপিলাদের অপূর্ব্ব নৃত্য, বাদ্য ও গীত হইতে থাকে। সেই সময় সেখানে বিস্তর শ্রোতা ও দর্শকের সমাগম হয়।

পুনরায় নিশীথসময়ে বহু আলোক ও বাজি প্রজ্বলিত করিয়া পূর্ব্ববৎ জলকেলি ও বিহার হইতে থাকে। নরেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিক্রমা করিয়া থাকেন। তখনও বহুলোকের সমাগম হয়। অপরাহ্নের জলকেলি ও বিহারে হাতী, ঘোড়া ও আশাসটা প্রভৃতি আসবাব থাকে। ভক্তদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ ঠাকুরের সঙ্গে চারিদিক্ পরিক্রমা করিয়া চামর ব্যজন করেন।

তৎপর যখন নিশীথসময়ে সেবকদের সহিত ঠাকুর মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার সম্মুখদেশ অপূর্ব্ব দীপমালায় সুশোভিত ও আলোকিত করা হয়। সেবকেরা সুমধুর সুরে জয়দেব গান করিয়া ধীরে ধীরে ঠাকুরকে লইয়া মন্দিরে গমন করেন। এই সময়ের গান অতীব মধুর ও মদনমোহনের বিগ্রহ অত্যন্ত মনোহর হয়। অনেকেই ইহা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান।

গোস্বামী মহাশয় বলিতেন, "ঐ সময়ে যথার্থই বিগ্রহে ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থকে, এমন মধুর সাত্ত্বিক গান কুত্রাপি প্রায় শুনা যায় না।"

গোস্বামী মহাশয় প্রতিদিন আমাদিগকে লইয়া এই উৎসব দর্শন করিতে চন্দনতালাও যাইতেন। কখন কখন বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পরিক্রমাও

করিতেন। বাসা হইতে আসিবার কালে তিনি ঠাকুরকে নমস্কার ও এক টাকা প্রণামী দিয়া ঠাকুরের দোলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেন।

তিনি চন্দনতালায় যাইয়া বড় ঘাটের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত বটবৃক্ষের তলে বসিয়া কখন কখন ধ্যানস্থ হইতেন। কখন কখন কেহ আসিলে কথাবার্ত্তা বলিতেন।

একদিন তথায় বসিয়া ভাবাবেশে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা ওপারে কিছু দেখিতেছ?" প্রায় সকলেই বলিলেন যে কতকগুলি ঘরবাড়ী ও গাছপালা দেখিতেছি। বলিলেন, 'কেমন সুন্দর, কেমন উজ্জ্বল।' আমরা তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। তাঁহার ভাবাবেশে দর্শন, আমরা তাহার কি বুঝিব? আমরা তথা হইতে বাসায় গেলে, পরে একদিন ৺ মহেন্দ্র মিত্র ঐ কথা উত্থাপিত করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'গোঁসাই যখন ঐরূপ বলিতেছিলেন, তখন আমি ঐস্থানটি সাদাসাদা দেখিয়াছিলাম।'

একদিন গোস্বামী প্রভু ছোট সতীশকে বলিলেন, "গত রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রের পাড়ে যে সব সাধু থাকেন, তাঁহাদের বড় কষ্ট। তুমি দেখিলে কেমন? সতীশ বলিল, আমি স্নান করিয়া উহা লক্ষ্য করিয়া আসি নাই।

গোঁসাই বলিলেন, যেদিন কিছু দান না হয়, তাহাকে মনু বন্ধ্যা দিন বলিয়াছেন।

বিধু নরেন্দ্রের পাড়ে যাইবেন বলিলেন ও গোঁসাইর আদেশমত দুটী টাকা যোগাড় করিয়া লইলেন।

সতীশ বলিলেন, পথে একটি সাধু আসিয়া বলিলেন "একটু জল দাও" জল আনিতে গিয়া মনে হইল দুটো প্রসাদও লইয়া যাই। জল ও প্রসাদ লইয়া গিয়া সাধুকে আর পাইলাম না। খুঁজিতে খুঁজিতে ধর্ম্মশালায় গেলাম; তথায়ও না পাইয়া একটি পীড়িত সাধুকে ধরিয়া উহা দিলাম। তিনি মালাজপ

করিতেছিলেন। তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়াতে তিনি বলিলেন, ইহা জগন্নাথস্বামী আমার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ বড় ভাল লাগিল।

গোঁসাই বলিলেন, ধর্ম্মশালায় অনেক ভাল লোক থাকেন। তাহা না হইলে জগন্নাথস্বামী পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিতে পারিতেন না। সাধুদের আস্থানে পৌছিয়া গোঁসাই বলিলেন, "আপনারা কেমন ছিলেন ?" ইতিমধ্যে বিধুবাবু ২৲ টাকা দিলেন। সাধুরা বলিলেন তাঁহারা বড়ই কষ্টে ছিলেন। দুই টাকা হইলে তাঁহাদের একটা কাপড়ের ছাউনী হয়। গোঁসাই বিধুকে ৫৲ টাকা যোগাড় করিয়া আনিতে বলিলেন। বিধু বাসায় গেলেন।

একজন উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়া গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে গৈরিক বস্ত্র দিতে এক ব্যক্তি গোস্বামী মহাশয়কে নিষেধ করেন, কারণ গুরু হইতে গৈরিক পরিধানের অধিকার লাভ হয়।

তৎপর সতীশ ও শ্রীধর স্বস্ব বস্ত্র ছাড়িয়া ঐ সাধুকে দিলেন। তখন গোঁসাই হাসিয়া বলিলেন, "আজ তোমাদের বস্ত্রহরণ হইয়া গেল। চেনাচুর না করিয়া কাহাকেও ছাড়িব না।" সতীশ বলিল—'তাই চাই'। বিধু আসিলে সাধুদিগকে টাকা দেওয়া হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে গোস্বামী মহাশয় নয়েন্দ্রে গেলেন। সাধুদিগকে এক টাকা দেওয়া হইল। তথায় এক ব্রহ্মচারী জনৈক লোক দিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইলেন—"মরণকাল উপস্থিত, একবার দেখিয়া যাইবেন।" গোস্বামী মহাশয় গেলে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চালের ছাউনী নাই, ১০৲ টাকা লাগিবে। চন্দনযাত্রার দ্বার খুলিতে ও ভোগ দিতে ২২৲ টাকা লাগিবে ; এ কুটীর দালান হইলে ভাল হয়, তাহাতেও ৪০০৲ টাকা লাগিবে।" গোঁসাই বলিলেন, "আমাদের যখন যাহা আসে তখনই সব খরচ হইয়া যায় ;

সম্প্রতি হাতে কিছুই নাই।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—'আমার অদৃষ্ট'। গোঁসাই বাসায় আসিয়া তিন দিনের চন্দনযাত্রার ঠাকুরের ভোগের জন্য তিন টাকা ও পরে বুড়া ঠাকুরাণীকে দিয়া ঘর ছাউনীর জন্য ৯৲ টাকা পাঠাইয়াদিলেন।

বৈকালে গোঁসাই নরেন্দ্রের পাড়ের ব্রহ্মচারীর কথা তুলিয়া বলিলেন, বৃদ্ধকালের অবস্থা দেখ, এখন ভগবানের নাম করিবে, কিন্তু তাহা না করিয়া ভোগপরিতৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করিলে সমূহ অকল্যাণ। স্বার্থনাশ না হইলে ভগবানে প্রেম হয় না।"

২২শে জ্যৈষ্ঠ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। আমরা গোস্বামী মহাশয়ের সহিত স্নানযাত্রা দেখিতে গিয়া অনেকক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই স্নানবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার সহিত আসন গ্রহণ করিলাম। আজ দয়িতা সেবকেরা আমাদের দর্শনে যাইতে বাধা দিল। গোঁসাই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তেজের সহিত বলিলেন, "বিধু চল, ঠাকুর কৃপা করিলে অন্যত্রও দর্শন হইবে।" এই বলিয়া চলিয়া আসিলেন। মন্দিরের দক্ষিণ ধারের একটি দরজার নিকটে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দয়িতাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজন তাঁহার নিকট আসিল এবং তাহাঁকে দর্শনার্থ অনুরোধ করিল। তাহারা বলিল, ইহারা না জানিয়া আপনাকে বাধা দিয়াছে, আপনি ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।" ইহাদের অনুরোধে গোঁসাই দর্শনে গেলেন এবং স্নানের সময় স্নান দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলেন।

দয়িতারা গোঁসাইর নিকট কিছু দর্শনী চাহিল। তিনি উহাদিগকে ৪০৲ টাকা দিতে বলিলেন। যোগজীবনের হাতে টাকা ছিল না। শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার পাথেয় বাবদ যে চল্লিশ টাকা রাখিয়া ছিলেন, তিনি হৃষ্টচিত্তে তাহা দয়িতাদিগকে দিয়া গোঁসাইর ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। অতঃপর দয়িতারা খুব যত্ন করিয়া দর্শনাদি করাইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রথযাত্রা।

গোস্বামী মহাশয় যে বৎসর রথের সময় ৺পুরীধামে অবস্থিতি করেন, সে বৎসর দ্বিতীয়া তিথি পুষ্যানক্ষত্র-যুক্ত ছিল। সেই তিথিনক্ষত্রসংযুক্ত সময়ে শাস্ত্রানুমতে রথে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে পারিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তজ্জন্য তিনি যথাসময়ে জগন্নাথদেবকে রথে তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু সে বারে তিথিসংযুক্ত যোগ দুই প্রহরের অধিক ছিল না। তিনি ডেঃ মাঃ জগৎবাবু ও শ্রীযুক্ত শশীবাবু, মুনসেফ শ্রীযুক্ত কিশোরী বাবু, পুঃ ইঃ নারায়ণ বাবু এবং স্থানীয় অন্যান্য লোক দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেট ও রাজার নিকট আবেদন জানাইয়া যথাসময়ে ঠাকুরকে রথে উঠাইবার আদেশ আনাইয়াছিলেন। স্নানযাত্রার দিন হইতেই রথযাত্রার পরে জগন্নাথদেবের পুনরায় রত্নবেদিতে উপবেশন না করা পর্য্যন্ত দৈতা পাণ্ডাদেরই বিশেষ অধিকার আছে। এ সময়ে দৈতা পাণ্ডাগণও যথাসময়ে জগন্নাথদেবকে রথস্থ করিবেন বলিয়াছিলেন। অন্যান্য পাণ্ডাগণ এবং মহাপাত্রগণ (যাঁহারা জগন্নাথদেবের ভোগ রন্ধন করেন), সকলেই যথাসময়ে কার্য্য সমাধা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদেঁর কাহারও ত্রুটি ছিল না, কিন্তু দৈতা পাণ্ডাগণের লালসা ও লোভই প্রবল হওয়ায় ঠাকুরকে যথাসময়ে রথে উঠান হইল না। দৈতা পাণ্ডারা যতক্ষণ জগন্নাথদেবকে বেদিতে রাখিতে পারেন, ততক্ষণই তাঁহাদের অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা; তাই তাঁহারা একাযে বিঘ্ন ঘটাইলেন। এসময় অপর পাণ্ডারা ঠাকুরকে রত্ন-বেদি হইতে নামাইয়া পণ্ডি করাইয়া রথে তুলিতে পারেন না; সুতরাং আর অন্য কোন উপায় হইতে পারিল না।

যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দৈতা পাণ্ডাগণ রথে তুলিলেন, তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ণ হইয়াছে। তখন তিথি ও নক্ষত্রের যোগ আর নাই। গোস্বামী মহাশয় রাস্তায় বাহির হইয়া দর্শনে গেলেন না। বাসারই বারান্দায় দাঁড়াইয়া দর্শন করিলেন। আমরা তাঁহাকে যাইতে বলায় তিনি উত্তর করিলেন, এখন জগন্নাথদর্শনের যে ফল, সর্ব্বদা মন্দিরে দর্শনেরও সেই ফল। শাস্ত্রে যে বিধান আছে "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে," এখন দর্শনে আর সে ফল হয় না। সে ফল কেবল দ্বিতীয়া তিথি পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত থাকিলেই হয়, নচেৎ নহে। এদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম, ও সুভদ্রা রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডাবাড়ীতে গমন করিলেন. তথায় অষ্টাহ থাকিয়া দশমীর দিন যথাসময়ে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরে রত্নবেদিতে উপবেশন করিলে পূর্ব্ববৎ সেবা পূজা হইতে লাগিল এবং রথযাত্রামহোৎসব সমাপ্ত হইল।

পরে ঝুলন পূর্ণিমা আসিল। ঝুলন পূর্ণিমা দিবস গোস্বামী প্রভুর জন্মদিন। প্রতি বৎসর এই তিথিতে জন্মোৎব হইয়া থাকে। শ্রীযুক্তা দিদিমাতাঠাকুরাণী, যোগজীবন গোস্বামী ও বিধুভূষণ ঘোষের ইচ্ছা হইল খুব উত্তমরূপে এবার জন্মোৎসব করেন। গোস্বামী প্রভুকে এবিষয় জ্ঞাত করা হইল। তিনি বলিলেন, "তোমরা যদি কাঙ্গালীদিগকে ভাল করিয়া আহার করাইতে পার, তবে আমি বড় প্রীত হই।" যোগজীবন টাকার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিধু ঘোষ সমস্ত ব্যয়ভার বহনের ভার লইলেন। যোগজীবন গোস্বামী ৪।৫ শত টাকা ব্যয় করিয়া কাঙ্গালীদিগকে কাণিকা, পিষ্টক, দধি ও নানারূপ উৎকৃষ্ট প্রসাদ আনাইয়া ভোজন করাইলেন। সেদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণও ভোজন করিলেন। গোঁসাই কাণিকার গন্ধ পাইয়া বলিলেন, আজ জগন্নাথদেব যথার্থই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। দেখ কাণিকা হইতে কি আশ্চর্য্য সুগন্ধ বাহির হইতেছে। কাঙ্গালী সকল উত্তম উত্তম প্রসাদ আকণ্ঠ

আহার করিয়া বলিতে লাগিল, পুরীতে কাঙ্গালীদিগকে এরূপ আদর করিয়া ভাল ভাল প্রসাদ কেহ কোন দিন খাওয়ায় নাই। কত রাজা, জম্বুর রাজা এখানে আসিলেন, কিন্তু কাঙ্গালীদিগকে এমন করিয়া কেহ সন্তুষ্ট করেন নাই। এই কথা বলিতে বলিতে জটিয়া বাবাকে দুহাতে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আমের দিনেও গোঁসাই কাঙ্গালীদিগকে খুব উৎকৃষ্ট আম, মিষ্টান্ন ও মহাপ্রসাদ পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পর দিবস একদল ব্যবসাদার আথরাপিলা জগন্নাথ-বল্লভ মঠে পরলোকগত ভূতানন্দ স্বামীর নিকটে যাইয়া নাচ গান করিতেছিল। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যাইয়া নাচ গান করিতে পারে কি না। এই কথা শুনিয়া স্বামী ভূতানন্দ নিজেই তাহাদিগকে লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গেলেন ও তাঁহার অনুমতি লইয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ হইল। গোস্বামী মহাশয় তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বস্ত্র আনাইয়া দিলেন। ভূতানন্দ স্বামী ঐ কাপড় লইয়া স্বহস্তে তাহাদিগকে প্রদান করিলেন।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনং তদুপাসনমেব।" যিনি ভগবানে প্রীতি করেন, তিনি তাঁহার ইষ্ট-দেবতার প্রিয় কার্য্য সাধন না করিয়া কখনই থাকিতে পারেন না। যদিও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে পূর্ব্বে অনেক ঘটনায় বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছে, তথাপি এবার এই দান ও সেবাকার্য্যে তাহার পরিসমাপ্তি হইল। ভগবান্ শ্রীমদ্‌জগন্নাথদেবের আদেশে এবার এমন ভাবে তিনি মহাদানিরূপে কল্পতরু হইয়া বসিলেন যে, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু অসাধু, ধনী নির্ধন, যে যখন যাহা চাহিয়াছে, তিনি তাহা দিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই বা কখন কুণ্ঠিত হন নাই। এখানে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা কেহ এ দানের প্রতিবাদ করিলে তিনি বলিতেন,—"এ জগন্নাথ-

দেবের দান, কেহ যদি ইহা ভাল ভাবে দেখিতে না পারেন, তবে তিনি এখান হইতে চলিয়া যাউন।" তদবধি সমলোচনা স্থগিত হইল বটে; কিন্তু অবিশ্বাসীর বিরক্তি কি যায়? এবার গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে যাহা দেখাইলেন, এ জীবনে আমরা আর তাহা দেখিব না। তিনি রাস্তায় বাহির হইলে প্রায় ৩।৪ শত লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিত। লোকের ভিড়ে আমরা তাঁহাকে লইয়া রাস্তায় চলিতে মুস্কিলে পড়িতাম। পূর্ব্ব হইতেই ইহা বুঝিয়া পরলোকগত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ জগৎবাবু, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেন প্রভৃতি মহাশয়গণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া লোকের ভিড় থামাইতে চেষ্টা করিতেন। তদ্ভিন্ন পুলিশের লোকও কয়েকজন সঙ্গে রাখিতেন—তথাপি লোকের ভিড় ঠেলিয়া চলা কঠিন হইত। তিনি বলিতেন, "কেহ ইহাদিগকে ধাক্কা দিও না বা তাড়া দিও না।" কাজেই আস্তে আস্তে চলিতে হইত, ২।১ দিন লোকের প্রণাম গ্রহণ করিবার জন্যই এক স্থানেই অনেক সময় হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। বাসার সম্মুখের রাস্তায় সাধু, সন্ন্যাসী, গরীব দুঃখী কাঙ্গালী দিবারাত্র সংঘট্ট করিয়া বসিয়া থাকিত। যখনই তিনি রাস্তায় বাহির হইতেন, তখনই পরলোকগত বিধু ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র ঘোষের স্কন্ধে হস্ত দ্বারা নির্ভর করিয়া আস্তে আস্তে রাস্তা চলিতেন। কোন সময়েই ভিড়ের অবধি ছিল না।

নীলমণি বর্ম্মণের বাড়ী, জগন্নাথ বল্লভ মঠ, মঙ্গু মঠ প্রভৃতি স্থানে একে একে বস্ত্রাদি দান হইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসী গরীব কাঙ্গালী যে যখন তাঁহাকে রাস্তায়, ঘাটে বা বাসায় পাইয়া প্রার্থনা করিত, সে তখনই তাহা পাইত। মন্দিরে যাইয়া তাঁহার নিকট চাহিয়া অনেকে পাইয়াছে। একদিন ব্রজবাসী পাণ্ডা বেণীমাধব শ্রীমন্দিরে ঠাকুরের নিকটে চাহিয়া ৭৫৲ টাকা পাইয়াছিল। একদিন মন্দিরের পাণ্ডারা তাঁহার নিকটে চাহিয়া পাঁচ শত কি ছয় শত টাকা পাইয়াছিল। পুলিশের লোক, কাচারীর আম্লাগণ

ও পেয়েদা প্রভৃতি অনেকেই বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। গরীব দুঃখীদিগকে এমন ভাবে মহাপ্রসাদ আনাইয়া আহার করাইয়াছেন যে জীবনে তাহারা তাহা কখনই ভুলিবে না। তাহারা বলিত, "কে আর আমাদিগকে এমন করিয়া খাওয়াইবে ? আমরা জীবনে কখনও এ সকল উত্তম বস্তু আহার করি নাই।" তখন যত যাত্রী ধর্ম্মশালায় থাকিত, তাহারাও প্রত্যহ আহার করিত। আম, কাঁঠাল, দধি, কন্দ, উৎকৃষ্ট কাণিকা প্রভৃতি মহাপ্রসাদের সঙ্গে তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। তদ্ভিন্ন খাজা, লাড্ডু, জগন্নাথবল্লভী প্রভৃতি প্রদান করিতেন। জগন্নাথ-বল্লভ মঠের বাবাজীরা প্রসাদ পাইতেন। তাঁহার সঙ্গেও প্রায় ৮০।৯০ জন থাকিতেন।

জগন্নাথবল্লভ মঠের একজন বাবাজি আমাকে বলিলেন, "গোস্বামীপ্রভুর একটি কার্য্য বাকী আছে, তাহা হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুসম্পন্ন হয়। এদিকে ত তাঁহার মহাপ্রসাদ, বস্ত্র ও জলপাত্র প্রভৃতি বিতরণের অবধিই নাই। দেশী ও বিদেশী আপামর সাধারণ সকলেই তাহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইতেছে; তাহারও আর বিরাম নাই; কিন্তু চারি সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে একবার মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেই সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয়।

বাবাজি মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আপনিই ত তাঁহাকে একথা বলিতে পারেন।" তিনি বলিলেন, "না, আমি তাঁহাকে বলিতে পারিব না, আপনি বলিবেন।" আমি গোস্বামী মহাশয়কে একথা বলায় তিনি বলিলেন—বেশ ত করুন। তখন তিনি জগৎ বাবু, মুন্সেফ কিশোরী বাবু, শশীবাবু ও স্থানীয় ভদ্রলোক, ঝিঙ্গারপুরের শ্রীযুক্ত কুলমণি চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজনকে ডাকিয়া জগন্নাথদেবের প্রসাদ বরাদ্দ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সকলে একত্র বসিয়া পরামর্শ করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুর ফর্দ্দ করিলেন।

তাঁহাদের ফর্দ্দ করা হইলে তিনি তাহা একবার শুনিতে চাহিলেন।

তদনুসারে তাহা তাঁহার নিকট পঠিত হইল—তিনি আরও বেশী জিনিষ বরাদ্দ করিয়া দিলেন। অনেক জিনিষ উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। বস্ত্র ও ঘটী প্রভৃতি সকলকে দেওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত ছিল।

এখানে লোকদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করিতে হইলে দাতাকে অধিক আয়োজন করিতে বা আয়াসস্বীকার করিতে হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদের সময় হইতে এখানে এমনই আশ্চর্য্য বন্দোবস্ত আছে যে, ইচ্ছা করিলেই প্রাতে বলিয়া সেই দিনই দশ হাজার লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা যায়। আরও সুবিধা, মহাপ্রসাদ পাইতে কাহারও নিমন্ত্রণের অপেক্ষা নাই। তবে সম্মানিত লোকে বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও যান না। এখানে জগন্নাথদেবের এমনই দয়া যে, বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকিয়া কত সাধু সন্ন্যাসী, নিরাশ্রয়, গরীব দুঃখী কাঙ্গালী তাঁহার কৃপায় প্রত্যহ প্রসাদ পাইয়া প্রতিপালিত হইতেছে। সেই জন্যই এখানে কাঙ্গালীর সংখ্যা এত অধিক।

এদিকে চারি সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা স্থির হইলে গোস্বামী মহাশয় একদিন শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজীকে সাধুগণের সেবার ভার দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। পূর্ব্বে প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় তাঁহার সহিত পরিচয় হয়। তিনি তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে আহ্বান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিলেন; আর এখানে মঠবাড়ীসমূহে মর্য্যাদাসূচক কিছু কিছু দেওয়ার রীতি আছে বলিয়া বলিলেন। যথাসময়ে তিনি তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে আহ্বান করিলেন।

মহাপ্রসাদবিতরণের পূর্ব্বদিবস জগন্নাথদাস নানা বাবদে সাধুদিগকে দিবার জন্য প্রায় পাঁচ শত, কি সাড়ে পাঁচ শত টাকার এক ফর্দ্দ লিখিয়া লোকদ্বারা উহা গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। গোস্বামীমহাশয় তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'আমি টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইতে সম্মত নহি। জগন্নাথদেবের অভিপ্রায় হইলে তখন যা হবার হবে। অগ্রে আমি সে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইতে পারিব না।'

পত্রবাহক এই সংবাদ লইয়া জগন্নাথদাসের নিকটে গেলেন; কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তথাপি তিনি তদ্বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়কে কোন সংবাদই প্রদান করিলেন না। অথচ পরদিন প্রাতেই মহাপাত্রগণ ভোগের আয়োজন করিয়া পাক করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তখন বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। এদিকে গোস্বামী মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে, জগন্নাথদাস একটা অজুহাতে সাধুদের নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইতে চাহেন; সুতরাং তখন তিনি আমাকে ও মুন্সেফ শ্রীযুক্ত কিশোরী বাবুকে এবং শ্রীযুক্ত অভয় বাবুকে জগন্নাথদাসের নিকট পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "আপনারা তাঁহাকে (জগন্নাথদাসকে) লইয়া সাধুদের নিকটে যাইয়া বলিবেন যে, আমি তাঁহাদিগকে নানা বাবদে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। তবে জগন্নাথের অভিপ্রায় হইলে যা হবার হবে, তজ্জন্য অঙ্গীকার করিতে পারি না। তাঁহারা অমত করিলে বলিবেন, আমি মহাপাত্রকে বলিয়া ভোগ দিতে নিষেধ করিয়া দিব।"

সে সময় রাত্রি ২টার কম নয়। আমরা তাঁহার আদেশে তখনই জগন্নাথদাসের নিকট গেলাম ও তাঁহাকে গোস্বামী মহাশয়ের অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া নানা ওজর আপত্তি করিতে লাগিলেন। সাধুরা সে সময়ে গুঞ্জাবাড়ীর নিকটে একটা টিলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী এত রাত্রিতে সেখানে যাইতে আপত্তি করিলেন। আমরা তাঁহাকে পাল্কী করিয়া দিতে চাহিলাম; কিন্তু অত রাত্রে পাল্কী মিলে না। আমরা ছাড়িবার পাত্র নই—তাঁহাকে লইয়া যাইতেই হইবে, নচেৎ মহামুস্কিল। যা ব্যবস্থা, হয় কি না হয়, রাত্রেই তাহা মহাপাত্রকে

নিষেধ করিতে হইবে, অথবা আয়োজন করিতে বলিতে হইবে। অবশেষে আলো লইয়া হাটিয়া যাওয়াই স্থির হইল।

তথায় যাইবার পর কিশোরী বাবু সাধুদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি ফর্দ্দানুসারে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট টাকা চাহেন ?" উত্তরে সাধুরা বলিলেন, "একি, আমরা ত কোন ফর্দ্দর কথা জানি না ও তাঁহার নিকটে কোন টাকা চাই নাই। তিনি সাধু; দয়া করিয়া জগন্নাথের প্রসাদ আমাদিগকে দিবেন, তাহাই আমাদের সৌভাগ্য, আবার তাঁহার নিকটে টাকার কথা কেন ?" এখানেই জগন্নাথদাসের দুরভিসন্ধি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সাধুদের কথা শুনিয়া তাঁহার মুখে কথাটি নাই—মুখ চুণ হইয়া গেল।

অতঃপর কিশোরীবাবু গোস্বামী মহাশয়ের সকল কথা সাধুদিগকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া সাধুরা বলিলেন,—"আমরা তাঁহার নিকটে কিছুই চাহিনা—আমরা প্রসাদ পাইতে কল্য অবশ্যই যাইব।" তৎপর সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে সকল কথাই বলা হইল।

ছোট আখড়া বাড়ীতে মহাপ্রসাদ দ্বারা চারি সম্প্রদায়ের সাধুদের সুন্দররূপ সেবা হইল; প্রত্যেককে ১টি ঘটী ও ১ খানা করিয়া বস্ত্র দেওয়া হইল। সাধুদের প্রসাদ পাইবার সময় বড় ছাতার মোহন্ত ও জগন্নাথদাস খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সাধুদিগকে বিতরণ করিবার জন্য যে মহাপ্রসাদ, বস্ত্র ও ঘটী সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা এত উদ্বৃত্ত হইল যে, পুনর্ব্বার প্রায় ততগুলি সাধুকে তাহা বিতরণ করা যাইতে পারে। অবশেষে উদ্বৃত্ত মহাপ্রসাদ, ঘটী ও বস্ত্র গোস্বামী মহাশয় ছোট আখড়ার মোহন্তকে দিয়া আসিলেন। উক্ত মহান্ত-মহাশয় বস্ত্র ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ ১০ টাকা পাইয়াছিলেন। তাহাতে জগন্নাথদাস অসন্তুষ্ট হইলেন। সেগুলি তাঁহাকে দিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন; কিন্তু তাহা হইল না। উদ্বৃত্ত ঘটী ও বস্ত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ জগৎ বাবু দোকানে ফেরত দিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতে

দেনা অনেক কমিয়া যাইবে; কিন্তু গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন—"তা কেন? উহা এইজন্য আনা হইয়াছে, উহা আর ফেরত দেওয়া হইবে না।"

গোস্বামী মহাশয়ের পুরী আগমনের পূর্ব্বে স্থানীয় বাঙ্গালী হাকিমেরা প্রায় সকলেই জগন্নাথদাসের নিকট যাইতেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের এখানে আগমনের পর হইতে মুন্সেফ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺জগচ্চন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয়গণ আর তাঁহার নিকটে যাইতেন না। রাস্তা দিয়া আসিবার সময় তিনি তাঁহাদিগকে ডাকিলেও আর তথায় যাইতেন না। এমন কি তাঁহার নিকট দিয়া আসিতে তাঁহারা ছাতা বা চাদর দ্বারা আবরণ করিয়া আসিতেন। এবংবিধ ব্যবহারে জগন্নাথদাসের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইল মনে করিয়া ও পূর্ব্বদুরভিসন্ধি প্রকাশিত হওয়ায় শেষে তিনিও একজন বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এরূপ ভাবে আরও কয়েকজন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বিরোধী হইলেন।

চারি সম্প্রদায়ের সাধুগণের মহাপ্রসাদবিতরণের দিবস প্রাতে গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ প্রত্যেক মঠে ১৲ টাকা ও ১ জোড়া মট্‌কা কাপড় সম্মানার্থ দিয়াছিলেন। মুন্সেফ্ কিশোরীবাবু সেদিন সপরিবারে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গোস্বামী মহাশয় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয়কে ও পান্নালাল ঘোষকে দানের অর্থসংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত পত্র দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্র এই :—

শ্রীহরিঃ

শরণম্।

আমি ৺জগন্নাথদেবের আদেশমতে সাধুসেবা করিয়াছি, এখানে কিছু দেনা হওয়াতে টাকার প্রয়োজন। যিনি যাহা দিবেন, ৺জগন্নাথদেবের

আদেশ মত ছয় মাসের মধ্যে তাহা পরিশোধ হইবে। অন্ততঃ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। যিনি যাহা দিবেন আমি তাহা পরিশোধ করিব।

জগন্নাথস্বামীর আজ্ঞাকারী দাসানুদাস

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিধুবাবু এই পত্র লইয়া মফঃস্বলে যান এবং পান্নালাল পুনঃ পুরীতে ফিরিয়া যান। বিধুবাবু স্থানে স্থানে যাইয়া গুরুভ্রাতাদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন এবং এই সঙ্গে অর্থদাতৃগণ এই অভিপ্রায় জানাইলেন যে, "আমাদের এই সামান্য অর্থ দ্বারা যদি আপনার সৎকার্য্যের কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব। এই অর্থ আমরা আপনাকে ঋণস্বরূপ পাঠাইতেছি না।" এই সময় ৺হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় ভ্রাতা শ্রীসারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকুলদাকান্ত ব্রহ্মচারীকে লিখিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশে যে সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকা শ্রীগুরুদেবের ঋণপরিশোধের সাহায্যের জন্য প্রদান করিবে। গোস্বামী প্রভু সারদাবাবুর প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া বলিলেন, তাহা করিতে হইবে না। জগন্নাথদেব ঋণশোধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কথা হরকান্তকে লিখিয়া দাও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দোলযাত্রা।

আজ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। প্রাতে প্রায় ৯ ঘটিকার সময় আমরা সকলে কীর্ত্তন করিতে বসিলাম। বসিয়া দেখি গোঁসাইর চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, ভাবে গরগর, মাথার জটা দুলিতেছে, সর্ব্ব শরীর হইতে কি ছটা বাহির হইতেছে, অপূর্ব্ব লাবণ্য, লিখিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। সে দিন সে মাধুরী যে দেখিয়াছে, সেই সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন অতুলনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার হাতের করতাল পড়িয়া গেল!

প্রিয়নাথ ঘোষ গান ধরিলেন :—

নবদ্বীপে গৌর হয়ে ভুলেছিস্ কানাই। ও তোর মা যশোদা পিতা নন্দ
তা কি মনে নাই।
একবার, দাঁড়া রে ত্রিভঙ্গ হয়ে, একবার অধরে মুরলী লয়ে,
গৌর বাঁকা দেখায় কেমন দেখাও দেখি ভাই॥

গোঁসাইজী নৃত্য করিতে উঠিলেন; মধুর রবে হরি বোল, হরি বোল, জয় শচীনন্দন, বলিতে লাগিলেন। মাথার জটা দুলিতেছিল, হস্ত উত্তোলন করিয়া মত্ত সিংহের মত নাচিতে লাগিলেন। আজ সেই পুণ্যদা শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি। এই তিথিতেই কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর চন্দ্রোপরাগ-উপলক্ষ্যে শ্রীহরিনামে মুখরিত শ্রীনবদ্বীপে শচীমার ঘরে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমের উত্তাল তরঙ্গে পাপী তাপীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। "ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে" এই মহাজনী পদের অধিরূঢ় ভাব আজ মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের গোস্বামী প্রভুকে জরজর করিয়া তুলিল।

আমরা গান করিতেছি, সত্য সত্যই যেন গোঁসাইজীর লোকোত্তর নিগূঢ়

ভাবমাধুর্য্য সম্ভোগ করিতেছি। মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় তালপত্রের দুইটী ছত্র স্কন্ধের উপর ফেলিয়া চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া কেবল হায়, হায়, ধ্বনি করিতেছেন। বিধুঘোষ দাদা বাহুতে তাল ঠুকিতেছেন, বহির্ব্বাস খসিয়া গিয়াছে। সরলনাথ গরুড়রূপ ধারণ করিয়া বুকে হাঁটিতেছেন। নদীয়ার ভাবে যেন সকলেই মাতোয়ারা। বোধ হইল মানবজীবন সত্য সত্যই সফল হইয়াছে। এইরূপ ভাবের স্রোত প্রায় ৩ ঘণ্টা চলিয়াছিল।

গোঁসাই ভাবাবেশে সকলের অঙ্গে স্বহস্তে আবির ছুড়িয়া দিলেন। সমস্ত ভক্তসঙ্গে গোঁসাই ভুবনমোহন নৃত্য করিতে করিতে বড় দাণ্ডের রাজপথ দিয়া দোলামঞ্চের দিকে চলিলেন, তখন ভয়ানক রৌদ্রে পথ এত উত্তপ্ত হইয়াছে যে, কাহার সাধ্য তাহাতে পদার্পণ করে।

তখন শ্রীমদনমোহন মন্দির হইতে সুসজ্জিত বেশে দোলমঞ্চে আসিয়াছেন। গোঁসাইজী দর্শনার্থ তৎসন্নিধানে গমন করিলে সমাগত যাঁহারা মদনমোহনদেবকে আবির দিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই গোঁসাইজীকে আবির দিয়া লালে লাল করিয়া দিলেন। সে শোভা জীবনে আর কখনও দেখিব না। এইরূপে উৎসব শেষ হইল।

কিছুদিন পরে দেবাদিদেব মহাযোগীশ্বর পার্ব্বতীপতির মহিমাময়ী শ্রীশিবচতুর্দ্দশী সমাগত হইল। ৺পুরীধাম আবার শিবমহোৎসবরঙ্গে মাতিয়া উঠিল।

গোস্বামী প্রভু ৮ই বৈশাখ প্রাতঃকালে শ্রীলোকনাথ মহাদেব দর্শন করিতে বাহির হইলেন। লোকনাথ মহাদেবের মন্দির শ্রীমন্দির হইতে দক্ষিণপশ্চিম কোণে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এদেশের লোকেরা লোকনাথ মহাদেবকে বড়ই ভক্তি করেন। বিপদে পড়িলে লোকনাথ মহাদেব ও বিমলা মায়ীর দোহাই দিয়া থাকেন। লোকনাথের সেবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। শিবরাত্রির সময় আপামর সাধারণ সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়া রাত্রি জাগরণ করে। বহুদূর হইতে লোকসমাগম হয়।

আমরা গোঁসাজীর সহিত আনন্দ করিতে করিতে বাহির হইলাম। শ্রীমন্দির পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে মহাবীরের গল্প হইতে লাগিল। একটি দৃশ্য ঠাকুরের চক্ষে পড়িয়াছে। তিনি আবেশে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। "সেবকের জয় চিরকালই, জগন্নাথদেব আজ কত যত্ন করিয়া নিজ হস্তে মহাবীরকে সাজাইয়াছেন। মস্তকে মুকুট পরাইয়া উৎকৃষ্ট মণি-মাণিক্য দিয়া আদরে সাজাইয়া দিতেছেন। মহাবীর আনন্দে অধীর হইয়াছেন, সুসজ্জিত দুই হস্তে তাঁহার কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! ভক্তদিগকে প্রভু এইরূপ কতই আদর করিয়া থাকেন। ইনি সামান্য নহেন, সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার।"

পথে একটা গরু গোঁসাইর দিকে শৃঙ্গ পাতিয়া অগ্রসর হইতেছিল। বিধুবাবু তাহার শিং ধরিয়া টানিয়া অন্যদিকে লইয়া গেলেন। লোকনাথ দেবের মন্দির যাইতে পথ বড়ই সুন্দর, প্রাকৃতিক শোভায় পরিপূর্ণ। দুইধারে বড় বড় বটগাছ বহুকালের অতীত কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে। পথে যাইতে যাইতে অশ্বত্থগাছের নূতন পাতা বানরকে খাইতে দেখিয়া ঠাকুর গল্প করিয়া বলিলেন; "সত্যভামার দর্পভঙ্গ সময়ে, হনুমান্ আসিতেছে দেখিয়া গরুড় বলিল, 'অশ্বত্থগাছের নূতন পাতা খাইয়া বুঝি তোর বল হইয়াছে?' হনুমান্ বলিল, 'তুই কি কিচির মিচির করিতেছিস্'—এই বলিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। পথে সুদর্শন বাধা দিলে মহাবীর তাহাকে ধরিয়া কক্ষগত করিয়া লইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, 'সত্যভামা, শীঘ্র সীতা হও, নতুবা বড়ই বিপদ্।" সত্যভামা সীতা হইতে পারিলেন না। রুক্মিণী ধ্যান করিয়া সীতা হইলেন। হনুমান্ রাম সীতার রূপদর্শন করিয়া মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইলেন। কৃষ্ণ মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কক্ষমধ্যে কি?' হনুমান বলিল, 'পথে একটা পোষাপাখী ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেছিল, তাই ধরিয়া আনিয়াছি।' কৃষ্ণ 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও' বলায় মহাবীর তাহাকে ছাড়িয়া

দিলেন। পরে হনুমান্ বলিল, 'শুনেছি আমার মাকে ছাড়াও নাকি হাজার হাজার বিবাহ করিয়াছ? দুই একটা দেখাও ত, হাড় পিশে দিই।' শুনিয়া সত্যভামার আক্কেল গুড়ম্।"

এইরূপে গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে নানাবিধ কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমরা ধীরে ধীরে মহানন্দে লোকনাথদেবের মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। গোঁসাই কিছুকাল এদিক ওদিক দর্শন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন; সেবকেরা ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইবে তাই কিছু দর্শনী চাহিল। যাহার হাতে যাহা ছিল সব দেওয়া হইয়াছে। গোঁসাই আরও ১০৲ টী টাকা চাহেন; কিন্তু অন্বেষণ করিয়া কাহারও নিকট পাওয়া গেল না। গোঁসাই কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আছে, আছে,"।— পান্নার মাতার দিকে তাকাইয়া 'ঐ টাকা আয়' 'ঐ টাকা আয়' বলিয়া উঠিলেন। আমরা হাসিতে লাগিলাম, পান্নার মাতাও হাসিয়া একখানা ১০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। আমি গোঁসাইর আদেশে উহা সেবকদিগকে দিলাম।

উক্ত দিবস গোস্বামী প্রভু লোকনাথ মহাদেবের সম্মুখে উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন; দরবিগলিত ধারে বুক মুখ ভাসিয়া চলিল। ভাবাবেশে এক এক বার অপূর্ব্ব প্রেমধ্বনি করিতে লাগিলেন। সে দিনের শোভা, সে দিনের সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ আর জীবনে ভুলিবার নহে। তখন শত শত লোক তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়া এবং পদে লুণ্ঠিত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন, যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই একটু স্পর্শ করিবার জন্য লালায়িত, কেহ হস্ত, কেহ বা অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। গোঁসাই আজ যে ভাব দেখাইলেন তাহা অনির্ব্বচনীয়। তিনি ভাবে কখনও প্রস্তরবৎ কঠিন হইতেছেন, শরীরে যেন প্রাণমাত্র নাই— কেবল একটি অচেতনপদার্থবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন, কখনও বা ঐ অবস্থায়

হেলিয়া পড়িতেছেন। বহুক্ষণ পরে গোস্বামী প্রভু ভাব সংবরণ করিলে আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আজ মহাদেবের নিকট নৃত্য দেখিয়া আমাদের মনে হইল ইহাই অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। ইহাতে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ভেদ নাই।

কিয়ৎকাল গোঁসাইজীর আশ্রমে প্রত্যহ দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইত তাহা উক্ত হইয়াছে। এক সময়ে অর্থের অনটন হওয়ায় কেহ কেহ মোটা চাউলের প্রসাদ আনাইয়া কাঙ্গালীদিগকে দিতে পরামর্শ করিয়া তাহা গোস্বামী মহাশয়কে বলিবার নিমিত্ত আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। আমি এই কথা তাঁহাকে বলায় তিনি বলিলেন, "তা কেন? আমরা যেরূপ প্রসাদ পাইয়া থাকি, ইহাদের জন্যও সেইরূপ প্রসাদই আনা হইবে। কোন ইতর-বিশেষ করিতে নাই।" সুতরাং সেইরূপেই কিছুকাল চলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন যোগজীবন তাঁহাকে বলিলেন, "মহাপ্রসাদের বাবদে মহাপাত্রের অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে, তাঁহাকে টাকা দিতে পারিতেছি না। কল্য হইতে কাঙ্গালীদের মহাপ্রসাদ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে চাই।" তিনি তাঁহাকে সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। পরদিন হইতে কাঙ্গালী ভোজন বন্ধ হইয়াছে অবগত হইয়া ৺বিধুভূষণ মজুমদার ও ৺মোক্ষদা বাবু দুইজনে এক মাসের জন্য কাঙ্গালী ভোজনের ব্যয়ভার বহন করিলেন।

কাঙ্গালীদের মহাপ্রসাদ যখন বন্ধ হইল, তখন গোস্বামী মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। আহা, আমরা বুঝিলাম, ইহাকেই সর্ব্বভূতে সমদর্শন বলে। গোস্বামী প্রভু পরম দয়াল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎপরে আবার কাঙ্গালীদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ হইতে লাগিল। গোঁসাই যোগজীবনকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, তুমি তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত ধার করিতে পার। তোমার যে তালুক আছে, তাহা বিক্রয় করিলে ৫.৬ হাজার টাকা হইতে পারে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বামী দেবপ্রসাদ।

স্বামী দেবপ্রসাদ সোমবার ২১শে ভাদ্র পঞ্চমী তিথিতে সমুদ্রস্নানে যাইয়া প্রায় ৮টার সময় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি পুনঃ পুনঃ হাত দেখাইয়াও সাহায্য পাইলেন না, ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না। কে জানে নিশ্চিন্তে স্নানের সময় সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে কুলদা ও স্বামীজীকে ভাসাইয়া লইবে। কুলদা রক্ষা পাইল, আর স্বামীজীকে প্রবল তরঙ্গে গ্রাস করিল। বিপদ দেখিয়া অমৃত দৌড়িয়া গিয়া জেলে আনিল, জেলেরা পয়সা পয়সা করিয়া গৌন করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে স্বামীজী জলে অদৃশ্য হইলেন। জলমগ্ন হইয়া এত অল্প সময়ে কাহাকেও মরিতে শুনি নাই, তিনি অদৃশ্য হইতে হইতে ৭।৮ মিনিটের মধ্যে তাঁহাকে উঠাইল, কিন্তু তিনি তখন মৃত; চেষ্টা করিলেও দেহে আর প্রাণ আসিল না।

কুলদা বলিল, শেষ কালে জয়গুরু জয়গুরু বলিয়া ৩ বার লম্ফ দিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। তিনি সমুদ্রের তরঙ্গের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তীরের অতি সন্নিকটে আসিয়া ডুবিয়া গেলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, যোগজীবন বাবু, অমৃত, কুলদা প্রভৃতি সম্মুখে থাকিয়াও সাহায্য করিতে পারিল না। যোগজীবন গোঁসাই বলিলেন "আমি যদি শুনিতাম আমাকে ডাকিতেছে, তাহা হইলে আমি অবিচারে লম্ফ দিতাম, অদৃষ্টে যাহা হয়, ঘটিত; কেহ ডাকিতেছে শুনিলে এ অবস্থায় কি লোক চুপ করিয়া থাকিতে পারে?"

অবশ্য স্বামীজীর সদ্গতিই হইয়াছে, তিনি মহাতীর্থে সাগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গোঁসাই বলিলেন, তিনি এমন স্থানে গিয়াছেন, যথায় লোক-

সচরাচর গমন করে না। তিনি শিবত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দিরেই আছেন।

অশ্বিনী বলিল, স্নানের পূর্ব্বে স্বামীজী চুপ করিয়া সমুদ্রতীরে স্থিরভাবে চক্ষুঃ বুজিয়া বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম "স্বামীজী, এভাবে রহিলেন কেন? স্নান করিবেন না? স্নান করুন।"

স্বামীজী বলিলেন "আমার আর উঠিয়া স্নান করিতে ইচ্ছা করে না, এস্থানে বড় আরাম লাগিতেছে, যেন বোধ হইতেছে কাণের কাছে রঙ্গমঞ্চের নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজের মত বাজিতেছে।" আমি বলিলাম, শরীর দুর্ব্বল ও বায়ু প্রবল হইলে কাণের গোড়ায় এরূপ সন্ সন্ আওয়াজ হয়। তিনি বলিলেন, "তা নয়, অতি সুমধুর আওয়াজ, বড় মিষ্ট বোধ হইতেছে, আমার উঠিতে ইচ্ছা হয় না; ইচ্ছা হয় যেন এখানে পড়িয়া থাকি। একটু পরেই স্নান করিব।" আমি বলিলাম, দেখুন কাল গোঁসাই আপনাকে বড় প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামীজী বলিলেন "কোন্ বিষয়? আমাকে কি 'পণ্ডিত' বলিয়াছেন।" আমি বলিলাম 'তা নয়, আপনি ত পণ্ডিতই বটেন।" "উনি বলিলেন "তবে কোন বিষয়?" আমি বলিলাম "আপনাকে বলিব।" তিনি ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়া তথা হইতে উঠিলেন, উঠিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিয়াছেন বল। খুব আনন্দিত হইয়া পুনরায় বলিলেন, বল না, কি বলিয়াছেন? আমি বলিলাম আপনাকে কি বলিব, আপনি ত প্রশংসারই পাত্র। তিনি বলিলেন, বল। আমি বলিলাম বাসায় যাইয়া বলিব। আপনি স্নান করিয়া আসুন, বড় রৌদ্র।

এই সকল কথা অশ্বিনা গোঁসাইজীর নিকট বলিল। তিনি বলিলেন, 'শাস্ত্রে এইরূপ আছে, যোগী সন্ন্যাসীদের মৃত্যুকালে স্বর্গ বিদ্যাধরী প্রভৃতি নৃত্য গান করিয়া আনন্দ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা যে আকস্মিক নহে ইহা

দ্বারাই টের পাওয়া যায়। উনি পরমপদ লাভ করিয়াছেন।’ ইতিপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে বলিতেছি। প্রাতঃকালে গোঁসাই শৌচাগারে আছেন, অমৃত আসিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল সমুদ্রে কুলদা ও স্বামীজীকে ভাসাইয়া লইয়াছিল, কুলদা উঠিয়াছে, স্বামীজীকে পাওয়া যায় নাই, ‘জালুয়া’ নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন, নবকুমার বাবু, আপনি শীঘ্র তথায় যাইয়া দেখুন কি অবস্থা। আমি তাঁহার কথায় ছুটিয়া গেলাম যাইয়া দেখি জেলেরা তাঁহাকে তীরে তুলিয়াছে। দেহে প্রাণ নাই। ডাক্তার আসিলেন, জলনির্গমনের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। আমি সে দিন সমুদ্রস্নানে যাই নাই।

বিধু ঘোষ শুনিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন, ইতিমধ্যে দিদিমাতা আসিয়া বলিলেন “এখন আর নাই,” তবে শরীর গরম আছে, বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।

পরক্ষণে কে আসিয়া বলিল “স্বামীজী আর নাই। আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।” শুনিয়া ঠাকুর নিজেকে সামলাইতে লাগিলেন, কিন্তু যেই জগবন্ধু বাবু বলিলেন, স্বামীজী আর নাই, অমনি তিনি কাঁদিতে লাগিলেন; বলিলেন, আমি একজন ধর্ম্মবন্ধু হারাইলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে হারাইয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন। অনন্তর ধৈর্য্য ধরিয়া গোঁসাই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ত্বরা করিতে লাগিলেন।

জগবন্ধু বাবু ভূতানন্দ স্বামীর নিকট যাইয়া জানিয়া আসিলেন, সমাধি দিতে হইবে। কপালে “নমঃ শিবায়” লিখিয়া সমাধির উপরে গোময়ের শিব স্থাপন করতঃ পূজা করিয়া আসিতে হইবে।

জগবন্ধু বাবু, আমি, সরলনাথ, অমৃত, অশ্বিনী, দ্বারবান, মুকুন্দ সকলে ক্রমে ক্রমে যাইয়া সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলাম। দ্বারবান্ রশি ও পাঁচ সিকার “নুন” মুকুন্দের মাথায় দিয়া অনেকক্ষণ পরে তথায় গেল। স্বামীজীর মৃতদেহ ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও স্পর্শ করিতে নাই। ভূতানন্দ স্বামী বলিলেন

এখানে যাঁহারা আছেন, সকলেই ব্রাহ্মণ। আপনারা সকলেই শব স্পর্শ করিতে পারেন।

সমুদ্রতীরে যাইয়া স্বামীজীর মৃতদেহ বালুর উপর পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। মুখে স্থির ও গম্ভীর ভাব বিরাজ করিতেছে। কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই। তাঁহার মাথা মন্দিরের দিকে, পা সমুদ্রের দিকে, চিৎভাবে শয়ান। অদূরে পরিধেয় রক্তবস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে, স্নানান্তে পরিধান করিবেন। মনে হইল পা ধরিয়া নাড়াইয়া দেখি, বাঁচে কি না! শুনিলাম ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন দেহে আর প্রাণ নাই। এমনি শরীর অবিকৃত রহিয়াছে, ও কথাতেও বিশ্বাস হইতে চায় না। কতক্ষণ পরে শরীর বিকৃত হইতে আরম্ভ হইল, রক্ত দাগ দাগ হইয়া উঠিল। সরকারী ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া অনুমতি দিলেন, মঙ্গলা ঘাটে লইয়া সমাধি দাও। অনেক চেষ্টার পর মঙ্গলাঘাটে লইয়া চলিলাম। জগবন্ধু বাবু কিছুক্ষণ বহিয়া লোকসংগ্রহার্থ বাসায় আসিলেন। দ্বারবান, অমৃত, সরলনাথ, অশ্বিনী ও আমি বহিয়া লইয়া চলিলাম। বহুক্লেশে অনেকক্ষণে মঙ্গলাঘাটে আসিলাম। ডোম দ্বারা গর্ত্ত খনন করা হইল। বিধুবাবু, বড় ললিত, ছোট ললিত প্রভৃতি এই সময় আসিল। গর্ত্ত খনন হইলে, স্বামীজীর কমণ্ডলুতে করিয়া জল আনিয়া "শব" স্নান করান হইল, অতঃপর কপালে "ওঁ নমঃ শিবায়" এবং উহার উপরে "৺" বিভূতি দ্বারা লিখিলাম। "শব" গর্ত্তে স্থাপন করতঃ দক্ষিণে কমণ্ডলু রাখিয়া বালু দেওয়া হইল। উপরে স্তূপ করিয়া বালু রাখা হইল। গোময়ের "শিবলিঙ্গ" উহার উপর স্থাপন করতঃ বিল্বপত্র ও ফুল দিয়া পূজা করিলাম এবং তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলাম। শিবের মাথায় অশ্বিনীও ফুল ও বিল্বপত্র দিল। এইরূপে স্বামীজীর শেষ কর্ম্ম সমাধা করিয়া মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নান করতঃ বাসায় ফিরিলাম। আজ বাসায় সকলেই বিষণ্ণ। বিষাদে সকল বাড়ী আচ্ছন্ন

হইয়াছে; অন্য কথা নাই, কেবল স্বামীজীর জন্য খেদ। আমাদের অনন্ত চাকর পর্য্যন্ত "এমন লোক তো দেখি নাই" বলিয়া কাঁদিয়াছিল। স্বামীজীর জন্য বিলাপের যেন অন্ত নাই। চারি পাঁচ দিন গত হইল এখনও বিষাদ মুখ হইতে ঘুচে নাই। কাহারও মুখে হাসি নাই। মৃত্যুতে এমন যে কাতরতা ও কালিমা, এ আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভূতানন্দস্বামী পুনঃ পুনঃ আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। স্বামীজীর কথা বলিতে বলিতে "হেঁচ্কি" দিয়া কাঁদিতে উদ্যত হইলেন, বহু চেষ্টা করিয়াও একেবারে রোধ করিতে পারিলেন না, চক্ষে জল আসিল। স্বামীজীর গুণ কহিতে লাগিলেন। জগবন্ধু বাবু বলিলেন ভূতানন্দস্বামী রাস্তায় জগন্নাথ দাস বাবাজীকে দেখিয়া বলিলেন, "স্বামীজী সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" এইরূপ ভক্তিমান লোক বড় দেখা যায় না। সে দিন শ্রীমন্দিরে পরীক্ষার জন্য বলিলাম, 'দেখুন স্বামীজী, আপনি সন্ন্যাসী, জগন্নাথদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অপরাধ করিয়াছেন।' স্বামীজী যোড় হস্তে বলিলেন "দেখুন, আপনারা উচ্চ অধিকারী, আমার ত ঐ অবস্থা হয় নাই, আমি কেবল পন্থায় প্রবেশ করিয়াছি মাত্র। আপনারা শিক্ষা দিবেন ও কৃপা করিবেন।

সেদিন গঙ্গামাতার মঠের একজন পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিলেন; স্বামীজীর বিয়োগে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আহা, ইনি যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমনি ভক্তিমান। সে দিন আমরা আপনার সমীপে কত আলোচনা করিলাম; মুখে কথাটী নাই, যেই বাহিরে গেলাম, অমনি তিনি বাহিরে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, অথচ আপনার সমীপে কিছু বলিলেন না। গুরুজনের প্রতি এইরূপ মর্য্যাদাই প্রশংসনীয়।

তাঁহার জন্য গোঁসাই তিনবার কাঁদিয়াছেন। ভক্তবিচ্ছেদক্লেশ মায়া

নহে। জীবনের ধর্ম্মবন্ধু বিহনে কে সুস্থির থাকিতে পারে? আহা, স্বপ্নেও যদি একদিন দেখিতাম স্বামীজী পরম কুশলে আছেন, তাহাতেই কত আনন্দ হইত। প্রতি পদে পদে তাঁহার কথা স্মরণ হইতেছে। গোঁসাইর দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি যে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া মাঝে মাঝে বসিতেন, তাহাতে যে গৈরিক বস্ত্রের দাগ পড়িয়াছে, উহাতে এখনও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইতেছে। গোস্বামী প্রভুর যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদপ্রার্থী হইয়া পুনঃ যে যাচ্ঞা করিতেন, ৯টার সময় ঐ যে তুলসী তলায় ঐ জন্য রাত্রে পড়িয়া থাকিতেন, তাহা স্মরণ করিয়া মন এখনও শোকাতুর হইতেছে।

গোঁসাইজী সমাধি-অন্তে স্থানটী একটু উঁচু করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন, যদি উহাতে একটী তুলসীমঞ্চও করান যায়। তিনি কুলদাকে বলিলেন স্বামীজীর যে সকল জিনিষ আছে লইয়া আইস, ইহার একখানাও যেন নষ্ট না হয়; কুলদা পুস্তকাদি আনিল; যত্নসহকারে রক্ষা করিতে বলিলেন।

পুস্তকের ভিতর কাগজে এই সঙ্গীতটী ছিল;—

কে দরদী ভাবের ভাবী, আপনার খেয়ে আমার হবে।
বিশুদ্ধ প্রেম সেই জেনেছে নির্হেতু যেজন ভাবে॥
যে ছেড়েছে সুখের আশা, তার নির্হেতু প্রেম ভালবাসা;
নিস্পৃহ তার নাইকো আশা, সেই আশাতে বসে রবে॥
চাতকধর্ম্ম গোঁসাই দোষে, চার মেঘের জল খায় সন্তোষে,
ব্যভিচারী ধর্ম্ম হয় সে, গ্রন্থকারে কয় তবে॥
ক্ষেপাচাঁদ বাউলে বলে, সে প্রেম না ম'লে কি আপনি মেলে,
দরদিনীর কৃপা হলে, জ্ঞানকপাট খুলে যাবে॥

ঠাকুর এই সঙ্গীতটী লইয়া গান করিলেন। প্রথম দুই চরণ পুনঃ পুনঃ

গাইলেন। সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, সতীশ স্বামীজী না কোন্ দুটী শ্লোক খুব ভালবাসিতেন, অবৈষ্ণব লক্ষণ? উহা লিখিয়া আনিয়া সম্মুখের দেওয়ালে লাগাইয়া দাও। এ তাঁহার চিহ্ন, ইহা দেখিয়া তাঁহার কথা মনে পড়িবে।

সতীশ উহা লিখিয়া সম্মুখের দেওয়ালে লাগাইয়া দিল। শ্লোক দুটী যথা,—

"শুভচরিতমপি দ্বিষন্তি পুংসাং স্বয়মিহ দুশ্চরিতানুবন্ধচিত্তাঃ।
মহদকুলমপ্যবাপ্য সুস্থা ভগরসনারসিকা অবৈষ্ণবাস্তে॥
পরমসুখপদং হৃদম্বুজস্থং ক্ষণমপি নানু সজন্তি মত্তভাবাঃ।
বিতথবচনজল্পনৈরজস্রং পিদধতি নাম হরে রবৈষ্ণবাস্তে॥

অর্থাৎ, যাহারা অপরের চরিত্র উত্তম হইলেও বিদ্বেষ করে, অথচ যাহাদের নিজের চিত্ত দুষ্কর্ম্মে নিবদ্ধ থাকে, যাহারা অত্যন্ত নীচ কুল প্রাপ্ত হইয়াও সুস্থচিত্ত, ভগ ও রসনা লোলুপ সেই সকল লোক অবৈষ্ণব।

যে সকল সংসারমত্ত লোক হৃৎপদ্মস্থ পরমসুখস্বরূপে ক্ষণকালের জন্যও অনুরক্ত হয় না, যাহারা বৃথা বাগাড়ম্বর দ্বারা শ্রীহরির নামকে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহারা অবৈষ্ণব।

বানরমারার স্বপক্ষদলকে তাঁহার মৃত্যুতে উৎফুল্ল দেখিয়া গোঁসাই বলিলেন, স্বামীজী মৃত্যুলাভে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর গর্ভবাস নাই। এই বলিয়া শাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত দুটী শ্লোক একখানা কাগজে লেখাইয়া রাখিলেন, শ্লোক দুটী এই :—

(১) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ক্ষেত্রং তৎপরমং মহৎ।
পুরুষাখ্যং সকৃদ্দৃষ্ট্বা সাগরান্তঃসকৃদ্মৃতঃ :
ব্রহ্মবিদ্যাং সকৃজ্জপ্ত্বা গর্ভবাসো ন বিদ্যতে॥

(২) ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥

অর্থাৎ, ইহা ধ্রুব সত্য যে, এই ক্ষেত্র পরম মহৎ, শ্রীজগন্নাথদেবকে একবার দর্শন করিলে, সমুদ্রে দেহান্ত হইলে এবং ব্রহ্মবিদ্যা একবার জপ করিলে আর গর্ভবাস হয় না।

যিনি ওঁম্ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

পরদিন প্রাতঃকালে গোঁসাই স্বামীজীর বক্সে হইতে আনীত "বিদ্বৎসন্ন্যাস" গ্রন্থ অতি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল গোঁসাই স্বামীজীকে ঐ অবস্থা দান করিলেন। স্বামীজী কাশী হইতে ঐ "বিদ্বৎসন্ন্যাস" গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

মৃত্যুর দুই চার দিন পূর্ব্ব হইতেই স্বামীজী একটা উদাস ও চঞ্চল ভাব প্রকাশ করিতেন। "আমার আর এস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করে না", "কোথায় বা যাই" এইকথা পুনঃ পুনঃ বলিতেন। এই ভাবে তিনি এতই অস্থির হইয়াছিলেন যে, এক সময়ে দৌড়িয়া নিজের গৃহ হইতে গোঁসাইর নিকট আসিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, কেবল সংস্কৃত ভজনাবলী গান করিয়াছিলেন।

"কোথায় যাব," গোঁসাই আমাকে ভালবাসেন না; যদি তাই হত, তবে তিনি আমাকে 'আপনি' বলিয়া ডাকেন কেন? আর থাকিতে ইচ্ছা নাই, উনি বলেন ত [illegible]" এইরূপ বাক্য অশ্বিনী, পান্না, ললিত ও আমার নিকট বলিয়াছেন।

আমি স্বামীজীকে বলিলাম, কেন, গোঁসাই সেদিন "বই" দেওয়ার সময় আপনাকে "তুমি" সম্বোধন করিয়াছিলেন, স্বামীজী স্বীকার করিলেন; আমি বলিলাম, দেখুন [illegible] "আপনি বলিয়াও ত সম্বোধন করে, তাতে কি তাদের ভালবাসা [illegible] স্বামীজী কহিলেন "হাঁ"।

• স্বামীজী [illegible] রাত্রিকালে গোঁসাই তাঁহাকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন,

করেন কেন তজ্জন্য তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন। গোঁসাই বলিলেন, নিজের পুত্রও যদি সন্ন্যাসী হয়, তাহাকে মান্য করিতে হয়।

বানরবধের বিরুদ্ধে শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া স্বামীজী একখানি পাতী লিখেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। উহা এখন বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেছিলেন, প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছিল; স্বামীজী বলিলেন আর লিখিতে পারি না; ক্লেশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি লেখার জন্য উৎসাহ দিবার নিমিত্ত বলিলাম, গোঁসাই যখন লিখিতে বলিয়াছেন, অথচ আপনি লেখেন না, তাহাতেই বুঝি আপনার "আমিত্ব" রহিয়াছে। অনেক সময় এরূপ বিষয় লইয়া কৌতুক করিতাম। তিনি বলিতেন আমি টামি কিছু নাই, একমাত্র পরব্রহ্মই সব। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিশ্বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই তাঁহার উপাস্য, তিনি যে উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বিশ্বাস। গুরুই সর্ব্বস্ব, গুরুই পরব্রহ্ম, সব। একগাছা তৃণও তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন উত্তোলিত হয় না। জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁহার হস্ত দেখিয়া ধন্য হইয়াছি, ইত্যাদি।

স্বামীজীর ভিতরের অবস্থা বড়ই সুন্দর ছিল। সতীশ বলিলেন "এমন সরল বিশ্বাসী লোক বড় দৃষ্ট হয় না। বালকের মত একটী কথা বলিলেই বিশ্বাস করিয়া লইতেন। তাঁহাকে কখনও ইদানীং রাগ করিতে দেখি নাই। অনন্ত চাকর সেদিন রাত্রে জল দেয় নাই, পরদিবস সকালে দুঃখ করিয়া যোগজীবন গোঁসাইর নিকট বলিলেন "আমার জন্য এরা ক্লেশ পায়।"

কাহাকেও কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে, বৃথা আলোচনা করিয়া সময় যাপন করিতে, নিজের সুখসাধন করিতে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। নিজে একটা ভিজা ঘরে থাকিতেন, কয় দিন বলিয়াছি বিছানাগুলি রৌদ্রে দিন, কিন্তু কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই, সর্ব্বদাই উদাসীন। যোগজীবন বলিলেন,

'ব্যামো শ্যামো হবে, এগুলি রৌদ্রে দাও।' স্বামীজী বলিলেন, 'আরে যাও।' বাহ্য বিষয়ে এরূপ উদাসীন্য স্মরণ করিতেও কত সুখ। স্বামীজীর মূর্ত্তি এমন শান্ত ও গম্ভীর লক্ষিত হইত যে, তিনি যেন সমস্তই জয় করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন। হাসিমুখে কথা বলিতেন, আমরা রাগ করিলে প্রত্যুত্তর না দিয়া ক্লেশ করিতেন। কখন তিনি কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন শুনি নাই, তবে সে দিন 'বানর মারার' স্বপক্ষে শাস্ত্রের কুব্যাখ্যা শুনিয়া বলিয়াছিলেন "এ চণ্ডালের ন্যায় ব্যাখা"। তাঁহার ওজস্বী ভাব বড়ই চমৎকার; বানার মারার বিরুদ্ধে নাম স্বাক্ষর করাইতে যাইয়া অত্যন্ত তেজের সহিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাঁহার তেজ দেখিয়া কয়েকটী ভদ্রলোক বলিলেন "আচ্ছা, দিন, নাম স্বাক্ষর করিয়া দিই"।

কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামীজীর জীবনে বেশ আসক্তি ছিল দর্শন করিয়াছি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলে কোলে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন; অতঃপর ছেলে মরিলে উহার নেকড়াগুলি ও স্ত্রীর চিহ্নস্বরূপ তাঁহার বস্ত্রাদি এক গাঁটরি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন, স্ত্রীর একটী টিয়া পাখী ছিল; তাহাও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন; কিন্তু ইদানীং স্বামীজীর অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছিল। কেবলমাত্র সঙ্গে কমণ্ডলু ও যৎকিঞ্চিৎ অত্যাবশ্যক গাত্রবস্ত্রাদি ছিল মাত্র।

তিনি প্রতিদিন যেরূপ নিয়মে চলিতেন তাহা স্মরণ করিলেও চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

তিনি ভোরে ৩টা ৪টার সময়ে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া সমুদ্রস্নানে বাহির হইতেন। স্বামীজীর গোঁসাইজীই যেন প্রাণ ছিলেন; তিনি কখন কি করেন, কি খান, অনুসন্ধান লইয়া নিজেও তদ্রূপ চলিতে প্রয়াস পাইতেন। গোঁসাই জটা রাখিয়াছেন, স্বামীজীও তাহা রাখিয়াছিলেন। কম্বুলিয়াটোলার বাসায় দেখিয়াছি 'উকুনে' স্বামীজীকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতেছে, তথাপি উহা,

ফেলিতেন না। তিনি বি, এ, উপাধিধারী ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যা অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। তাঁহার বিজ্ঞানেও অধিকার ছিল। সতীশ সে দিন বলিল, স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকা ভাল, এমন (Mystic) বৈজ্ঞানিক কূট কথা বলেন যে, কেহ বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া থাকে। সুস্বরে এক আধটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেই সকলে মোহিত। স্বামিজী অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বরে পাঠ করিতে পারিতেন। আমি তাঁহার 'শিবোঽহম্" "শিবঃকেবলোঽহম্" সুস্বরে আবৃত্তি করতঃ গান শুনিতে বড় ভাল বাসিতাম। শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ গোঁসাই (একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক) স্বামীজীর বিদ্যবত্তা ও প্রতিভা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন এবং স্বামীজীকে নিজের পুত্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পান। তিনি যে শ্রীবৃন্দাবনে "তীর্থমনি"র কুঞ্জে একতালায় বসিয়া সুস্বরে রামায়ণ পাঠ করিতেন, এখনও তাহা যেন কাণে বাজিতেছে। পাহাড়ী বাবা উঁহাকে নাকি "প্রকাশানন্দ স্বামী" বলিয়া কহিয়াছিলেন। ৪র্থ শ্রেণীতে পাঠের কালে তাঁহাকে একখানা শঙ্করাচার্য্যকৃত কঠিন গ্রন্থ উপহার দিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া তিন খুব গৌরব করিতেন। তাঁহার জীবন বড় ক্লেশময় ছিল, লোকের নিকট সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাকুক, অনেকের নিকট প্রাণের কথা বলিয়া আঘাত পাইতে পাইতে উহা বলিবার শক্তিও যেন লোপ হইয়াগিয়াছিল। পিতা রুষ্ট, এমন কি প্রহার করিতেন, স্ত্রী পুত্র মাতা মৃত, বহু শোক পাইয়াছিলেন ; অথচ খুব শান্ত ও ধীর ভাবে সমস্ত সহ্য করিতেন। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একতালায় মনের ক্লেশে ছট্‌ফট্‌ করিয়া সারাঘর যে গড়াগড়ী দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ক্লেশ হইতেছে। মনে হয় তাঁহাকে একবার সুখে দেখি, তিনি সকলের আদর প্রাপ্ত হউন, কিন্তু মৃত ব্যক্তি স্বপ্নেও সুখ ও দুঃখের কথা বলিতে আসে না।

স্বামীজী প্রতিদিন ভোরে গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া সমুদ্র স্নানে রওনা হইতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া, কাশী মিশ্রের বাড়ী (মহাপ্রভুর

বাড়ী) সিদ্ধ বকুল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া সমুদ্র স্নান করিতেন। সমুদ্র হইতে আসিবার কালে পুনরায় শ্রীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিতেন। কুলদা বলিল, স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেন, একদৃষ্টে বিগ্রহের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অতঃপর বাসায় আসিয়া গোঁসাইর "চা" প্রসাদ পাইতেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে চক্ষুঃ মুদিয়া ১১টা ১১½টা পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। অতঃপর গ্রন্থপাঠে সারাদিন অতিবাহিত করিতেন। ইতিমধ্যে কিছু 'পাকাল', দুধ ও অন্ন প্রসাদ পাইতেন। তিনি নীরবে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন এবং গোঁসাইর প্রসাদের জন্য প্রতিদিন যোগজীবনের ঘরে অপেক্ষা করিতেন। এইরূপে পাঠাদির সময় কাটাইয়া সায়ংকৃত্য সমাধা করিতেন। সন্ধ্যার পর পুনরায় গোঁসাইর দক্ষিণ পার্শ্বে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত একমনে শান্ত ভাবে চক্ষুঃ মুদিয়া বসিয়া থাকিতেন।

অতঃপর গোঁসাইর ঔষধ ও জল খাওয়া হইলে তিনি কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া নিজের গৃহে যাইতেন। গোস্বামী প্রভুর মত সারারাত্রি বসিয়া সাধন ভজন করিতে স্বামীজীর একটী প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। বসিবার সুবিধার জন্য একটা বড় মেটে হাঁড়ী আমার নিকট চাহিয়াছিলেন। ঐ হাঁড়ী রাত্রিকালে তিনি ব্যবহার করিতেন তাহারও নিদর্শন পাইয়াছি। বানরমারার সময় এক এক দিন তাঁহার নিদ্রা হইত না, শাস্ত্রে এই সম্বন্ধে কোথায় কি আছে চিন্তা করিতেন। তাঁহার কোমল প্রাণ ইহাদের ক্লেশে ফাটিয়া গিয়াছিল। উহাদের জন্য রাত্রিকালে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন; ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তের মত হইতেন। "ইহাদের জন্য পাগল হব নাকি?" এরূপ একদিন বলিয়াছিলেন।

বানর মারা বন্ধ করিবার জন্য ও শ্রীমন্দিরের দেওয়ালে সংলগ্ন পায়খানা নির্ম্মাণ বন্ধ করাইবার জন্য অক্লান্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার দুর্ব্বল শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই দুটী কার্য্যই তাঁহার জীবনের

শেষ ও মহত্তম কার্য্য। তিনি আহার নিদ্রা অগ্রাহ্য করিয়া রুগ্ন শরীরে যেরূপ খাটিয়াছিলেন, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। কখন সন্ধ্যাবেলা, কখনও বা সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আহার করিতেন। বাড়ী বাড়ী মধ্যে মধ্যে যাইয়া নামস্বাক্ষর করাইতেন। কখন কখন বহুলোককে বক্তৃতাদ্বারা নিজমতে আনিয়া নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন। সতীশ বলে, তিনি এমনি তেজের সহিত শাস্ত্রীয় কথা বুঝাইয়া বলিতেন যে, কেহ তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। তাহাদের ভিতর যেন একটা ছাপ পড়িয়া যাইত। কোথায় কোন্ পণ্ডিত আছেন, তাহাদের অনুসন্ধান, এ বিষয়ে আলোচনা, নাম স্বাক্ষর প্রভৃতি কার্য্যে বহু সময় কাটাইতেন। তদীয় পরিশ্রমের ফল তিনি দর্শন করিয়া যান নাই। তাঁহার "পাতি" খানি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল। গোঁসাই স্বামীজীকে ঐ 'পাতিতে নাম স্বাক্ষর করিতে বলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয়সহকারে নাম স্বাক্ষর যেন না করিতে হয় ইহাই যাচ্ঞা করিলেন। গোঁসাই তাহা দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং এইরূপই হউক বলিয়া তাঁহার ভাবে অনুমোদন করিলেন। তাঁহার ভিতর প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছিল না ইহাই তাহার প্রমাণ।

তিনি মন্দির হইতে বাসায় আসিতে দুই এক বার বিশ্রাম না করিয়া আসিতে পারিতেন না। সে দিন রাস্তায় চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জলমগ্ন হইয়া সাধ্যমত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াও যে রক্ষা পাইলেন না, বানরবধনিবারণহেতু অক্লান্ত পরিশ্রম ও রুগ্নতাই এক হেতু বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজীর ভিতর একেবারে নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল। আমাদের মধ্যে অনেককে "কাম গেল না, ক্রোধ গেল না, কিছুই হইল না" বলিয়া ক্লেশ করিতে শুনা যায়; কিন্তু স্বামীজীর মুখে এরূপ কোনও বাক্য কখনও শুনি নাই। সাধনপ্রাপ্তির পর হইতে তাঁহার জীবন অন্যরূপ হইয়া গিয়াছিল।

অশ্বিনী খোঁজ করিতে করিতে তাঁহার জিনিষ পত্রের ভিতর একটী

সিন্দূরের কৌটা পায়। উহা তাঁহার স্ত্রীর বলিয়া বোধ হইল। গোঁসাই একথা শুনিয়া বলিলেন "বিশুদ্ধ প্রেমের এইরূপই লক্ষণ। স্বয়ং মহাদেবও সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন।" বহুদিন পরে স্বামীজীর জিনিষ-পত্র সমুদ্রে দেওয়ার অভিপ্রায় করিয়া এই কৌটাটি লইয়া যাওয়া হয়। হঠাৎ এই কৌটাটী খুলিলে উহার ভিতর গোঁসাইর লিখিত তিন খানা পত্র পাওয়া যায়। স্বামীজী নানা স্থানে নানাবস্থায় কত দরদের সহিত উহা রক্ষা করিয়াছিলেন মনে হইলে মন বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পত্র তিন খানা এই—

(১)

ওঁ হরিঃ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইলাম। অপনার পরিবার ইচ্ছা করিলেই 'সাধন' পাইবেন। যতদিন অর্থের প্রয়োজন আছে, অর্থোপার্জ্জন করিবেন। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম কাটিয়া যাইবে। সাধনে অধিক সময় দিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইবেন।

যেখানেই থাকুন না কেন সময়ে সময়ে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রাণের যোগ দূরে নাই নিকটে।

আপনার তপস্তার কুশল হউক।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(২)

ওঁ হরিঃ

সবিনয় নিবেদন,

অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অর্থোপার্জ্জন করিতেই হইবে, স্কুলের কার্য্য সুবিধা না হইলে অন্ত কোন কার্য্য গ্রহণ

করিলে হয়। সকল বিষয়েরই সময় আছে। সময় হইলে ঘরে বসিয়া কর্ম্ম হইবেক। সময় না হইলে সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হয় না। তথাপি চেষ্টা করিতে হয়, কারণ ইহারই নাম কর্ম্মভোগ। কর্ম্মভোগ না করিলে শুভ সময় আসে না। সাধনে অগ্রসর হইতেছেন ইহাই প্রকৃত লাভের কথা। যত আত্মহারা হইয়া নির্ভর করিবে, সাধনে ততই উন্নতি।

যেখানেই থাকুন আমরা সর্ব্বদা নিকটেই আছি। গুরু-কৃপাতে আপনি সপরিবারে সুখে থাকিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করুন।

নিবেদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(৩)

ওঁ হরিঃ

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূর্ব্ব পত্র আমার হস্তগত হয় নাই। নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিলে নিশ্চয়ই ফললাভ হয়। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। ধর্ম্ম আর কথার ব্যাপার থাকে না। কোন বিষয়ে অনুমান করিয়া লইতে হয় না, সকলই প্রত্যক্ষ।

পত্র লিখুন বা নাই লিখুন ক্ষতি নাই, যাঁহারা সাধন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিকটে। সম্প্রতি ঢাকাতেই আছি, শীঘ্র কোন স্থানে যাওয়া হইবে বোধ হয় না।

শুভকাঙ্ক্ষী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ঠিকানা

ভ্রাতৃবর—

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—

মহাশয় সমীপে—

শ্রীযুক্ত বাবু রামতারক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঠিকানা

রোটী গুদাম। কানপুর।

ার দেহত্যাগের পর তের দিনের দিন জন ত্রিশ লোককে অন্ন, ডাইল, ও পয়সা দেওয়া হয়। স্বামীজীর জন্য আমাদের এই শেষ কার্য্য, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

স্বামীজীর সম্বন্ধে কে কি লেখেন তাহা নকল করিয়া গোঁসাই রাখিতে বলেন। কলিকাতায় শ্রদ্ধেয় বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার শান্তিকে লিখিয়াছিলেন :—

"দেবপ্রসাদ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভাল, সকলেই একে একে চলিয়া যাইতেছেন। দেবপ্রসাদের অমন নির্ম্মল প্রকৃতি স্বর্গরাজ্যেরই উপযুক্ত, ভগবানও তাঁহার বন্ধন একে একে মোচন করিয়া লইয়াছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার শেষ দেখা এবার পুরীযাত্রাকালে। আমাদের মধ্যে এখন দেখেতেছি ভাঙ্গা অবস্থা পড়িয়াছে। পর পারের কথা এখন বেশী। দেখিতে দেখিতে কত গুরুভ্রাতাগণ, যাঁহাদের সনে পরম সুখে ছিলাম, অন্তর্হিত হইলেন। ক্রমে সুখের দিনের স্মৃতিমাত্র রহিতেছে।"

শ্রীহট্ট হইতে বিধুভূষণ মজুমদার বি. এ লিখিয়াছেন :—

শ্রীহরি Sylhet, 12th Sept.

Satis,

• The news of Swamiji's depaıture has touched

me to the quick. Thus a great soul has passed away. He was so noble, so devout, so learned. It is no wonder Probhuji will shed tears for him. Among us sadhan brethren he was one of the greatest souls. The trials of us all and Probhuji are many and much. please let me know details of Swamiji's interment. What does Probhu speek of him ? Such deaths in the sea are, I know, glorious and prophesy bliss in the life to come. My next apprehension is about you. Take care of yourself, please, for our sake. I donot know what I should do for Swamiji. My grief for him seems to be more than those I have ever felt in life for any other. May his departed spirit find rest and enjoy bliss in the feet of Guruji and 'Mathakurani.'

We have lost a pure, sincere, and loving friend. Though apparently his loss is nothing to the world, but it is heavier than what we can bear. What writings do you speak of in your letter? If they are of Swamiji's, we must try to preserve and get them printed. It is desirable that we should do something to commemorate him.

Your wretched unfortunate,
Classmate & Companion.

অনুবাদ।

সতীশ, স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ আমাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে। এইরূপে একটী মহাত্মা চলিয়া গেলেন। তিনি কত উদার, কত নিষ্ঠাবান্, কত জ্ঞানী ছিলেন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, প্রভুজী তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিবেন। অমরা যাঁহারা গুরুভ্রাতা, আমাদের মধ্যে যাঁহারা অতি উন্নত, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। আমাদিগের এবং প্রভুজীর পরীক্ষা অনেক এবং দুর্ব্বহ। স্বামীজীর সমাধি দেওয়ার বিবরণ আমাকে লিখিবে। প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে কি বলেন? আমি মনে করি সমুদ্রে এরূপ মৃত্যু অতি-উত্তম এবং ইহা পরলোকে পরমানন্দপ্রাপ্তি সূচনা করে। অতঃপর আমার ভয় তোমার জন্য। আমাদের মুখ চাহিয়া নিজের প্রতি যত্ন কর। স্বামীজীর জন্য কি করিব জানি না। আমি জীবনে অপরের জন্য যত দুঃখ ভোগ করিয়াছি, স্বামীজীর জন্য দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গুরুজী এবং মাতা-ঠাকুরাণীর চরণে মৃত আত্মা বিশ্রাম এবং পরমানন্দ লাভ করুন।

আমরা একজন নির্ম্মল সরল এবং স্নেহশীল বন্ধু হারাইলাম। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার অভাব জগতের পক্ষে কিছুই নয়, তথাপি আমাদের পক্ষে ইহা সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। তোমার পত্রে তুমি কোন্ লেখার কথা বলিতেছ? যদি তাহা স্বামীজীর হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্য তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব এবং মুদ্রিত করিয়া লইব। তঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য অমরা কিছু করি ইহা বাঞ্ছনীয়।

কুঞ্জবিহারী গুহ লিখিয়াছেন ঃ—

তোর দুই চিঠিই পাইয়াছি। দুই চিঠি পড়িয়াই খুব কষ্ট হইল। স্বামীজীর দেহত্যাগে সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, জীবিতাবস্থায় তাঁহার আদর করিতে পারি নাই। কত সময় তাঁহাকে মনঃকষ্ট দিয়াছি, ইহাতে প্রাণে কষ্ট হয়।

ঠাকুর তাঁহার মঙ্গল করুন, কল্যাণ করুন। ওখানে স্বামীজীর তোমরা থাকিতে কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন না থাকিলে বড়ই কষ্টের কারণ হইবে। কিন্তু চারিদিকের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে যে কিরূপ হয় ঠাকুরই জানেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্র

(সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (ছোট সতীশ) বাড়ী ঢাকা, বিক্রমপুর, বাঘিয়া গ্রাম। ১২৯৪ সন অগ্রহায়ণ মাসে ইনি গোঁসাইজীর নিকট দীক্ষিত হন।)

শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাঁর সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন :—

নিশাবসানে উজ্জ্বল নক্ষত্রবৃন্দ যখন একে একে অদৃশ্য হয়, তেমনি করিয়া অমাদের প্রাণের প্রিয়তম সকল ধীরে ধীরে অন্য পবিত্রলোকে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন। ইহলোকে অন্ধের ন্যায় বিচরণ করিতেছি তাই দুঃখ, এই সকল লোকের চিরাভিলষিত নিত্যধামলাভেও আমরা অশ্রুমোচন করিতছি। ভগবানের গূঢ় তাৎপর্য্য কে হৃদয়ঙ্গম করিবে? কেনই বা মনুষ্যচক্ষে অকালে এই সুন্দর কুসুমগুলি ছিন্ন করিয়া গ্রহণ করিতেছেন?

কয়েক দিন হইল ভ্রাতা সতীশচন্দ্র দেড় দিনের জ্বরে ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তিনি শুভ অগ্রহায়ণ মাসে শুভ একাদশী তিথিতে ৯ই অগ্রহায়ণ, ১২০৫ সনে জগদ্ধাত্রী পূজার দুদিন পরে আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীশ্রীপুরোষত্তমক্ষেত্রে রজঃ প্রাপ্ত হইলেন।

যাহার যে আন্তরিক কামনা, ভগবান তাহাই তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন ; বিশেষ, ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি কখনও অপূর্ণ রাখেন না। সতীশের মনোগত অভিপ্রায় এই ধামে রজঃ প্রাপ্তি হয়, ভগবান তাহাই তাহাকে প্রদান করিলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সতীশ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিত, যখন আপনার এইরূপ শরীর, প্রায়ই জ্বর হয়, তখন কবে আমাদিগকে যে ছাড়িয়া যাইবেন বলা যায় না ; স্বামীজীর পরম সৌভাগ্য পূর্ব্বেই তিনি এই ধামের কৃপালাভ করিয়াছেন, আমারও ইচ্ছা হয়, এই ধামে রজঃ প্রাপ্ত হই।

জগন্নাথবল্লভ মঠের পণ্ডিতজী বলিলেন, সতীশ পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট এই পরম পবিত্রধামে দেহপাত হয় এই জন্য আশীর্ব্বাদ চাহিতেন। 'এই ধাম পরম পবিত্রতম, ইহার রজের অসীম পাবনী শক্তি, আপনারা কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন যেন এইধামে স্থান পাই।' এক দিন তিনি দেখিলেন, শ্রীমন্দিরে সতীশ জগন্নাথদেবের অগ্রে জোড় হস্তে সজলনয়নে ভিক্ষা মাগিতেছেন যেন এই পবিত্র ধামে তাঁহার রজঃপ্রাপ্তি হয়।

সতীশ আমার নিকটও বলিয়াছিলেন, তোমরা যে আমাকে এই স্থান হইতে আর ফিরাইয়া লইতে পার বোধ হয় না। সোমবার দিবস ভোরে সমুদ্রস্নান হইতে আসিয়া জ্বরে পড়িল, মঙ্গলবার দিন রাত্রি দুটার সময় দেহে আর প্রাণ নাই। মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্ব্বেও সরলনাথকে বলিয়াছিলেন "তুই বড় নিষ্ঠুর, আমি উঠিতে চাই, তুই উঠিতে দিস না।"

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল "নাড়ী" নাই, অথচ কেন যে নাড়ী পাওয়া যায় না বুঝিতে পারিল না। মৃত্যু হইলে মনুষ্যের বিশেষ কোন যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হয়, কিন্তু সতীশের তদ্রূপ কিছুই লক্ষিত হইল না। ডাক্তার সতীশ বাবু দ্রুত গতিতে বাসায় যাইয়া ঔষধ দিলেন, কিন্তু উহা

খাওয়াইতে না পারায় পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করা হইল। সতীশ ডাক্তারী ঔষধ একেবারে খাইতে চাহিত না।

রাত্রি ২টার সময় কুলদা ও সরলনাথ আসিয়া ঠাকুরের নিকট বলিল, "সতীশ কেমন কেমন করিতেছে, চক্ষু যেন টানিতেছে, আর আশা নাই।" ঠাকুর বলিলেন, "নাম শুনাও" "হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" নাম কর। ইহা শুনিয়া সরল নাথ কাঁদিয়া পড়িল, কিন্তু অবিলম্বেই গোঁসাইর বাক্যে ধৈর্য্য ধরিল। জগবন্ধু বাবু আসিয়া সতীশকে বাহির করিল। মৃত্যুকালেও সতীশের মুখ প্রসন্ন। পর দিন সকালে শান্তি দিদি দেখিয়া বলিলেন, উহার মুখ যেন স্বাভাবিক প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সরলনাথ শেষকালে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত উহার সেবা করিয়াছিলেন।

সতীশ যে এত হঠাৎ দেহত্যাগ করিবে ইহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। দিদিমাতা তখন নিদ্রিত ছিলেন, স্বপ্নে দেখেন "বিমলামায়ী" তাহাকে কোলে করিয়া কম্বল জড়াইয়া নিয়া গেলেন। যোগজীবন গোঁসাই সন্ধ্যাকালে আমাকে বলিলেন, দেখ সতীশ আর বাঁচিবে না, কয়দিন যাবৎ আমার বোধ হচ্ছিল সতীশের আয়ুঃ নাই। তিনি পরে বলিলেন, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই সতীশ আমার নিকট আসিয়া বলিল, ঠাকুর আমাকে অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।"

অশ্বিনী (সতীশের) মৃত্যুর পর শয়ন করিল। সে দেখিতে পায়, সতীশ কূপের জলে স্নান করিয়া উহার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। অশ্বিনী বলিন "তোকে বের করে আসলাম, তুই মরা মানুষটা আমার কাছে এলি কেন?" সতীশ বলিল, "যা বেটা আমি মরি নাই। আমার ক্ষমতা আছে যে, আমি সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারি"। অশ্বিনী বলিল "আয় তোকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া শ্মশানে লইয়া যাই"। সে বলিল "ঐ মৃত দেহটা নিয়া সৎকার করিয়া আয়"। অতঃপর তাহার সহিত হাতাহাতি করিতে লাগিল। সে বলিল,

"তোকেই নিয়া যাই।" সতীশ বলিল, "আমার হাত ছাড়িয়া দে, চল ঠাকুরের ঘরে যেয়ে বসি"। সতীশ যাইয়া ঠাকুরের আসনের সম্মুখে বসিল। গোঁসাই উহাকে রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকা দিয়া কপালে তিলক করিয়া সাজাইলেন। পরে আর কিছু মনে নাই।

ঠাকুর এই স্বপ্ন শুনিয়া বলিলেন, "আমি বলিলে তোমরা বিশ্বাস করতে না, মৃত্যুর পর সতীশ টুক করিয়া আমার নিকট আসিল। আমি ঝোলা হইতে রাধাকুণ্ডের রজঃ দ্বারা কপাল সাজাইয়া দিলাম। সতীশ অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছেন। এক বৎসর পরে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য রাসস্থলের এক কোণে দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করিতে অধিকার লাভ করিবেন। সতীশ ব্রজাঙ্গনা হইয়াছেন, কর্ণে কুণ্ডল দুলিতেছে, ঘাগরা পরিয়াছেন। আমি বলিলাম, বেশ, একটু নৃত্য কর দেখি; সে অমনি হাত তুলিয়া নৃত্য করিয়া দেখাইল।"

যোগজীবন ঠাকুর বলিলেন মৃত্যুর পরক্ষণেই সতীশ হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া বলিল "কর্ত্তা চল্লাম"। জগন্নাথবল্লভ মঠের পণ্ডিতজী বলিলেন, রাত্রে আমাকে স্বপ্ন দিয়া গিয়াছে, "দেখুন, এত দিন প্রসাদ দিয়াছি, এখন আর পারব না, কৃপা করিবেন" এই পণ্ডিতজীকে ঠাকুরের আদেশ-ক্রমে সতীশ রোজ মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন।

সতীশ সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অথচ আশ্চর্য্য এই, উহার মৃত্যুতে কাহারও মুখে শোকচ্ছায়া দৃষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর পর আমি ভাবিতে লাগিলাম, একি আশ্চর্য্য, স্বামীজীর মৃত্যুতে বড় ক্লেশ পাইয়াছি, ইহার মৃত্যুতে হৃদয়ে শান্তি আছে কেন? অশ্বিনী, জগবন্ধু বাবু, ঠাকুর প্রভৃতি সকলেরই মুখে ঐ একই কথা। ইহা একটি অদ্ভুত ঘটনা বটে।

শুনিলাম মৃত ব্যক্তির জীবনেচ্ছা থাকিলে শোক হয়, সতীশের তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আর মৃত আত্মা সদ্‌গতি লাভ করিলেও উহার জন্য ক্লেশ হয় না।

মৃত দেহ দাহ করিবার জন্য উদ্যোগ চলিল। একখানা তক্তপোষ করিয়া অশ্বিনী, কুলদা, বিশ্বাস মহাশয় সরলনাথ প্রভৃতি 'শব' নিয়া স্বর্গদ্বারে গেলেন। বিশ্বাস মহাশয় বাসায় আসিয়া পরে বলিলেন একার্য্যে আমরা সকলেই একটা আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। মুর্দ্দফরাস পর্য্যন্ত আনন্দ করিতে করিতে কাষ্ঠ কাটিতে লাগিল।

শবদাহ হইতে লাগিল। অশ্বিনী কুলদাকে বলিল, চল একবার নিকটে গিয়া কিরূপ দাহ হইতেছে দেখিয়া আসি। উহারা শব চাপাইয়া রৌদ্রের জন্য দূরে বিশ্রাম করিতেছিল। উহারা উভয়েই নিকটে যাইয়া শবের ধূম হইতে সুগন্ধি নির্গত হইতেছে ঘ্রাণ পাইল। জগবন্ধু বাবুও এক অপূর্ব্ব সৌরভ দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে অনুভব করিলেন। অশ্বিনীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ আসিল, ভগবানের 'নাম' ও 'গুরুদত্ত শক্তি" আপনা আপনি প্রবল ভাবে খেলিতে লাগিল। ঠাকুরের নিকট আসিয়া অশ্বিনী, কুলদা, জগবন্ধু বাবু এ সকল গল্প করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, যাঁহাদের দেহ ভগবান স্পর্শ করেন, তাঁহাদের "শব' দাহ হইলে ঐরূপ সুগন্ধ নির্গত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূতনার দেহ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহার শব দাহ কালে গোপ সকল উহা হইতে চতুঃসোমের গন্ধ পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সতীশের দেহও যে ভগবান স্পর্শ করিয়াছেন, এই চিতাধূমের সৌগন্ধই তাহার একটী নিদর্শন।

শব নিয়া যখন শ্মশানে যায়, তখন রাস্তায় কেহ কেহ বলিতে লাগিল, অহো ভাগ্য, অহো ভাগ্য। একজন স্ত্রী মন্দিরের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব কি আমাদের এই রূপ মৃত্যু বিধান করিবেন, আর একজন বলিলেন "এই পূণ্য তিথিতে, পূণ্য মাসে এই স্থানের রজঃ প্রাপ্তি হইল, ইহার পরম সৌভাগ্য।"

মাঠাকুরাণী ইহাকে আদর করিয়া একটী কোর্ত্তা দিয়া গিয়াছিলেন;

সতীশ কদাচ উহার সঙ্গ ছাড়া হইত না। দেহ ত্যাগের কালেও উহা গায়ে দেওয়া ছিল, যেন জানিয়া শুনিয়া গায়ে পরিয়াই দেহ রাখিয়াছিলেন।

সতীশের প্রতিদিনের জীবনী অতি সুন্দর। ইনি কদাচ বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না, কখন পাঠে, কখন শাস্ত্রালোচনায়, কখন সৎপ্রসঙ্গে কখন বা অন্যের সেবায় দিন কাটাইতেন।

আজ কাল সতীশ খুব ভোরে চারিটার সময় উঠিয়া ঠাকুরের ভজন শুনিতেন, ঠাকুর ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ভোরে যোগজীবন বাবুর সঙ্গে সমুদ্রস্নানে যাইতেন। স্নানান্তে আসিয়া আনন্দ-কলহযোগে মুড়কি ও কখন কখন ক্ষীর প্রসাদ পাইতেন। সমুদ্রের পাড়ে যাইয়া কুলদা ও অশ্বিনীর সহিত আমোদ প্রমোদ করত কলহ করিতেন। "পাকাল" মহাপ্রসাদ খাইয়া ঠাকুরের জন্য পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য নকল করিতেন, কখন আবার মুন্সেফ বাবুর বাটী ছেলে পিলে পড়াইতে যাইতেন। ছেলে পিলে পাড়াইয়া যে অর্থ পাইতেন, তদ্দ্বারা মাতৃসেবা ও ধার শোধ করিবেন এই অভিপ্রায়। বানরের জন্য ছোলা, কলা, পেয়ারাও ঐ পয়সা হইতে দিতেন।

(সতীশ) একদিন আমাকে বলিল, দেখ, চরিতামৃত পাঠ শুনিলে আমার গরম মাথা স্নিগ্ধ হয়, নচেৎ অস্থিরতার আর সীমা থাকে না। তাই শত প্রযত্নে পাঠের সময় উপস্থিত হই।

শ্রীশ্রীচরিতামৃত প্রভৃতির পাঠ শুনিয়া পুনরায় পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য নকল করিত। পরে ১১টার সময় আমরা উভয়ে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে স্নানার্থ যাইতাম। নির্জ্জনে এই সময় আমরা পরমেশ্বরের ভজনসংক্রান্ত অনেক কথাবার্ত্তা বলিতাম। একদিন সতীশ বাগান হইতে কুড়াইয়া কতকগুলি "চন্দন বীজ" "ধানের শিস্" বন্যফুল আনিয়া ঠাকুরকে উপহার দিল, তিনি উহা অতি আদরে গ্রহণ করিলেন।

সতীশ শাস্ত্রে অত্যন্ত দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্রে যাহা

আছে, তাহা বেদবাক্য। নিজের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতেও শাস্ত্র-বাক্যের অধিক প্রামাণ্য। একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, শাস্ত্রে যে আছে "যুক্তিহীন-বিচারেতু বুদ্ধিনাশঃ প্রজায়তে" এস্থানে যুক্তি অর্থ শাস্ত্রীয় যুক্তি। নিজের বুদ্ধি বিদ্যা কিছুই নহে "সর্পে রজ্জুভ্রমবৎ" যাহা আজি সিদ্ধান্ত করিলাম, কাল তাহা পরিবর্ত্তন হইতেছে। শাস্ত্র সৎ অপরিবর্ত্তনশীল, সত্য। যোগী ঋষিরা উহা দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন। বিচারের সময় শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতে হইবে।

একদিন উদ্যানে বলিলেন, পূর্ব্বে আমাদের সাধনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিত। কেহ কেহ "মন্ত্র" জপ করিয়া উড়িতে পারিতেন। কেহ কেহ শরীর হইতে বাহির হইয়া ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। এরূপ মন্ত্র আছে; ঠাকুর তখন ঐরূপ মন্ত্র কেহ কেহ চাহিলে দিতেন।

"লালজী" এক একটী "মন্ত্র" একদিনে সাধন করিতে পারিতেন। সকালবেলা হইতে সন্ধ্যাবেলা পর্য্যন্ত একখানা পায়ের উপর একভাবে শয়ন করিয়া "গোপনে মন্ত্র" সাধন করিয়াছিলেন। অনেকেই "লালকে" গুরুর মত দেখিত, আমি ঐরূপ করিতাম না। তার কাছেও ঘেসিতাম না। মনে করিতাম একজনের আবার দুই গুরু; ব্যভিচার। একদিন শুইয়া আছি, দেখি লালজী আমার ভিতর প্রবেশ করিয়া 'কাণ' দিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম লাল আমাকে আয়ত্ত করিতেই ঐরূপ করিল।

আমি বলিলাম অশ্বিনীর সম্বন্ধেও ঐরূপ শুনিয়াছি। একদিন "ক্ষেপা-চাঁদ" নাকি উহাকে শরীর হইতে বাহির করিয়া লইয়া "বেনীঘাটে" স্নান করাইয়া আনে। কিন্তু, ভাই, আমার এ সকল বিশ্বাস হয় না।

সতীশ বলিল, একদিন গুরুজী কৃপা করিয়াছিলেন, দেখি শরীর হইতে বাহির হইয়া রাস্তা, ঘাট বাগানগুলি পরিষ্কাররূপে দর্শন করিতেছি। দিব্য

নারিকেলশ্রেণী, ঐ রাস্তা, ঐ গুবাকবৃক্ষসকল শোভা পাইতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমি বলিলাম, দেখ, "কুতু" (ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা) যে দিন দেহত্যাগ করে, সেদিন জামালপুরে উহাকে দেখি; বলিলাম, কুতু, আমার কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে? "কুতু" বলিল 'হাঁ'! সতীশ বলিল, আমি ময়মনসিংহে থাকিয়া স্কুলে পড়াইতেছিলাম। হঠাৎ এমন একটা টান উহার জন্য অনুভূত হইল যে, আর পড়াইতে পারিলাম না, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 'কুতু' দেহত্যাগের সময় আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন, 'তোমার ব্রজপ্রেম লাভ হইবে'। ইঙ্গিতে জানাইলেন তাঁহারও উহা লাভ হইবে।

(পরে) সতীশ বলিল "একটু ভাব হইল, চক্ষের জল পড়িল, উহাতে কিছু হয় না। আমারও ঐরূপ ভাব ঢের হইয়াছে। সাধন যখন পাই, একটী ধর্ম্মের কথা শুনিলেই অনর্গল চক্ষে জল পড়িত। চারি পাঁচ মিনিট চলিত, নাক দিয়া পোঁটা পড়িত। ঠাকুর একবার সম্মুখস্থ এক ব্যক্তিকে নাকের জল পুছাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

সতীশ স্নান করিয়া কিছুক্ষণ 'গায়ত্রী' জপ করিতেন। 'দুর্গা দুর্গা' বলিতেন, উঠিবার কালে, অন্য সময়েও মাঝে মাঝে 'দুর্গা' নাম আওড়াইতেন। স্নানের সময় আমরা বড়ই আনন্দ করিতাম, জলে পা ধরিয়া টানিতাম ও নানারূপ কৌতুক করিতাম।

স্নানান্তে আসিয়া 'পাকাল প্রসাদ' পাইত, পরে গ্রন্থ নকল করিত। পাকালের ভিতর ডাল, তরকারী, টক প্রভৃতি একসঙ্গে করিয়া রাখিত। যখনই ক্ষুধা লাগিত, অমনি দুই একগ্রাস খাইয়া আসিত। তাহার পাকাল নিয়ত বর্ত্তমান থাকা চাই, দুই দিনের বাসী বা কে জানে। বাসী হইতে হইতে পাকালে পোকা পড়িত। একদিন পচিয়া ও পোকা

পড়িয়া এমনি খারাপ হইয়াছিল যে, ঠাকুরের নিকট দুঃখ করিয়া বলিল "আজ আর পাল্লাম না"। পরদিন জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া ভক্তির সহিত প্রসাদ পাইল, কিন্তু আশ্চর্য্য, আজ উহাতে আর পোকা নাই। তাহার প্রসাদ ঐরূপ পচিয়া থাকিত বলিয়া উহা আর কেহ গ্রহণ করিতে চাহিত না, তাহারও সুবিধা হইয়াছিল, যখন ইচ্ছা তখন সে উহা পাইত। সতীশ বলিত মহাপ্রসাদ খাইলে মন প্রসন্ন হয়। আমি উহাকে একদিন বলিলাম, ভাই, প্রসাদও খাইতে পারি না, কি করিব? সতীশ বলিল, জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ পাইস, তা'হলে আর অরুচি থাকিবে না। সতীশকে দেখিতাম প্রতিগ্রাসে নমস্কার করিয়া করিয়া প্রসাদ পাইতেছে। একদিন বলিল সুভদ্রামায়ীর কি কৃপা, তিনি আজ প্রসাদ খাওয়াইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহাপ্রসাদে সতীশের যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও দেখি নাই।

এদিকে ঠাকুরের মধ্যাহ্নক্রিয়া শেষ হইলে পান্না আসিয়া মহাভারত পাঠ করিত। সতীশ ঠাকুরের কিছু প্রসাদ পাইয়া পাঠ শুনিতে বসিত। সতীশ এই সময়ে মাঝে মাঝে ঠাকুরের সহিত ধর্ম্মালোচনাও করিত, উহা বড়ই মধুর লাগিত। একদিন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশ কেমন আছ? সতীশ আব্দার করিতে করিতে বলিল "গুরু যদি কৃপণ হয়, তবে আর আনন্দ কোথায়?" ঠাকুর শুনিয়া হাসিলেন। সতীশ বলিল, অতঃপর সারাদিন আনন্দে কাটাইতাম।

নিয়ত মহাপ্রসাদ পাইতে পাইতে সতীশের শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নির্গত হইয়াছিল। পাকাল ও প্রসাদ মাত্র খাইয়া এইরূপ অপূর্ব্ব সুস্থতা ও সতেজ ভাব কাহারও দেখি নাই। তাহাকে সর্ব্বদাই আনন্দে প্রফুল্ল দেখিয়াছি। রথের সময় মহাপ্রসাদ পাওয়া যায় না, ঐ পোনের দিন ঠাকুরের প্রসাদ কিম্বা কুলদা কি দিদিমাতা রাঁধিয়া দিলে খাইত; এই নিয়মের

কদাচ উল্লঙ্ঘন করিত না। প্রথম বার জ্বরে কেবল পাকালের জল খাইতে খাইতে আরোগ্য হইল। অতঃপর কাল জ্বর আসিয়া গ্রাস করিল; আর আমাদের প্রাণের অমৃতস্বরূপ বন্ধু নিস্তব্ধে নীরবে চলিয়া গেলেন। সতীশ এরূপ নিষ্টি ছিল যে, কেহ তাহার প্রতি বহুক্ষণ ক্রোধ পোষণ করিতে পারিত না। তাঁহার স্বভাবের ভিতর এমনি অমায়িক ভাব, মিষ্টতা, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা দৃষ্ট হইত যে, উহাতে সকলেরই চিত্ত অপহৃত হইত। সতীশের অভাবে দৃঢ়রূপে আঘাত পায় নাই এরূপ পরিচিত লোক দৃষ্ট হয় না। অনেকেই নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করতঃ পরলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছেন।

পাঠ শুনা হইলে পুনরায় গ্রন্থ নকল করিত। কখন কখন ধর্ম্মপ্রসঙ্গও করিত। কিছু পরে প্রসাদ পাইয়া জগন্নাথবল্লভ উদ্যানের পণ্ডিতজীকে ও নরেন্দ্রের পাড়ের গোঁসাই প্রভুকে মহাপ্রসাদ দিয়া আসিত। গোঁসাই প্রভু বলিতেন, আহা এমন লোক, প্রসাদ দিয়াই নমস্কার করিয়া জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া থাকে, চরিত্র ও ব্যবহার কি সুন্দর!

ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া হইলে তাঁহার সমীপে বসিয়া সতীশ গল্প সল্প করিত ও শুনিত। অতঃপর সন্ধ্যা হইলে মুন্সেফ বাবুর ছেলেদিগকে ও ইন্সপেক্টর বাবুর ছেলেদিগকে পড়াইতে যাইত। ৮টা ৮৷ টার সময় আসিয়া কিছু মুড়কি প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিত। পরে ১০ টার সময় উঠাইয়া দিতাম। তখন ঠাকুরের নিকট ষট্‌সন্দর্ভ, বৃন্দাবনবিহার ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিত, আমরা শয়ন করিয়া উহা শুনিতাম। ঐ সময়ে ঠাকুরের সহিত যেরূপ কৌতুক ও আমোদপ্রমোদসহকারে ভগবৎলীলা চর্চ্চা করিত, উহা শুনিয়া প্রাণে আনন্দ হইত। কখন কখন মনে মনে হিংসাও হইত।

ঠাকুর রাত্রিতে কখন কখন সতীশের লিখিত "শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা" শুনিতেন, শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। শাস্ত্রের কথা আলোচনায় সতী

বড় সন্তুষ্ট হইতেন, এই জন্য নিজে শাস্ত্রোদ্‌ঘাটন না করিয়া সতীশের দ্বারা করাইতেন। সতীশের প্রণীত "বৃন্দাবনপরিক্রমা' আসনের গ্রন্থের মধ্যে যত্ন-সহকারে রাখিয়া দিয়াছিলেন, বানর মারার বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি ছাপাইয়া দিতে প্রোৎসাহিত করিতেন।

সতীশের ইদানীং শাস্ত্রজ্ঞানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে ঠাকুর "তত্ত্ববাগীশ" উপাধি দিয়াছিলেন। যিনি শাস্ত্রের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ, তিনিই এই উপাধি পাইতে পারেন। সতীশও উপাধি পাইয়া খুব সুখী হইয়াছিল। ভিতরে ভিতরে উপাধিলাভের একটু বাসনাও ছিল প্রকাশ করিল।

সতীশের দেহত্যাগের পর একদিন ঠাকুর বলিলেন সতীশ যেটুকু পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য নকল করিয়াছে, কলিকাতা যাইয়া উহা বাঁধাইয়া শাস্ত্রসকলের ভিতর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রাখিব।

শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া সতীশ কিছুদিন সকলের সেবার উদ্দেশে "পায়খানা" পরিষ্কারকরণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেথর ডাকিয়া পুনঃ পুনঃ উহাদের দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার করাইয়া লইতেন, চুণ দেওয়াইতেন, "ফিনাইল" দেওয়াইতেন। ঠাকুর যখন দর্শনে বাহির হইতেন, সতীশ সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। সকাল বেলা যখন সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেন, সতীশ ঠাকুরের বসিবার জন্য কম্বল, মাটী, গামছা নিয়া পিছনে পিছনে দৌড়িতেন। পথে প্রতিদিন দশ পয়সা "কবীরপন্থী" বাবাজী ও আর একটী সাধুকে দিয়া সমুদ্র পাড়ে পৌঁছিতেন।

পথে মধ্যে মধ্যে মুন্সেফ বাবু, ও Overseer (ওভারসিয়ার) বাবুর সহিত ধর্ম্ম অলোচনা করিতেন। সমুদ্র পাড়ে যাইয়া বিধু বাবুর সহিত প্রণয়কলহ করিয়া স্নান করতঃ শ্রীমন্দিরে আমাদের পূর্ব্বেই যাইতেন। মন্দিরে দুপয়সার মুড়কী প্রসাদ খাইয়া গীতা এক অধ্যায় পাঠ করতঃ বাসায় ফিরিতেন। বাসায়

আসিয়া "চা" প্রসাদের জন্য আব্দার করিতেন। এইরূপে নানা ভাবে শ্রীক্ষেত্রে আট নয় মাস অতিবাহিত করিয়া নিজের চিরাভিলষিত অমৃতধামে চলিয়া গেলেন।

শ্রীক্ষেত্রে বাসকালে সতীশের বানর মারার বিরুদ্ধে ও মন্দিরের গায়ের পায়খানা ভাঙ্গার জন্য পরিশ্রম বড়ই অলৌকিক। স্বামীজী ও সতীশ উভয়ই প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সতীশ স্বামীজীর অভাবে উভয়ের ভার গ্রহণ করিয়া খাটিয়াছিলেন। স্বামীজীর বানরের চিন্তায় ঘুম হইত না, সতীশ ঐ ক্লেশে জ্বর হইয়া দিন দশ বার ভূগিয়াছিল। আমি একদিন বলিলাম, সতীশ, তুই যে বানরের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জ্বর হইয়া পড়িয়াছিস, তুই যদি মরিস্ তবে তোর চরিত্র লিখিলে ইহা লিখিব। সতীশ বিনয়সহকারে বলিল, স্বামীজী আমার চেয়ে ঢের পরিশ্রম করিয়াছেন। সতীশ প্রায় সমস্ত বড় বড় ছিঠি, টেলিগ্রাম প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। প্রায়ই এই সম্বন্ধে কোথায় কি আলোচনা হইতেছে খবর রাখিতেন। Vice-chairman এর (ভাইস-চেয়ারম্যান) নিকট যাইতেন। সতীশের অপূর্ব্ব যুক্তি ও তেজের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিধু বাবু আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

একদিন স্নানে সমুদ্রে যাইতেছি, দেখি সতীশ বড় উত্তেজিত হইয়া কোথায় যাইতেছে, উহাকে ডাকিলাম আসিল না; পরে শুনিলাম, Vice-chairman এর নিকট যাইয়া তাহার কপট ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া তাহাকে double-mouthed (দো মুখো) বলিয়া বিধু বাবুর নিকটে গেল। উকিল বিধু বাবু উহার যুক্তিতর্কে আকৃষ্ট হইয়া সভাতে এই সম্বন্ধে বলিবেন স্বীকার করিলেন। বিধু বাবু সতীশকে বসাইয়া এই সম্বন্ধে আরও যুক্তিতর্ক শুনিতে চাহিলেন, কিন্তু সময় অল্প বলিয়া সতীশ চলিয়া আসিল। বিধু বাবু একজন ভাল উকিল, সজ্জন ও ব্রাহ্মণ। উত্তেজনায় সতীশের জ্বর জ্বরে ১০।১২ দিন ভূগিল।

প্রথমতঃ যখন বানর মারা সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য আলোচনা হইয়াছিল, তখন হরিবল্লভ বাবুর নিকট সতীশ ও স্বামীজীকে ঠাকুর পাঠাইয়া দেন। হরিবল্লভ বাবু বানর মারার প্রতিবাদ করিয়া এইজন্য Vice-chairman কে অনুরোধ করিবেন বলিলেন, কিন্তু মন্দিরের পায়খানা কেন যে রাখা হবে না তাহা বুঝিতে পারেন না। সতীশ হরিবল্লভ বাবুর সহিত অনেক যুক্তি তর্ক করিলেন, সতীশের যুক্তি এমনি পরিষ্কার ও সুন্দর হইল যে হরিবল্লভ বাবুও তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। সতীশের আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল, বুদ্ধিও খুব পরিষ্কার ছিল।

উকীল বড় হরিশ বাবু মালাতিলকাদি বৈষ্ণবলক্ষণ ধারণ করিলেই ধর্ম্ম-জগতে বিশেষত্ব লাভ করা যায় বলিলে উহার বিরুদ্ধে সুন্দর শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়া সতীশ বলিলেন যে, ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। শাস্ত্রেও আছে :—

"নাবিরতো দুশ্চরিতো নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈব আপ্নুয়াৎ॥"

দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত না হইলে, প্রাণ অপবিত্র থাকিলে, কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

সতীশের মৃত্যু হইলে কিছুদিন পর্য্যন্ত ঠাকুর অত্যন্ত কৃশ হইতে লাগিলেন; হাতের রুদ্রাক্ষের বেড় ঢিলা হইয়া গেল। আমি এই সময়ে একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দুই তিন দিন আমার একরূপ জ্বর হইয়াছিল, তাহা আভ্যন্তরিক ক্লেশে উৎপন্ন, তাহা শারীরিক নহে। ঠাকুর বলিলেন, আমার এই জ্বরও তাহাই।

সতীশ তাহার ছাত্রদিগকে পিতামাতার ন্যায় যত্ন করিয়া পড়াইতেন। হ্যারিসন রোডের বাসায় দেখিয়াছি নিজের অর্থে ছেলেদের জন্য নানারূপ সুন্দর গ্রন্থ কিনিয়া দিতেন। তাঁহাকে ছেলেরা অত্যন্ত ভাল বাসিত। মুন্সেফ বাবুর ছেলেরা বলিত, আমাদিগের কত মাষ্টার হইয়াছে, কিন্তু এমনটী

আর হয় নাই। জামালপুর হইতেও ঐ একই কথা। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে হেডমাষ্টার প্রভৃতি সকলেই খুব সন্তুষ্ট থাকিতেন।

ঠাকুর পুরুষোত্তমযাত্রা করিবেন শুনিয়া সতীশ পাগলের মত হইল, হাঁটিয়া স্কুল হইতে ময়মনসিং আসিল। ময়মনসিংহে শ্রীশ প্রভৃতি পেণ্টেলুন পরা ইহাকে দেখিয়া খুব আশ্চর্য্য হইল। হাঁটিয়া হাঁটিয়া নাকি গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত আসিয়া রেলে উঠে।

সতীশ গুরুপরিবারকে নিজ পরিবার হইতেও আপন মনে করিত। প্রায়ই কার্য্যস্থান হইতে তৈল, ঘৃত ও বেগুন প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষ ঠাকুরের জন্য নিয়া আসিত। পার্শেলে জিনিষ পাঠাইবার জন্য খালি টিনগুলি লইয়া যাইত।

হ্যারিশান রোডের বাসায় এক সময় বড়ই অর্থাভাব হইয়াছিল। সতীশ তিন শত টাকা ধার করিয়া পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়া ছেলে পড়াইয়া উহাই শোধ করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। ঐ বাসায় ঠাকুরের নিকট নিত্য শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম স্কন্ধ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। আমরা সকলে শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতাম। গঙ্গায় তিনবার স্নান করিতেন, গঙ্গার আরতির জন্য ঘাটের ঠাকুরকে পয়সা দিতেন।

একদিন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসায় দেখিলাম ঠাকুর দোতলায় হাত মুখ ধুইয়া স্নান করিতেছেন, ঐ জল নর্দ্দামা দিয়া পড়িতেছে, সতীশ ঐ নর্দ্দমার নীচে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐ জলেই সতীশের স্নান হইয়া গেল। সতীশ আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া অনুনয় করিয়া বলিল, দেখিস্, এই কথা কাহাকেও বলিস্‌ না।

এক দিন কুম্ভমেলায় ঠাকুর বেড়াইতেছেন, একটী সাধু ঠাকুরের পদ্মপুরাণের শ্লোক উচ্চারণের ব্যঙ্গ করিয়া ঠাট্টা করিয়াছিল, সতীশ তাহার কাণ কামড়াইয়া দিতে উদ্যত হইল। গেণ্ডারিয়াতে একটী ভদ্রলোক কুকুর নিয়া

আশ্রমে আসিয়া ঠাকুরের সহিত বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছিল, সতীশের উহা সহ্য হইল না। কুকুর নিয়া আশ্রমের আঙ্গিনায় আসিয়া আবার বাগ্‌বিতণ্ডা, এই বলিয়া একটী ইষ্টক হাতে নিল। ভাগ্য যে উহা ছোড়ে নাই।

সতীশের সহিত ঢাকায় নবকান্ত বাবুর বাড়ীতে আমার প্রথম দেখা। দেখিয়াই উহাকে একটী শান্ত, শিষ্ট লোক বলিয়া ধারণা জন্মিল। আমাদের ধোপা উহারও কাপড় ধুইত। সে বলিল সতীশ বাবুর মত ভাল লোক আমি দেখি নাই!

সতীশ যখন "সমস্তিপুরে' কাজ করিত, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সে মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া এক খানা আর্দ্র কাপড় পরিয়া কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনের দিকে ছুটিল। ঠাকুর তখন ঐ স্থানে ছিলেন। পথে যাইতে এলাহাবাদে একটী সাধু দর্শন করে। তাহার প্রতি সতীশের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ঐ সাধুটী সতীশকে শিষ্য করার প্রভিপ্রায়ে নানারূপ বুজরুকী দেখায়। সতীশকে দিয়া তাহার বোঝা টানাইতে লাগিল। একদিন পথে যাইতে যাইতে ঐ সাধুটী বলিল এই বোঝা ভূতে টানিত। সতীশ ইহা শুনিয়া এবং ইহার অভিপ্রায় সৎ নহে অবগত হইয়া বোঝা ফেলিয়া দৌড় দিল। ঐ সাধুটীও পিছনে পিছনে ছুটিল এবং সতীশকে খুব মারিতে লাগিল, সতীশ একটা কূপে লম্ফ দিয়া পড়িয়া প্রাণ রক্ষা করিল। কয়েকটী রাখাল সতীশকে বহু ক্লেশে উঠাইয়া একটী বৃক্ষতলে রাখিয়া গেল। সতীশ ঐ সময়ে মারের আঘাতে অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় ঐ বৃক্ষতলেই পড়িয়া রহিল। সতীশ প্রকাশ করিয়াছে ভগবানের বিশেষ কৃপা যেন সে উপলব্ধি করে। ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া ঐ বনস্পতির নিকট আহারের জন্য প্রার্থনা করিল, হঠাৎ ঐ বৃক্ষ হইতে একটী সুপক্ক বেল ফল সতীশের সম্মুখে পড়িয়া দ্বিখণ্ড হইয়া রহিল, সতীশ উহা খাইয়া চলিল। ঐ বৃক্ষে অনুসন্ধান করিয়াও পরে অন্য কোন ফল দেখিল না। ঐ

সময় পরমহংসজীর সহিত সতীশের সাক্ষাৎ হয়, তিনি উহাকে উপদেশ দেন। সতীশ ঐ বৃক্ষমূল হইতে উলঙ্গ অবস্থায় চলিল। পরিধেয় বস্ত্র কূপে কি সাধু নিয়া গিয়াছিল। অনন্তর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিল। অঙ্গে বস্ত্র নাই, ছেলেরা গায়ে ধূলা দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। একদিন একটী স্ত্রীলোক ইহার এই অবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া একখানা পরিধেয় বস্ত্র দিল ও কিছু আহার করাইয়া ইহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল। এই স্থান হইতে রওনা হইয়া নানা অবস্থায় পড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে গুরুস্থানে পৌঁছিল।

এই সকল ঘটনা শুনিয়া আমি উহাকে আবদার করিয়া "পাগল" বলিয়া ডাকিতাম। একদিন মোহিনী বাবুর তিলক চাটিয়া দিল। ধুলটের সময় উহার ভাব হইয়াছে, শ্রীশ (সতীশের ছোট ভাই)ঠাকুরকে নমস্কার করিলে লাথির উপর লাথি মারিতে লাগিল; কেন না লাথির দ্বারা কর্ম্মভোগ সকল কাটিয়া যাইবে। প্রণয়কলহ করিয়া কুলদার হাতে এক কামড়। সরলনাথ শ্রীমন্দিরে সকলের জন্য খাজা নিয়া যাইতেছে, হাতে এক কামড়। আর যাই উহা পড়িয়া গেল, উহা নিয়া চম্পট। পাঁচমাস, সাতমাস পর্য্যন্ত কেবল জল ভাত আহার। মিষ্টি খাইত না। কয়েক মাস পর্য্যন্ত কেবল ভাত আর ইলীস মাছ আহার। এরূপ কিছুদিন কেবল বেগুন, কেবল ঘৃত অন্ন, কেবল পিঠা খাইত। এখানে আসিয়া জগন্নাথদেবকে নারিকেলজল দান করিয়াছিল, কিন্তু সে নারিকেল খাইতে ছাড়িবে না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, যা বেটা, আমি ত নারিকেলজল দান করিয়াছি, নারিকেলে কি? একবার চশমার টাকার জন্য উহাকে চিঠি লিখিয়াছি, চিঠিতে চশমা আঁকিয়া দিল। মোহিনী বাবুকে বড় ভাল বাসিত, তাহার কাপড় চুরি করিবে, গাত্রবস্ত্র নিবে ইত্যাদি। মোহিনী বাবুরও অন্তরে খুব সন্তোষ।

• ঠাকুর ইহার ব্যবহার বড় ভাল বাসিতেন; ইহার নাম করিতে আনন্দে,

যেন আটখানা হইতেন, কতই গৌরব করিয়া বলিতেন 'সতীশ এই করিয়াছে, এই করিয়াছে।'

সতীশ যে বৃন্দাবনপরিক্রমাকালে ঠাকুরের সমস্ত বস্ত্রাদি বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেলে মিঠাইওয়ালাদের দোকান হইতে কম্বল সেকিয়া শুখাইয়া আনিয়া দিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি কতবার গল্প করিয়া বলিতেন, সতীশ বড় যত্ন করিয়া কম্বল শুখাইয়া আনিয়াছিল।

শ্রীবৃন্দাবনের পথে যে সাধুটী উহাকে মারিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কুম্ভমেলায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। পুনরায় উহাকে আত্মসাৎ করিতে চাহিলে সতীশ তাহাকে দুই "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ" দেখাইল। ঠাকুর এই কথা উল্লেখ করিয়াও গল্প করিতেন। কুম্ভমেলায় ঐ যে সাধুটীর কাণ কামড়াইতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাও উল্লেখ করিয়া গল্প করেতেন। সতীশের মৃত্যুতে মণি বাবু লিখিয়াছিলেন, 'উহার যে রূপ গুণ, উহার এক কণা পাইলেও ধন্য হইয়া যাইতাম, সতীশ যথার্থই মহাত্মা ছিলেন। এমন স্বার্থত্যাগী কয় জন আছেন?' মোক্ষদা বাবু লিখিলেন, 'পাঠ্যাবস্থা হইতেই সতীশের আমার উপর একটা দৃষ্টি ছিল। আমায় সৎ কাজে লওয়াইতে বিশেষ চেষ্টা করিত। আমার একটা বল গেল। সতীশ থাকিতে বানরের কলা খাওয়ার জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতে আমাকে লিখিয়াছিল।'

সতীশের অকৃত্রিম বন্ধু বিধুভূষণ মজুমদার উহার জীবনের কয়েকটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া এইরূপ চিঠি লিখিয়াছিলেন ঃ—

একদিন কলিকাতায় নেড়াদের (চন্দ্রমণি) বাড়ী কীর্ত্তন হয়। কিছু কাল কীর্ত্তন হইলে পর ঠাকুর মহোল্লাসে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, সতীশ, বৃন্দাবন বাবু, জগবন্ধু বাবু ও অন্যান্য ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। ভাবে বিভোর হইয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন "আমাকে চিনিতে পারিতেছিস্?" প্রথমে আমরা স্থির করিতে পারিলাম না ঠাকুর কাহাকে লক্ষ্য করিয়া একথা

গুলি বলিতেছেন, পরক্ষণেই দেখিলাম সতীশের প্রতি চাহিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ কথাগুলি বলিতেছেন; ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইল যে, পূর্ব্বলীলায় আমাদের শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন।

সতীশ যখন সমস্তিপুরের স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, তখন একজন সাধু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। সাধুকে যথোপযুক্ত সৎকার করিয়া রাত্রিতে পদসেবা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল যে, তাঁহার কোন আত্মীয়ের মাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটী বলিলেন, সতীশ! এই আমি বৈকুণ্ঠে আসিলাম। সতীশও বৈকুণ্ঠ দর্শন করিল। সাধুটী অমনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা! বৈকুণ্ঠ দর্শন করিলে ত? গোলোক দেখিলে কি?" তৎপরে সতীশ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন সত্য সত্যই তাঁহার ঐ আত্মীয়া ঐ সময়ে মুন্সীগঞ্জে দেহত্যাগ করেন।

জামালপুরে একদিন সতীশ তাঁহার পীড়িত ভ্রাতুষ্পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন কয়েকটী পরলোকগত আত্মা বালকটীকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সতীশ 'হঠ' করিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন কিছুতেই বালকটীকে মরিতে দিবেন না। সেখানে স্থির হইয়া বসিয়া নৃসিংহমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী ভীষণ মূর্ত্তি উপস্থিত হইয়া বলিল "তুমি কেন জেদ্ করিতেছ? বালকটীর পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে, তোমার তপস্যায় অন্ততঃ আর ছয় মাস বাঁচিতে পারে। শয্যা ছাড়িয়া দাও।" সতীশ উঠিয়া গেলেন, পরক্ষণেই বালকটীর মৃত্যু হইল।

জামালপুরে অবস্থিতিকালে জনৈক ভদ্রলোকের সহিত সতীশের ঝগড়া হয়। ভদ্রলোকটী সতীশকে অপমান করিতে চেষ্টা করে। রাত্রিতে সতীশ দেখেন ঐ ভদ্রলোকের পরলোকগতা পত্নী উপস্থিত হইয়া করজোড়ে বলিতেছেন, আপনি আমার স্বামীকে ক্ষমা করুন।

একদিন ঠাকুর বসিয়া পাঠ করিতেছেন, সতীশ সংলগ্ন কোঠায় বসিয়া কি জানি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার তন্দ্রার ন্যায় আবেশ হইল, দেখিলেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অতি সুন্দর বালক বেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "এই শ্লোকের ব্যাকরণগত অর্থ এই, আর এক গূঢ় অর্থ আছে।" ইহা বলিতেই তাঁহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ঠাকুরের নিকট আসিয়া সব কথা বলাতে তিনি বলিলেন "জগবন্ধু (জামাতা) এই মাত্র এখানে আসিয়া ভাগবতের একটী শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি তাহাকে সাধারণ অর্থটি বলিলাম, গূঢ় অর্থটী বলিলাম না।"

একদিন কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ঠাকুর অবস্থিতি করিতেছিলেন। সমস্তদিন ঘরটী লোকে পরিপূর্ণ ছিল, রাত্রিতে ভক্তগণ অনেকেই চলিয়া গেলে পর সতীশ, হরিমোহন বাবু, আরও দুই চারি জন ঠাকুরের নিকট রহিয়া গেলেন। রাত্রি গভীর হইলে সতীশ, হরিমোহন বাবু ও আর একজন ব্যতীত আর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, মা আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমার আর অভাব নাই ও আর হইবে না। পরিবারের লোকেরা কেন বলে, ইহা নাই উহা নাই। মা বলেছেন সব অমাব পূর্ণ হইবে, আর চিন্তা নাই। সতীশ ও অন্য দুটী ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন তোমরা বড় অজ্ঞ। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন মানস-পুত্রের উৎপত্তি করিলেন, কিন্তু দেখিলেন তাহারা জন্মমাত্রই বিষয়ে অনাসক্ত ও ধ্যানপরায়ণ। তখন বুঝিলেন, ইহাদের দ্বারা সৃষ্টির প্রসার হইবে না; তখন বিন্দুপাত দ্বারা প্রচলিত প্রণালীতে সন্তান উৎপাদন করিলেন; সেই হইতেই এই লোক সৃষ্টি; সেই বিন্দু আমাদের শরীরেও আছে। এই বিন্দু রক্ষা করিতে পারিলে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়,। তাহার পর উহা রক্ষা করিবার উপায় বলিলেন ও একটী মাত্র

মন্ত্র বলিয়া দিলেন। মন্ত্রটী তুই একবার উচ্চারণ করিতেই বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ, দেবর্ষি নারদ এই গুহ্য বস্তু প্রকাশ করিতে বাধা দিতেছেন।" দেবর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "নারদ, বীণাযোগে হরিগুণ গান করিয়া তুমি পরমানন্দে দিন কাটাও, তুমি জীবের দুঃখ কি বুঝিবে? মা আমাকে আদেশ করিয়াছেন বলিয়া আমি এই গুহ্য তত্ত্ব বলিলাম।" সতীশ পুনরায় মন্ত্রটী আবৃত্তি করিতে বলিলে ঠাকুর বলিলেন "তুই কে? তোকে কেন বলিব, আমি কি পাঠশালার গুরুমহাশয় যে বারবার বলিতে হইবে?" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপরে অতি নিকটে থাকিয়াও এই সকল কথা শুনিতে পাইলেন না ও বুঝিলেন না বলিয়া বোধ হইল। সতীশের কথা, সতীশই বুঝিল।

শ্রীবৃন্দাবনে এক দিন কোথা হইতে তিনজন অপরিচিত সাধু হঠাৎ আশ্রমে উপনীত হইলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগকে দর্শন করতঃ সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইয়া যথাযোগ্য সম্মানসহকারে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি স্বীয় গাত্রের আলখেল্লা খুলিয়া রাখিলেন। অতঃপর সাধুগণ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণপূর্ব্বক কোন প্রকার বাক্যালাপ না করিয়াই ভক্তিভরে প্রণাম করতঃ আশ্রম হইতে নিক্রান্ত হইলেন। এতদ্দর্শনে গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য প্রেমিক ভক্ত ৺সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৌতূহলপরবশ হইয়া সাধুত্রয়কে অনুসরণ করতঃ রাস্তায় বহির্গত হইলেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছেলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের শরীরেই বা কি দেখিলেন? বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থকিলে বলিতে আজ্ঞা হউক। এই কথা শ্রবণ করিয়া তন্মধ্য হইতে এক জন মহাপুরুষ হিন্দি ভাষায় এই মর্ম্মে বলিলেন "আমরা হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে বাস করি। তথায় অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের

সমাগম হইয়া থাকে। একদিন তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, বঙ্গ দেশের অন্তর্গত শান্তিপুরে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবংশে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি-নামক একজন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মবিতরণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভগবদ্বিধানানুসারে তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে এবং তিনি এখন শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া আমরা সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলাম। যাঁহার উপর যখন এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ভার অর্পিত হয়, তখন তাঁহার শরীরে কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারেন। আমরা তোমাদের গুরুজীর সর্ব্বাঙ্গে সেই সকল লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত দেখিয়া বিস্মিত ও ধন্য হইয়াছি। তোমরা তাঁহার কৃপাপাত্র, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

আমরা সাধু সতীশচন্দ্রের পুণ্য-কাহিনী পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। আমাদিগের বিশ্বাস, ইহা পাঠ করিলে চিত্তে অবিচলা ভক্তির আবির্ভাব হয়।

—০—

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(১)

নানাবিধ কারণে অনেকগুলি ঘটনা প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত করিবার সুযোগ ঘটে নাই; এই নিমিত্ত এই স্থলে সেই সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশিত করা হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের একটী বিশ্বস্ত বন্ধু তাঁহার নিকটে এই ঘটনাটী বলিয়াছিলেন ঃ—

একটি কায়স্থ ভদ্রলোক পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরে ৺ গয়াধামে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান করিতে যাত্রা করেন। পথে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে থাকেন। আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন, সেই গ্রামেরই এক ব্যক্তি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট খত দিয়া কিছু টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেই লোকটীর নিকট জানিলেন, এখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনিও সেই গ্রামবাসী জানিয়া বলিলেন, "শুনিলাম তাঁহার নাকি একটি পুত্র আছে। সে ত আমার টাকা দিতেছে না।" তাহার পিতার নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তুমি একথা তাঁহার পুত্রকে বলিও। ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'যে আজ্ঞা'। তিনি নিজেই যে সেই ঋণগ্রহীতার পুত্র, তাহা গোপন করিলেন। এখানে যে তাঁহার পিতার ঋণ আছে তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, দেখ রাত্রিতে ঘরের বাহির হইতে হইলে আমাকে ডাকিও। আমাদের বাড়ীতে ভয়ানক একটা কুকুর আছে, সেটা

অচেনা লোক দেখিলে উদ্বেগ দেয়। তিনি যে ঘরে শয়ন করিলেন, কুকুরটা সেই ঘরের বারেন্দাতেই শয়ান ছিল। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর তাঁহার বহির্ভাগে যাইবার অত্যন্ত আবশ্যক বোধ হওয়ায় ব্রাহ্মণকে ডাকিবার অবসর পাইলেন না, কুকুরটীও তাঁহার অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি পুনর্ব্বার ঘরে আসিলেন, কুকুরটিও ঘরে প্রবেশ করিল। ভয়ে কুকুরটিকে তাড়াইতে পারিলেন না; কুকুরটা তাঁহার মাথার নিকটে কুণ্ডলী করিয়া শয়ন করিল। তিনিও শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রাবস্থায় শুনিতে পাইলেন, "বাপুহে, শুধু গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিলে আমার উপকার হইবে না। আমি এই ব্রাহ্মণের নিকট খত দিয়া টাকা ধার করিয়াছিলাম। আগে ঐ টাকা শোধ করিয়া দাও। পরে পিণ্ডদান করিলে উপকার হইবে। সেই ঋণের দায়ে কুকুর হইয়া এখন ইহার বাড়ীতে আছি। হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় ঋণের কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই।"

এই স্বপ্ন দেখিয়া অবশিষ্ট রাত্রিতে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না। প্রাতে উঠিয়া হাতমুখ ধৌত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কুকুরটা তোমাকে কোন উদ্বেগ দেয় নাই ত ?" তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে না।" তৎপর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুদে-আসলে আপনার কত টাকা পাওনা হইয়াছে ? সেই খত খানা কি একবার দেখিতে পারি ? তাহা হইলে আমি আপনার টাকা পরিশোধের চেষ্টা করিতে পারি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হাঁ, তাহা দেখিতে আপত্তি কি ?" তখন খত আনিয়া উহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, আমার টাকা কয়টা যাহাতে পাইতে পারি তাহা করিও।" এপর্য্যন্ত ভদ্রলোকটী স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই। স্বপ্নে দেনার কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, সুদে আসলে এখন ঠিক তাহাই হইয়াছে জানিতে পারিলেন। অতঃপর ইনি ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন, গয়াগমন স্থগিত রহিল। বাড়ী পৌঁছিয়া

কিছু দিনের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহা বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিলেন এবং টাকা শোধ করিয়া দিলেন। তখন তিনি সেই খাতকেরই পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন; কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন না।

তথা হইতে গয়া যাইবার সময় ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনার বাড়ীর কুকুরটী কখন মারা যায়, একটু লিখিয়া রাখিবেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ ত শক্ত কথা—পশু কখন কোথায় মারা যায় তাহা আমি কি করিয়া জানিব? আর মৃত্যুর সময়টা লিখিয়া রাখিব বলিয়া তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেই কিরূপে?" তখন সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "যদি আপনার সাক্ষাতে মারা যায়, অথবা যেখানেই মারা যায় জানিতে পারেন, তবে লিখিয়া রাখিবেন।" এই বলিয়া তিনি গয়া যাত্রা করিলেন।

ভদ্রলোকটী ৺গয়াধামে যাইয়া যথারীতি পিণ্ডদান করিলেন। পরে ৺কাশীধাম, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া সর্ব্বত্রই যথাসাধ্য পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া কিছুকাল পরে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে একদিন বাড়ীর উঠানে পড়িয়া ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে কুকুরটী মারা গেল। সেই ভদ্রলোকটী আসিয়া কুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কোনও ব্যারাম নাই, অথচ কুকুরটা মরিয়া গেল। আমি তাহার মৃত্যুর সময় লিখিয়া রাখিয়াছি।" ভদ্রলোকটী দেখিলেন, যে সময়ে তিনি বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কুকুরটী ঠিক সেই দিন সেই সময়ে মারা গিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সকল স্বপ্নই যে মিথ্যা নহে, এটি তাহার একটী নিদর্শন।

এক সময় কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন আর কোন ব্রাহ্মসমাজ ছিল না। সেই সময় কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া এক বাসায় থাকিতেন।

তন্মধ্যে কেহ কেহ পতিতা নারীদিগের উদ্ধারকল্পে তাহাদের বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিতেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ঐরূপ কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "যদি পতিতা ভগিনীগণের উদ্ধারের চেষ্টা করা অন্যায় হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজ কি জন্য?" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, কোনরূপ চেষ্টা করা মন্দ নয়; কিন্তু অধিক মেশামেশী করা ভাল নয়।" তাঁহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষে ঐ কার্য্যে তাঁহাদের পতন হয়। শেষে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। পরমহংস-দেবের কথা উল্লেখ করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিতেন, "আমি" দুই প্রকার—কাঁচা 'আমি' ও পাকা 'আমি'। কাঁচা 'আমি' দর্প-অহঙ্কার-পূর্ণ, পাকা 'আমি' কোমল ও নিরভিমান। কাঁচা 'আমি' লইয়া অভিমান করিতে গেলেই 'অতি-দর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ' ইত্যাদি বাক্যানুসারে নিরয়গামী হইতে হয়।

গোস্বামী মহাশয়ের পিতা ৺আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে ভাবাবেশে এমনই হুঙ্কার করিতেন যে, দূরস্থিত লোকেরা তাহা শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইতেন।

গোঁসাই একবার ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করিতে তমলুক অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তথায় একটি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গোঁসাই তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল বিবৃত করিলে তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার এরূপ মতিচ্ছন্ন হইল কেন? তোমার বাড়ী কোথায়?" গোঁসাই বলিলেন, "আমার বাড়ী শান্তিপুর।" সেই ব্রাহ্মণটি ইহা শুনিয়া বলিলেন, মহাশয়, শান্তিপুরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়াছি, তথায় এক গোস্বামি-পাদ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে চক্ষের জলে ভাসিতে থাকেন। ভাগ-বতের পাতা চক্ষের জলে ভিজিয়া যায়, পরে উহা রৌদ্রে দিয়া শুথাইয়া লন।

তাঁহার এমনই ভাবাবেশ হয় যে, রোমকূপ দিয়া মাঝে মাঝে রক্তোদ্গম হয়। রোমগুলি যেন শিমূলের কাঁটার মত দাঁড়াইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে "হরেকৃষ্ণ," "রাধাশ্যাম" "রাধাপ্যারী" বলিয়া প্রেমোন্মত্তভাবে এমনই উচ্চস্বরে হুঙ্কার করেন যে, দূরস্থ লোকেরা তাহা শুনিয়া চমকিয়া উঠে।

সেই ব্রাহ্মণের এই সকল কথা শুনিয়া গোঁসাই বলিলেন, তিনিই আমার পিতা। ব্রাহ্মণ গোঁসাইর হাত দেখিতে চাহিলেন। জ্যোতিষবিদ্যায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যে সময়ে যেস্থানে আপনার জন্ম হইবার কথা ছিল, তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি।" গোঁসাই বলিলেন, "হাঁ, আমার জন্মকালে পুলিশ আসিয়া আমার মাতুলালয় ঘেরাও করে এবং মাতাঠাকুরাণী আমাকে কচুবনে প্রসব করেন।"

এক সময়ে গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা বাছুড়বাগানে রাখাল বাবুর বাসায় অবস্থিতিসময় কোন্নগরনিবাসী পরলোকগত শিবচন্দ্র দেবের কন্যা, কলিকাতা শঙ্কর ঘোষ লেন নিবাসী উকিল উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পত্নী অত্যন্ত শোকাতুরা হইয়া একদিন গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে তথায় আগমন করেন।

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তাঁহার পিতা শিবচন্দ্র দেবের বিলক্ষণ হৃদ্যতা ছিল। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয় ছিল। তখন গোস্বামী মহাশয়ের এ বেশ ছিল না। তিনি এখন তাঁহাকে গৈরিকপরা জটাধারী বেশে দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনিই কি আমার নিকটে ভিক্ষা চাহিয়া আনিয়াছেন? তখনও আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি—যিনি আমার নিকট হইতে ভিক্ষা আনিয়াছেন, তিনি ত আপনিই।"

ইহা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "আমি ত আসনেই থাকি—কোথাও যাই না।" তাহা শুনিয়া উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"মা—আমাকে সত্য

করিয়া বলিতে হইবে—আমাকে তাড়াবেন না।” তখন তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ জানিয়া গোঁসাই বলিলেন—“হাঁ, তুমি শোকে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছ দেখিয়া গিয়াছিলাম।” গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

শ্যামবাজারে অধর বাবু নামে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অনুগত শিষ্য থাকিতেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন—জাতিতে স্বর্ণবণিক। পরমহংসদেবকে তাঁহার বাটীতে আহ্বান করায় তিনি তথায় গমন করেন। পরমহংসদেবের কথা মত আমাকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী মহাশয়ও তথায় গিয়াছিলেন। আমরা তিন জন ভিন্ন এক ঘরে আহার করিতে বসিলাম। আহারের সময় পরমহংসদেব ও গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে গোস্বামী মহাশয় অতি কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে পরমহংসদেবের নিকটে হাত পাতিয়া প্রসাদান্নগ্রহণের জন্য ইচ্ছা জানাইলেন। তিনি খাওয়া বন্ধ করিয়া হাত উঠাইয়া রহিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি নিজের হাত দিয়া লও।” গোস্বামী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন, “দিন না, দিন না,” তখন তিনি নিজ হস্তে উহা তাঁহার হস্ত স্পর্শ কয়িয়া প্রদান করিলেন। তিনি তাহা পাইয়া আগ্রহের সহিত ভোজন করিলেন। তৎকালে আমি ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আহারান্তে পরমহংসদেবের নিকট বিদায় লইয়া আমরা তথা হইতে বাসায় আসিলাম।

একদিন গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পরমহংসদেবের বিগ্রহাদির চিত্রপট যে ভাবশুদ্ধ প্রায়ই হয় না এই সব কথা হইতে থাকে। পরমহংসদেব গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এড়েদহের মন্দিরের বারান্দায় মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের চিত্রপট দেখিয়াছ কি?” গোস্বামী মহাশয় তাহা দেখেন নাই বলিলে পরমহংসদেব বলিলেন, “ঐ চিত্রপট অতি ভাবশুদ্ধ অঙ্কিত হইয়াছে, তুমি তাহা দেখিয়া আসিও।” গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, “আপনি সঙ্গে

করিয়া লইয়া গেলে হইতে পারে," পরমহংসদেব দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সেইদিন গোস্বামী মহাশয়ের দাদা ৺কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী ও আমরা অনেকে সঙ্গে ছিলাম। নৌকাযোগে সকলে এড়েদহে উপস্থিত হইলাম। সেই সময় মন্দিরের কপাট বন্ধ করিয়া সেবকগণ চলিয়া গিয়াছিল। তখন গোঁসাই মহাপ্রভুর জনৈক ভক্ত গদাধর দাসের সমাধিস্থান দেখিতে গেলেন। তাহা দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে আসিয়া বিগ্রহের আঙ্গিনায় পশ্চিমদিকের একটি কোঠায় বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার ভাববিহ্বলতা দেখিয়া পরমহংসদেব গান করিতে লাগিলেন। চৈতন্য হইলে দুইজনে বারান্দায় পূর্ব্বোক্ত চিত্রপট দেখিতে লাগিলেন। কপাট বন্ধ ছিল। হঠাৎ কপাট খুলিয়া গেল। সঙ্গিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কপাট খুলিয়াছে? উভয়েই কোন কথা না বলিয়া পরস্পরের দিকে চাহিলেন। সঙ্গিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মন্দিরের যে আর এক দরজায় তালা বন্ধ ছিল, তাহা দেখিতে গেলেন এবং যাইয়া দেখিলেন ঐ কপাট পূর্ব্ববৎ বন্ধ রহিয়াছে। এই ঘটনার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিগ্রহের সেবকগণ আসিলেন এবং পরমহংসদেব ও গোস্বামী মহাশয়কে প্রসাদী মালা আনিয়া দিলেনন। তৎপর আমরা দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলাম।

এক সময় আমি গোস্বামী মহাশয়ের সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার নানাবিধ ধর্ম্মকথার আলোচনা হইল। ইত্যবসরে পরমহংসদেবের নিকট কলেজের ও ব্রাহ্মসমাজের যুবকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিল। পরমহংসদেব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কয়টা পাশ? বিবাহ করিয়াছ কি?" ইত্যাদি। উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বাপ্ রে বাপ্ একটা পাশ (বন্ধন) হইলেই অস্থির। তোমাদের কাহারও দুইটা পাশ,

কাহারও তিনটা, কাহারও চারিটা, ইহা কাটিয়া উঠা কি সহজ ব্যাপার? বিদ্যাশিক্ষা করা; আবার পাশ কি? ও যে বিদ্যালয় অবিদ্যা, তাই পাশ হইয়াছে। যাও এখন সংসার কর গিয়ে। যে সকল বাসনা কামনা আছে নিবৃত্তি কর, পরে ধর্ম্মের উপদেশ শুনিতে চাহিও। এখন ধর্ম্মের কথা শুনিয়া কিছুই লাভ হইবে না।" তাহা শুনিয়া যুবকগণ বলিল, "কেন মহাশয়! শাস্ত্রে আছে 'যুবৈব ধর্ম্মশীলঃস্যাৎ;' "হাঁ, তাহা আছে বটে, তাহার বিধানও আছে, একালে তাহা তোমাদের উপযোগী নহে। তখন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করা হইত। তৎপর আপন আপন অধিকার বুঝিয়া কেহ বা সংসারে, কেহ বা অন্য আশ্রমে প্রবেশ করিত।" "তবে কি মহাশয়, আমাদের ধর্ম্ম হইবে না?" "বাপুহে, তোমার একপোয়া দুধে তিন পোয়া জল, কে এখন এত খড় কাঠ পোড়াইয়া জল মারিবে? যাও কেশব সেনের নিকট যাও, সেখানে গড্ডালিকাপ্রবাহ, অধিকার অনধিকারের কোন বিচার নাই। এখানে উপদেশ লইতে গেলে যাহা বলা হইবে, তাহা করিতে পারিবে কি? মিছে গোল করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

অপর একদিন গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমি দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছিলাম। সেদিন বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সে দিন নানা প্রসঙ্গের পর পরমহংসদেব বলিলেন :—

মানুষ চারি প্রকার—বদ্ধ, মুমুক্ষু, সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। ধর্ম্মের কথা ও উপদেশ বদ্ধজীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। বদ্ধমানুষ এককাণে শুনে, অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তাহাদের হৃদয়ে উহার ছাপ পড়ে না। মুমুক্ষুজীব মুক্তি ইচ্ছা করে, তাহাদের হৃদয়ে কতকটা ছাপ পড়ে। সাধনসিদ্ধ জীব প্রাণপণ করিয়া লাগিয়া যায়। কোন বাধাবিঘ্ন তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে না। ইহাদের হৃদয়েই উপদেশের যথার্থ

ছাপ পড়িয়া থাকে—যেমন কাহারও ফটো। নিত্যসিদ্ধ জীব জাহাজের মত। সংসারে থাকিয়া জীবের হিতার্থী হইয়া নিজের জীবনে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া সংসারে থাকিয়া কিরূপে ধর্ম্মলাভ করা যায় তাহাই শিক্ষা ও উপদেশ দ্বারা দেখাইয়া যান। ইঁহাদের সঙ্গে যাঁহারা একবার বাঁধা পড়েন, তাঁহারা গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারেন—যেমন গাধাবোট একবার শিকল দ্বারা জাহাজের সঙ্গে বাঁধা পড়িলে গম্যস্থানে যাইতে পারে। গাধাবোটে কলকাটি কিছুই থাকে না। কর্ম্মবিপাকে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কদাচ বিফল-মনোরথ হইবেন না। সেকরাকে গহনা গড়িতে সোণা দিলে কি করিয়া সোণা উপযুক্ত করিতে হয় তাহা সেকরাই বেশ জানে। যতক্ষণ না ঠিক হয় ততক্ষণ সেকরা সোণাকে পোড়াইয়া ও পিটিয়া ঠিক করিয়া লয়। ব্রজ-লীলাতে গোপীদের যে পর্য্যন্ত অনিত্যবিষয়ে আসক্তি ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা রাসে স্থান পান নাই। যখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে নানা অবস্থায় ফেলিয়া নিখুঁত করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা ভগবানের সহিত মিশিয়া রাস করিতে অধিকারিণী হইলেন।

গোস্বামী মহাশয় ভক্তসঙ্গ করিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। যেখানে তাঁহার প্রিয়তম শ্রীভগবানের প্রসঙ্গ ও গুণবর্ণনা হয় জানিতে পারিতেন, একেবারে নিরভিমান হইয়া তথায় গমন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন এবং পরমানন্দ লাভ করিতেন। উপরিলিখিত ঘটনাগুলি তাঁহার ভক্তসঙ্গলাভে একান্ত অনুরক্তির পরিচায়ক।

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কলিকাতা হইতে একবার আমি শান্তিপুরে যাই। তখন তিনি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারনিবাসে থাকিতেন। আমরা শান্তিপুরে পৌঁছিয়া একদিন তাঁহার সঙ্গে শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর সাধনের স্থান, শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী বাব্‌লা গমন করি;

আমাদের সঙ্গে যোগীন গোঁসাইও ছিলেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া তথাকার সেবায়েত বাবাজীর সহিত অনেক কথা-বার্ত্তার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আমরা তথা হইতে আসিতেছিলাম। শুনিতে পাইলাম, শান্তিপুরের রাস্তা দিয়া একদল কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছে। আমরা তখন বাব্‌লার এ পারে আমবাগানের নিকটে গিয়াছি। তথা হইতে গোস্বামী মহাশয় কীর্ত্তন এবং খোলের শব্দ শুনিয়া একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে তথায় যাইবার জন্য ছুটিলেন। সঙ্গে যোগীন গোঁসাই ও আমি তাঁহার পিছনে ছুটিলাম। তিনি দূরে গিয়া কীর্ত্তনের দল ধরিতে পারিলেন, তখন সেস্থানে কিছুকাল দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' করিয়া উঠিলেন। তাহারাও তথায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় কীর্ত্তনে কিছুকাল নৃত্য করিলেন।

তৎপর তাঁহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে এক ঠাকুরবাড়ী প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইও গেলেন। তথায় যাইয়া তিনি কীর্ত্তনে খুব উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি ঠাকুর দেখিব, ঠাকুর প্রণাম করিব। তখন বাড়ীর কর্ত্তা, সেই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সম্মুখের সকল লোক সরাইয়া দিয়া নিজে পাখা হাতে করিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বাতাস করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় বিহ্বল অবস্থায় ঠাকুরের দিকে পা দিয়া মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া তথাকার সকলে আশ্চর্য্য মনে করিলেন। গোস্বামী মহাশয় প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি ঠাকুর দেখিয়াছি।" তখনও তাঁহার ভাবের নেশার ঘোর ভাঙ্গে নাই। তৎপর আমরা বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম।

—:*:—

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(২)

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় একটী ঘটনা এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—এক সময় আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের পূর্ব্বদিকের বাটীতে সস্ত্রীক বাস করিতাম। সেই সময় আমি বসন্তরোগে আক্রান্ত হই। আক্রমণের কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রিতে যন্ত্রণা এরূপ অসহ্য হইল যে, উঠা, বসা বা শয়ন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। কোনরূপে শয়ন করিলেও বালিসে মাথা রাখিতে পারিতেছিলাম না, কেবল ছট ফট করিতেছিলাম। আমি মসারির ভিতরে ছিলাম এবং আমার স্ত্রী কিঞ্চিৎ দূরে শয়ন করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস আমি জাগিয়াই ছিলাম ; এমন সময় দেখিতে পাইলাম একটী স্ত্রীলোক আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন, তিনি একখানি রাঙাপেড়ে কাপড় পরিধান করিয়াছিলেন। আমার স্ত্রী যেদিকে শয়ন করিয়াছিলেন স্ত্রীলোকটী তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া আমার মসারির ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং আমার গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, বাল্যকালে তোমার টিকা দিবার সময় বসন্ত হইয়াছিল, তাহাতে তোমার মা শীতলাকে পাঠা দিবেন বলিয়া মানসিক করিয়াছিলেন। তুমি পাঠা দিয়া শীতলার পূজা দাও। মানসিকের কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, মা, তুমি ত জান আমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করি (আমি তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাস করিতাম) তাহাতে পাঠাবলি দেওয়া আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ; এরূপ কার্য্য আমি কিরূপে করিব ? তাহাতে তিনি বলিলেন, যদি তুমি তাহা না করিতে পার, তবে এক বৎসরের মধ্যে ৫০৲ টাকা দরিদ্র রোগীর সেবার জন্য দান কর। ইহাতে আমি স্বীকৃত হইলাম, তিনি ইহার পরই অন্তর্দ্ধান

করিলেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয় এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার সেই দুঃসহ যন্ত্রণা কোথায় চলিয়া গেল! মনে হইতে লাগিল যেন এরূপ আরামে কখনও শয়ন করি নাই। বালিশে মাথা ঘসিয়া ঘসিয়া দেখিলাম যন্ত্রণার লেশমাত্র নাই। ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল, দান আর করা হইল না। এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইল। যখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তখন আমার দীক্ষা হয় নাই। গোস্বামী প্রভু যখন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিতেন, আমি সেই সময় দীক্ষা পাইলাম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভুর নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলাম, আমি মনে করি ৫০৲ টাকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলে অধিক উপকার হইবে, আবার কখন মনে করি কোন হাঁসপাতালে টাকা জমা দিলেও চলিতে পারে। তিনি বলিলেন, শীতলা মা স্বয়ং আপনাকে কৃপা করিয়াছেন। টাকা দিলে হইবে না; আপনার মা পাঠা মানসিক করিয়াছিলেন। আপনি পাঠা দিয়া শীতলা মার পূজা দিন। শীতলা অতি প্রত্যক্ষ দেবতা। ইহার পর তাঁহার কথামত আমি পাঠা দিয়া শীতলা মার পূজা দিলাম।

শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর দেহান্তের পর যখন গোস্বামী মহাশয় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে থাকিতেন, সেই সময় তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী একদিন তাঁহাকে বলিলেন, বিজয়, তুমি আবার বিবাহ কর। তাহাতে তিনি বলিলেন, মা, আমার স্ত্রী ত আছেন, আবার বিবাহ করিব কেন? মাতা বলিলেন, তিনি ত মারা গিয়াছেন। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, না, তিনি আছেন, আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। ইহা শুনিয়া মাতা নিরস্ত হইলেন।

এক সময় মনোরঞ্জন বাবু ঢাকা নারায়ণগঞ্জে সস্ত্রীক বাস করিতেন। তিনি একদিন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আগমন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট তাঁহার

পত্নী শ্রীমতী মনোরমার সাধনের অবস্থাসম্বন্ধে বলিলেন যে, তিনি একাসনে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ১৮।২০ ঘণ্টা বসিয়া থাকেন। পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে আমি তাঁহার অবস্থাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমি আবার তোমাকে কি বলিব? এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, তাঁহাকে এই বিষয় লইয়া বিরক্ত করিও না। ইহা নামানন্দের অবস্থা; ইহাঁর এখনও আস্তিক্য-বুদ্ধি হয় নাই। ইহাও নিরাপদ্ অবস্থা নহে, ইহা হইতেও সাধকের পতনের সম্ভাবনা আছে।

৺ চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় এক সময় ঢাকা মুনসীগঞ্জে মুন্‌সেফ্ ছিলেন। তিনি একদিন গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পেণ্ডারিয়া আশ্রমে আগমন করেন। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হয়। উত্তরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র মান্য করিয়া চলিলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে। চণ্ডীবাবু বলিলেন আমরা ত তাহা গ্রহণ করিয়াছি। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, একটী শ্লোকের তিন চরণ স্বীয় মতের সঙ্গে মিলিলে গ্রহণ করিবেন, আর এক চরণ ছাড়িয়া দিবেন, এরূপ গ্রহণ করিলে চলিবে না, সমস্তই মানিয়া চলিতে হইবে।

এক সময় গোস্বামী মহাশয় প্রচারার্থে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি অঞ্চলে গিয়াছিলেন; সঙ্গে কেদার পণ্ডিত মহাশয়ও ছিলেন। প্রচারকার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহারা যখন গাড়ী করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে বেলা অধিক হওয়ায় একস্থানে রন্ধন করিলেন। পরে গোস্বামী মহাশয়কে তিনটী পাত্রে পরিবেশন করিতে দেখিয়া কেদার পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা ত দুইজন, তিন পাত্রে পরিবেশন করিলেন কেন? গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, গাড়োয়ান খাবে না? অবশ্য গাড়োয়ানকে খাইতে

দিবার কথা ছিল না। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে প্রশস্ত হৃদয়ের গভীর সহানুভূতির প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এক সময়ে ঢাকা হইতে গোয়ালন্দের ষ্টীমারে কলিকাতা যাইবার সময় কাপ্তেন সাহেব গোস্বামী মহাশয়কে আসনে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেত্তা দারু পিয়া, কেত্তা চরস পিয়া, কেত্তা গাঁজা পিয়া? কোন উত্তর না পাইয়া একবার বলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আসিয়া ঐরূপ বলিল। তখন তিনি চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া তাহার কথার উত্তরে বলিলেন, "হাম্ ও সব কুছ পিয়া নেহি। তোমারা লর্ড জিসাস্ ক্রাইষ্ট যো দারু পিয়া, হাম ও দারু পিয়া।" তখন কাপ্তেন সাহেব তাঁহাকে টুপি নামাইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে লিখিয়াছেন,—

"একদিন মাঘ মাসের সকালবেলা আমি গঙ্গাস্নান করিয়া একখানি কাঁথা গায়ে দিয়া হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে যাইয়া গোঁসাইকে প্রণাম করিলাম। তিনি বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার গায়ে কাঁথা দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন ;—কেন বেণী! তোমার লুই কি শীতবস্ত্র (অর্থাৎ গরম গায়ের কাপড়) নাই? আমি বলিলাম, আছে। তাহাতে তিনি বলিলেন, আজ এত শীত, কাঁথা গায়ে দিয়াছ কেন? যাও, যাও, গরম কাপড় গায়ে দাও! ও সব কৃচ্ছ্রসাধন তোমাদের প্রয়োজন নাই। তোমরা যে ভাবে লালিত পালিত, সেই ভাবেই চলিবে। হিন্দুস্থানী সাধু, যাঁহারা শীতে অভ্যস্ত এবং দারিদ্র্যবশতঃ ভাল শয্যা বা বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন না, তাঁহারা কৃচ্ছ্র-সাধন করিলে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে না, তোমাদের চট্ করিয়া ব্যারাম হইয়া পড়িবে। এই দেখ না—আমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ও শরীরের দিকে দৃষ্টি না রাখায় যাবজ্জীবন এই হার্ট ডিজিজে ভুগিতেছি।"

১৮০৪ শকের ১১ই মাঘের কলিকাতা ব্রাহ্মোৎসবের ঘটনা এইরূপ বর্ণিত আছে।

অদ্য মাঘোৎসবের দিন। রজনী প্রভাত না হইতে উপাসনালয়ের সন্নিকটে সংগীতের ধ্বনি উঠিয়াছে। স্বদেশস্থ বিদেশস্থ অনেকগুলি বন্ধু খোল করতাল সহযোগে নামসংকীর্ত্তন করিয়া পল্লীকে জাগ্রত করিতেছেন। রজনীর অন্ধকার যতক্ষণ রহিল, ততক্ষণ তাঁহারা উপাসনামন্দিরের চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ও দিকে নবোদিত অরুণকিরণের সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনালয়ের আসন সকল উপাসকবৃন্দে পূর্ণ হইতে লাগিল। সংকীর্ত্তনকারী দল গান করিতে করিতে উপাসনালয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ৭টা পর্য্যন্ত সংগীত করিলেন। ৭টার সময় শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তিনি উদ্বোধন হইতে উপাসনা শেষ পর্য্যন্ত ভক্তিভাবে অধীর হইয়া কি বলিলেন তাহার কিছুই স্থিরতা থাকিল না। উপাসনা করিতে করিতে ও ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে নিজ প্রাণের নিগূঢ় কথা সকল বলিতে বলিতে বার বার তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার উপদেশের স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

ভ্রাতৃগণ, আর এক বৎসর পরে আপনাদের সহিত উৎসবক্ষেত্রে একত্র হইয়া মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিব কি না জানি না; শরীর নিতান্ত জীর্ণ ও অবসন্ন। অদ্য আমার কতগুলি গূঢ় কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। আমি মনের কথা বলিবার লোক না পাইয়া বড় ক্লেশে দিন কাটাই। আমার ধর্ম্মবন্ধু যিনি ছিলেন (৺ অঘোর নাথ গুপ্ত), তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তৎপরে আমি আর ধর্ম্মবন্ধু পাই নাই এবং অন্তরের সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিবার লোকও পাই নাই। আজ কতকগুলি কথা আপনাদের নিকট ভাঙ্গিয়া বলিব। প্রথম কথা এই যে, আপনার জীবনকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ;

আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, দারুণ শত্রু অহঙ্কারের জন্যই আমার সর্ব্বনাশ হয়। প্রভু আমাকে একটু কৃপা করিলেন, আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আমাকে একটুকু প্রেমবারি বর্ষণ করিলেন, আমার কঠিন হৃদয় একটু আর্দ্র হইল। আমি এমনি হতভাগ্য, আমি সেই স্বর্গের বস্তুটুকু পাইয়া মনে করিলাম ইহা আমারই গুণে, আমারই সাধনের বলে হইল। অমনি চাহিয়া দেখি আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; মরুভূমির ন্যায়, শ্মশানের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। প্রভু কৃপা করিয়া পাপীর মন পরিবর্ত্তিত করিলেন, তাহার চক্ষুঃ খুলিয়া দিলেন, তাহাকে মুক্তির জন্য লালায়িত করিলেন। আমি ভাবিলাম আমারই কথাতে এরূপ হইল। এই বলিয়া আত্মগরিমাতে স্ফীত হইতে লাগিলাম; অমনি দর্পহারী ভগবান আমার হস্তের বল কাড়িয়া লইলেন। আমি আপনাদিগকে সরলপ্রাণে বলিতেছি, আমি আপনাদিগকে হৃদয় খুলিয়া বলিতেছি, আমি এইরূপ পাষণ্ড নরাধম। আমি কতবার প্রভুর গৌরব হরণ করিয়াছি; সেই জন্য আমার এই দুরবস্থা। আমি আজ বড় ক্লেশে আপনাদের দ্বারে আসিয়াছি; আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার এই দুর্গতি দূর হয়। আর একটী কথা এই আমি দেখিয়াছি, যে দিন দিনান্তে অন্ততঃ একবার প্রভুকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া একটী প্রণাম করিতে পারি, সে দিন আমার ভাল যায়। তিনি শব্দ নন, অক্ষর নন, পুস্তকের ভাষা নন, তিনি মানুষের মনের ভাব নন, তিনি প্রত্যক্ষ জাগ্রত দেবতা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া আরাধনা করিতে পারিলে হৃদয় মন পবিত্র হয়। আমি অবিশ্বাসী, ঘোর পাতকী আমি, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পূজা করিতে পারি না। একটী বালক যদি নিকটে থাকে, আমি বুঝিতে পারি যে কে একজন নিকটে আছে; কিন্তু আমি কেন বুঝিতে পারি না যে, সেই সত্যস্বরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা আমার নিকট আছেন! আমি এই ঘোর অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব? আমি আপনাদের চরণে পড়িয়া বলিতেছি আপনারা

সকলে মিলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ; আমি বিশ্বাস করি আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করিলে আমার দুর্গতি দূর হইবে।

১৮০৬ শক আষাঢ় মাসে (৩০শে মে, শুক্রবার) গোস্বামী মহাশয় বাঁশ-বাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এই ঃ—

একদিন পুষ্পোদ্যানে বসিয়া পরমেশ্বরের সৃষ্টিকৌশল চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি পড়িল। বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে মনে হইল যে, বৃক্ষের সহিত আমাদের জীবনের ঠিক সাদৃশ্য আছে। যে প্রকারের সাহায্য পাইয়া বৃক্ষ বর্দ্ধিত ও ফল ফুলে সুশোভিত হয়, আমাদের জীবনও সেইরূপ সাহায্য পাইলে সুন্দর হয়। দেখিতে পাই বৃক্ষের মূল দৃঢ়রূপে মৃত্তিকাতে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং তাহার রস গ্রহণ করিয়া বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে ; সূর্য্যের উত্তাপ পাইয়া সে বর্দ্ধিত হইতেছে, বায়ু তাহাকে সাহায্য করিতেছে। বায়ুহিল্লোলে তাহার পত্র পুষ্প দুলিতেছে এবং বৃক্ষ সেই বায়ু গ্রহণ করিয়া সজীব থাকিতেছে। আবার প্রশস্ত আকাশক্ষেত্র তাহার সাহায্য করিতেছে, নতুবা ছায়াযুক্ত স্থানে কোন বৃক্ষের নীচে আর একটী বৃক্ষ রাখিলে তাহা বৃদ্ধি পায় না। এইরূপে যতই ভাবি, ততই দেখি যে, মানুষের জীবনের সহিত বৃক্ষের সাদৃশ্য আছে। আমাদের এই যে শরীর, ইহা আমি নহে। এই নশ্বর দেহকে আমি বোধ করাই সাংসারিকতা। আমাদের এই শরীরের জন্য কত আয়োজন করি। এই শরীরকে নশ্বর মনে না করাই সাংসারিকতা। শরীর আমি নহি ; শরীর আমার ঘর, আমি জীবাত্মা ; আমি জ্ঞান, আমি প্রেম, আমি ইচ্ছা এই তিনের সংযোগে আমি। আমার সঙ্গে বৃক্ষের তুলনা, শরীরের সঙ্গে নয়, জীবাত্মার সঙ্গে তুলনা। আমি যে বৃক্ষ, আমার ভূমি কোথায়? যে রসে জীবিত থাকিব সেই রস কোথায়? শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণার অর্থ কি? ঘন ও তরল পদার্থের

অভাবের নামই ক্ষুধা তৃষ্ণা। ইহার নিবারণের জন্যই আহার। আমি যে জীবাত্মা, আমার যাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হইবে তাহা কোথায়? আমি যেরূপ নিরাকার, আমার আহারও সেইরূপ নিরাকার। আমার মূল সেই পরমেশ্বরের রসাস্বাদনের জন্য তাহাতেই নিহিত থাকিবে। উপাসনা আর কিছুই নহে। যেরূপ বৃক্ষের মধ্যে মৃত্তিকার রস প্রবেশ করে, সেইরূপ যখন পরমেশ্বরের পবিত্র শক্তিরস আমার মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই জীবন্ত উপাসনা হয়। আমার ভূমি সেই প্রেমরস, আধার প্রেমময়। রসের ন্যায় আবার উত্তাপ আবশ্যক; বিশ্বাসরূপ সত্যসূর্য্য হইতে উত্তাপ পাইয়া সর্ব্বদা উত্তপ্ত থাকিতে হইবে। সেইরূপ আবার কৃপাবায়ু আবশ্যক। আবার কোন পরিমিত বস্তু অথবা মানুষের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে আমার আত্মা দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে।

এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। আমার প্রকৃত উপাসনা হইল কিনা, পরমেশ্বরের রসে প্রাণ ডুবাইতে পারিলাম কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। যদি আমি প্রকৃত উপাসনা করিতে পারি, তবে তাঁহার কথা শুনিলেই আমার প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। যেখানেই তাঁহার নাম শুনিব, অমনি আমার প্রাণ গলিয়া যাইবে। তাঁহার নাম যেই করুক না কেন, আমার পিতার নাম করিতেছে, এই বলিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাহা শুনিব। তখন রসেতে যত ডুবিতে থাকিব, ততই ডুবিতে ইচ্ছা হইবে। আর দেখিব আমি সেই সত্যসূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত হই কি না। আমি যদি বিশ্বাস করিতে পারি যে, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, তবে কি আর আমি এখন পাপ করিতে পারি? তবে আমি আর কোন স্থানকেই নির্জ্জন মনে করিব না। সর্ব্বত্রই তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া কৃতার্থ হইব। ঈশ্বরে যিনি বিশ্বাস করিতে পারেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। কাহাকেও ছোট মনে করেন না, সকলের মধ্যেই প্রভুকে দেখিয়া সুখী হন। এইরূপে যদি বিশ্বাস করিতে

পারি, তবেই বুঝিব সেই সূর্য্যের উত্তাপ আমি পাইয়াছি ; নতুবা যদি একদিন সামাজিক উপাসনায় সংকীর্ত্তনে খুব নৃত্য করি, অথবা দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলি, তাহাতেই উপাসনা হইবে না। যদি তাঁহাকে নির্জ্জনে সজনে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ উপলব্ধি না করি, যদি সমস্ত প্রাণি-জগতে জড় জগতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারি, তবে তাঁহাকে পাওয়া হয় না। ঝড় বৃষ্টিতেও বৃক্ষ যেরূপ কোন চিন্তা করে না, সেইরূপ তাঁহাকে যে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে, নানা বিপদ আপদেও তাহার মন স্থির থাকে। বিপদ আপদেও যিনি বলিতে পারেন, "প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক", তিনিই যথার্থ সাধক। আবার বৃক্ষ যেরূপ ফলভরে নত হয় এবং প্রাণিগণ এই ফল আহার করে, সেইরূপ যাঁহার জীবনে যথার্থ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তিনিও এইরূপ নত হন এবং তাঁহার নিকট যিনিই ধর্ম্ম চান, তিনিই পান।

বারদীর মহাত্মা লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আরও দুই একটী ঘটনা বিবৃত হইতেছে। তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন দেশকে ও কোন বংশকে পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি অসংশয়রূপে নির্ণীত হয় নাই। কিংবদন্তী আছে তিনি এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন। "চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বারাসত মহকুমায় চব্বিশ চাকলা গ্রামে ঘোষাল বংশে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম রাম-নারায়ণ ঘোষাল, মাতার নাম যমুনা। ১১৪৮ সনে একাদশবর্ষ বয়সে আমার উপবীত হয়, তৎপরে আমি গৃহত্যাগ করি। সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ"। দেহত্যাগের এক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ঘোষালবংশীয় অভ্যাগতকে দেখিয়া নাকি বলিয়াছিলেন "আমার একটী জাতি আসিল।" মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বলিয়াছিলেন "আমার একটী জাতির প্রয়োজন।" মৃত্যুদিন সেই ঘোষাল নাকি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আবার ইহা মনে করিবারও কারণ পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি শান্তিপুরের

ব্রজনাথ গোস্বামী। গোস্বামী মহাশয়ের প্রপিতামহের দুইটী সহোদর ছিলেন; উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্রজনাথ অল্প বয়সে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন। গোস্বামিপরিবার লোকনাথকে দর্শন করিতে গেলে, তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিলেন "গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া এখন আবার কেন মোহে ফেলিতে আসিস্? এখনও আমার দেহে রক্ত চলিতেছে।" শান্তিপুরের নানা কথা বলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন "দেখিও,—বংশে যেন কালি দিও না, অদ্বৈতের নামে কলঙ্ক আনিও না।" শান্তিপুরের জটে গোঁসাই (ব্রজনাথ) নামক সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, এখন জ'টের জটা কাটা গিয়াছে। গোঁসাইজীকে তিনি জীবনকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেন ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক দিন এরূপ বলিয়াছিলেন, "আমি জীবনকৃষ্ণের পিতামহকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম; আমার গৃহত্যাগের সময় জীবনের পিতার জন্ম হয় নাই।" গোঁসাইজীর নিকট তিনি যে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বনে শান্তিপুরের গোস্বামি-বংশের ইতিহাস ও বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ইহা উপলব্ধ হয়, গোঁসাইজীর খুল্ল প্রপিতামহ ব্রজনাথ গোস্বামী এবং লোকনাথ ব্রহ্মচারী একই ব্যক্তি।

প্রসিদ্ধি আছে সার্দ্ধশতাব্দীরও অধিককালব্যাপী দীর্ঘ জীবনে লোকনাথ নানা দেশ পর্য্যটন, সংস্কৃতপারশ্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং নানাবিধ যোগক্রম-অবলম্বনে পার্থিব অপার্থিব নানাবিধ বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, পদব্রজে দুইবার মক্কা গিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে এমন তীর্থস্থান আছে কি না সন্দেহ যাহা তিনি দর্শন করেন নাই। ২৮ বৎসরের অধিক হইল একটী মোড়ান যষ্টি হস্তে ও খড়ম পায়ে লোকনাথ নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন বিখ্যাত নাগপরিবারের নিবাসস্থান বারদীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নাগবাবুদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বারদীতে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি এক কর্ম্মকারবাড়ীতে স্থান লইয়া

অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, কিন্তু অকিঞ্চন লোকনাথ এত লোককে আহারাদিপ্রদানে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন যে, তাহা একটী বিস্ময়ের কারণ হইল। অবশেষে বর্ত্তমান স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে দর্শন করিয়াই তাঁহার ঐশ্বর্য্য জানিতে পারিলেন এবং এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বারদীতে লুকাইয়া আছেন বলিয়া প্রচার করিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সীতানাথ সাহা বিনা চিকিৎসায় অসাধ্য বাতব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রভাব আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি গোঁসাইজীকে অত্যন্ত আদর করিতেন এবং বলিতেন, আমার জীবনকৃষ্ণ অতি উত্তম পাত্র, তবে জাহাজখানি পরিবাররূপ ন্যাংবোট্ ঠেলিয়া চলিতে পারিলেই হয়। গোঁসাই কখন তথায় গমন করিলে লোকনাথ নাগবাবুদের বলিতেন "তোরা খোল করতাল লইয়া যা, আমার গৌরাঙ্গ পাড়ায় নাম বিলাইতে চলিল।" আখড়ার মোহন্ত আসিলে তাঁহাকে বলিতেন "তোর মহাপ্রভু কথা কহে না, আমার মহাপ্রভু কথা কহে।" মোহন্ত বলিলেন, "ভক্তের সঙ্গে কহে," লোকনাথ বলিলেন "আমার গৌরাঙ্গের ভক্তাভক্ত ভেদ নাই।" প্রিয় জীবনকৃষ্ণের আগমন হইতে লোকনাথের আশ্রম একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান ও আরামক্ষেত্র হইয়া উঠিল। জীবনকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে লোকনাথ অনেকবার দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। "গোঁসাই ভাল লোক বলিয়া শুনিতে পাই, তিনি ভাল লোক না হইলে আমার প্রাণই বা টানিবেন কেন? তিনি নিজে যদি আসিয়া আমাকে দেখা না দেন, তবে আমাকেই ঢাকা যাইতে হইবে। হাটিতে পারিব না, নৌকা করিয়া যাইব।" ইহা শুনিয়া গোঁসাই তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন, নানাদেশ পর্যাটন করিয়া পর্ব্বতে গহ্বরে অন্বেষণ করিয়াও যাহা লাভ করা যায় না, এইরূপ একটী রত্ন বারদীতে পড়িয়া আছে। লোকমুখে বিবরণ শুনিয়া তিনি

ভাবিয়াছিলেন, লোকনাথ একজন ধার্ম্মিক লোক, তাদৃশ জ্ঞানী ও শক্তিশালী না'ও হইতে পারেন ; কিন্তু প্রথম দর্শনেই লোকনাথের অলৌকিক মহিমা ও প্রদীপ্ত আর্যজ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। গোঁসাইজীর প্রতি তাঁহার শুদ্ধ বাৎসল্যভাব ছিল। গোঁসাই সঙ্কীর্ত্তনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে লোকনাথ চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। জীবনকৃষ্ণকে বলিলেন "তুই আসিয়া আমার স্থান অধিকার কর্। বৃদ্ধ শরীরে ত কতবার যৌবন সঞ্চার করিলাম। এখন আমাকে বিদায় দে।" জীবনকৃষ্ণ অতি বিনীতভাবে বলিলেন "আপনার স্থান অধিকার করিতে পারি আমার সাধ্য কি ? যদি সে যোগ্যতা, সে অধিকার প্রদান করেন, তবে পারি।" গোঁসাইজী একবার পীড়িত হইয়া নৌকাযোগে সপরিবারে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বারদী আসিয়া উপস্থিত হইলে লোকনাথ বলিলেন, "তোমার ভোগ আমিই ভুগি।" গোঁসাই বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু আমি নিজের ভোগ দ্বারা আপনার দেহ ক্লিষ্ট করিতে পারি না।" লোকনাথ বলিলেন, "বোঝারু যখন বোঝা চাহিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে বোঝা বহিতে তাহার ক্লেশবোধ নাই।" সস্নেহে বলিলেন, "আর ভোগই যদি ভুগিবে, তবে বাবুটীর মত সপরিবারে লাল ডিঙ্গিতে চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাও কেন ?" দ্বারভাঙ্গায় যখন উৎকট রোগে জীবনকৃষ্ণের জীবনসংশয় উপস্থিত হয়, তখন "ভয় কি ? সে মরুক না, আমিই ত আছি" বলিয়া তিনি শিষ্যদিগের ভাব পরীক্ষা করিলেন ; আবার পাঁচ মিনিট কাল নিশ্চল অবস্থায় থাকিয়া এই দ্ব্যর্থ-ঘটিত বাক্য বলিলেন, "আমি ত জীবনকে ঘরে দেখিলাম না।" অবশেষে বলিয়াছিলেন, "মঙ্গলবারের মধ্যে টেলিগ্রাম আসিলেই জানিলে রক্ষা।" মঙ্গলবার টেলিগ্রাম আসিল, উপশম হইতেছে, বিপদের অবস্থা উত্তীর্ণ। শুনা গিয়াছে লোকনাথের দেহে কিছুদিনের জন্য জ্বর ও কফের সঞ্চার হইয়াছিল। জীবনকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন "তুইত ঘরে ছিলি না।"

তিনি বলিলেন, "সত্য কথা।" লোকনাথ পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "তুই আমার কাছে থাক্, আর দেশে দেশে ঘুরিয়া কাজ নাই। এই বেটীরা তোর সঙ্গে সঙ্গে আসে কেন? একলা আসিস্, তোকে রাত্রে একদিন আমার কাছে রাখিব। এত দিনে প্রকৃত গুরু পাইলি। ঠিক্ ত?" গোঁসাই বলিলেন "গুরু বই কি? গুরু বই কি? যেমন গাছ গুরু, আকাশ গুরু। আসল গুরু ত একজন আছেনই।" লোকনাথ বলিলেন, "জবাব হইয়াছে।" জীবনকৃষ্ণকে ডাকিয়া আহার করাইলেন, তদীয় পত্নীকে বলিলেন, "বহু দিন মা ছাড়িয়া আসিয়াছি; আয় ত মা, মায়ে পোয়ে আহার করি। ধর আমাকে দে। পিঠে কিল দে, আর বল লক্ষ্মীছাড়া ছেলে; মার।" গোস্বামি-পত্নী পা টিপিতে বসিলেন, উরু ধরিলেন। লোকনাথ বলিলেন, 'টিপ্ টিপ্।'

এবারে গোস্বামী প্রভুর এখানে আসিবার পূর্ব্বেই লোকনাথ বলিয়াছিলেন, "সারি সারি নৌকা আসিয়া লোকনাথের ঘাটে বাঁধা।" পরে তাহা হইতে জীবনকৃষ্ণ অবতরণ করিয়া লোকনাথের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিন চারি দিনের জন্য মহোৎসবে নামসঙ্কীর্ত্তন ও লোকসমাগমে আশ্রম ও গ্রাম আনন্দময় হইল। গোস্বামিপত্নী নানাবিধ উপহার হস্তে উপস্থিত। তাঁহার সাধ লোকনাথকে গরদ পরাইবেন। লোকনাথ বলিলেন "এখানে গরদের আদর নাই, কেন পয়সা ফেলিস্?" ছুরিকাদ্বারা দুই খণ্ড করিয়া একাংশ পরিধান করিলেন, অবশিষ্ট অংশ দান করিয়া ফেলিলেন। তদীয় গাত্রপূত উত্তরীয় জীবনকৃষ্ণ ও তৎপরিবারকর্ত্তৃক সাদরে রক্ষাকবচের ন্যায় গৃহীত হইল। গোস্বামিপুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার দণ্ডটী আত্মসাৎ করিলেন। বস্তুতঃ ইহাঁদিগের সহিত লোকনাথ যে আলাপাদি করিলেন, তাহা হইতে ইহাঁদের মনে এই ধ্রুব বিশ্বাস হইল, তিনি চব্বিশ চাকলা গ্রামের ঘোষাল বংশোদ্ভব না হইয়া শান্তিপুরের অদ্বৈতসন্তান ব্রজনাথ গোস্বামী।

———০———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(৩)

গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ফৈজাবাদের এসিষ্টণ্ট্ সার্জ্জন্ ডাক্তার ৺হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

দীক্ষার পর ঠাকুরের নিকট বসিয়া ভাবিতেছি, যাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে থাকেন, তাঁহারাই ধন্য। কোথায় আমরা বিদেশে পড়িয়া আছি—আমাদিগকে হয়ত স্মরণই থাকিবে না। কিছুক্ষণ পরই ঠাকুর আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ডিম তিন উপায়ে ফোটে। তা দেওয়ায়, দৃষ্টিতে, আর চিন্তায়। ইহা বলিয়া পণ্ডিত (৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের দিকে চাহিয়া নীরব হইলেন।

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, বুঝিলেন কি? আমি তাঁর দিকে চাহিলাম। তিনি ঠাকুরের কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, হাঁস, কুক্কুট ইত্যাদি পাখী ডিমের উপর বসিয়া ডিমে তা দিয়া ডিম ফুটায়। নৈলে ফোটে না। কাক প্রভৃতি পাখী ডিমের উপর বসিয়া তা দেয় না, দৃষ্টিশক্তিতে ডিম ফুটায়। এক ডালে বাসায় ডিম আছে, অন্য ডালে কাক বসিয়া ডিমের দিকে দৃষ্টি দিয়া আছে, তাতেই ডিম ফোটে। অপর এক জাতীয় ডিম ফোটে চিন্তায়। কচ্ছপ মাটীর ভিতর ডিম পাড়িয়া মাটী চাপা দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তার চিন্তা থাকে ডিমের প্রতি। ঐ চিন্তায় ডিম ফুটিয়া উঠে। সদ্গুরুতে এই তিন শক্তিই বর্ত্তমান। শিষ্যদের কল্যাণের জন্য এই ত্রিবধ শক্তিই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।"

আমি বুঝিলাম, দূরে পড়িয়া থাকিলেও ঠাকুরের চিন্তায় আমার কল্যাণ হইবে।

আমি যখন জোয়ালাপুরে কাজ করি, তখন সাধনপ্রণালী কিছু পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হইল এবং তদনুযায়ী দু তিন দিন না চলিতেই স্বপ্ন দেখিলাম, শ্রীধর গিয়া উপস্থিত। আসুন, ডাক্তার বাবু, একটী নূতন গান শুনিবেন? বলিতেই তাঁর সঙ্গেই এদিক ওদিক ঘুরিয়া একটী দালানে উপস্থিত হইয়া দেখি, পণ্ডিত মহাশয় বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি আসন করিয়া বসিলাম। তিনি ধ্যানস্থ হইলেন; আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া সাবেক প্রণালী ধরিয়া ধ্যানস্থ হইতেই বুঝিলাম, যে পন্থা আমি ধরিয়াছিলাম, তাহা ঠিক নয়। কোথায় আমি জোয়ালাপুরে সাধন-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিলাম, তিনি দূর হইতে তাহা অনুভব করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়া আসিলেন। এইরূপ ঠাকুর বর্ত্তমানে বস্তিতে এক ঘটনা হয়; ঠাকুর স্বপ্নে দর্শন দিয়া শাসন করিয়া আসেন।

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"সে আজ অনেক দিনের কথা, যখন আমি গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে পড়িতাম, এবং ঝামাপুকুরে আমাদের বাসা ছিল, সেই সময় মেছুয়া বাজার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নিকট শ্রীযুক্ত অভয় নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসায় আসিয়া গোঁসাই কিছু দিন অবস্থিতি করেন। আমাদের বাসার নিকট বলিয়া, অভয় বাবুর বাড়ী আমার সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। এই সময় একদিন আমাদের স্কুল বন্ধ হওয়ায় বাড়ী যাইবার চেষ্টায় আছি, এমন সময় অভয়বাবুদের বাড়ী আসিয়া শুনিলাম শীঘ্রই গোঁসাইও সকলকে লইয়া ঢাকা যাইবেন। ইহা শুনিয়া আমি কাকাদের অনুমতি লইলাম আমিও এই সঙ্গেই ঢাকা যাইতে পারি। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা সকলে শিয়ালদা ষ্টেসনে যাইয়া গাড়ীতে

উঠিলাম। এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। গোঁসাইর সঙ্গে ঢাকার যাত্রী অনেক লোক থাকিলেও জানি না কেন তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার (রিজার্ভ) কম্পাটমেণ্টে সঙ্গে করিয়া নিলেন। আমরা যথাসময়ে আনন্দ করিতে করিতে গোয়ালন্দ আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে ষ্টীমারে আসিয়া আমার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। শুধু তাই নয়, বাস্তবিকই আমি একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলাম; তাহা এই ভাবিয়া যে, আমার সঙ্গে যে ডবল টিনের একটী পোটমেণ্ট আছে, ইহা ধোলাইগঞ্জ ষ্টেসন হইতে কেমন করিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে লইয়া যাইব! সেখানে যে মোটেই কুলি পাওয়া যায় না। গুরুভাইরা সকলে দেখিলাম ষ্টীমারে গোঁসাইকে মধ্যে বসাইয়া নানা প্রকার সৎপ্রসঙ্গে আনন্দে সময়টী কাটাইয়া দিতেছেন, কিন্তু আমি সেই রসে প্রায় বঞ্চিত হইয়াই আছি। আমি এই আনন্দ ভোগ করিবার চেষ্টায় মাঝে মধ্যে উহাদের মধ্যে যাইয়া বসিতেছিলাম· কিন্তু তাহা বৃথা হইতেছিল। বাধ্য হইয়া আবার মধ্যে মধ্যে উঠিয়া পড়িতেছিলাম, এবং এদিক্ ওদিক একটু বেড়াইয়া লইতেছিলাম। কিছুতেই আমার যেন শান্তি ছিল না। যতই আমাদের ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জের নিকট আসিতে লাগিল, আমার চিন্তা যেন ক্রমেই তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশ্য আমার মনের এই কথা তখন কাহাকেও জানিতে দিতেছিলাম না। উহা আমার মনে মনেই ছিল। যাহা হউক আমরা ষ্টীমার হইতে নামিয়া আবার যখন গাড়ীতে উঠিলাম, এখানেও দেখিলাম ঠাকুর আমাকে তাঁহার কম্পাটমেণ্টে, কাছেই বসাইলেন। কিন্তু তা' হলে কি হয়, ব্যাধি যে আমাকে ছাড়ে না; আমার ভাবনা এই যে "ধোলাই গঞ্জ" এল ব'লে। ক্রমশঃ আমার ভাবনা চরমে উঠিয়া আমাকে নিরাশ করিয়া ফেলিল। পরে নিরুপায় হইয়া অগত্যা স্থির করিলাম, আমি আর এখানে নামিব না, একেবারে ঢাকা ষ্টেসনে নামিয়া পরে হয় হাটিয়া ও মুটে লইয়া, নতুবা গাড়ী করিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিব।

গোঁসাই যাইতেছেন যান, গুরুভাইরাও চলিয়া যাউন, আমি বসিয়া থাকিব। এই সব চিন্তা করিতে করিতেই আমাদের গাড়ী ধোলাইগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুভাইরা যাঁহারা অন্য গাড়ীতে ছিলেন, তাঁহারা সকলে ব্যস্ত ভাবে আসিয়া গোঁসাইকে বলিলেন, শীঘ্র নামুন, আমরা ধোলাইগঞ্জে আসিয়াছি, গাড়ী এখানে বেশী ক্ষণ থাকিবে না। গোঁসাই বেঞ্চের তলায় আমার বাক্সটী সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, ঐ বাক্সটী আগে নামাও, আমি নামিতেছি। বেগতিক দেখিয়া গুরুভাইরা চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনি নামুন, আমরা এখনি বাক্স নামাইতেছি। গোঁসাই নামিয়া গেলেন। পরে দেখিলাম একদল গুরুভাই আমার বাক্স লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন, সকলেই যেন বাক্সটী লইতে ব্যস্ত; উঁহাদের মধ্যে গ্রাজুয়েট্‌ মুটেরও অভাব ছিল না। লজ্জায় বাধ্য হইয়া আমি বাক্সটীর এক দিক ধরিয়া অপর সকলকে অতি কষ্টে বাধা দিয়া, মাত্র একজনের সাহায্যে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে লইয়া আসিলাম।

উপরের ঘটনা ছোটখাট হইলেও এসব সাধারণ ঘটনাতেও ঠাকুর আমাদের অন্তরে অসাধারণ দয়ার স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।”

আমার নিজের জীবনের একটী ঘটনা এখানে বিবৃত করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না :—

আমি কর্ম্মবিপাকে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলাম। পিতামাতার পুণ্যবলে গোস্বামী মহাশয়কে সদ্‌গুরু লাভ করিলাম। ৺গয়াধামে অনেকবার গিয়াছি, বিষ্ণুপাদও দর্শন করিয়াছি; কিন্তু পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিতে সুমতি হয় নাই। বহুদিন পরে একবার আমি কিছু দিন কাশীতে অবস্থিতি করিয়া তথা হইতে জনৈক বন্ধুর সহিত গয়াধামে গমন করিয়া এক বন্ধুর বাসায় থাকি। তখন পিণ্ডদান করিতে একান্ত ইচ্ছা হইল, কিন্তু অর্থাভাবে সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ হইল। বন্ধুটি আমার অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন, “আপনি

তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। যৎ কিঞ্চিৎ দিলেই কাজ হইবে।" তিনি সব ঠিক করিয়া দিলেন। আমি ও আমার সঙ্গী বন্ধু উভয়েই প্রথমতঃ ফল্গুগয়ায়, তৎপরে অশ্বত্থবৃক্ষতলে, মাতৃ-ষোড়শী স্থানে এবং পরে বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলাম। ব্রাহ্মণ আমাদিগকে মন্ত্র পড়াইলেন, তজ্জন্য ও দ্রব্যাদির মূল্যস্বরূপ কিছু দিলাম।

তৎপর সুফল ও অনুজ্ঞা পাইবার জন্য গয়ালি পাণ্ডাঠাকুরের নিকট গেলাম। পাণ্ডাঠাকুর আমাদিগকে সুফলমন্ত্র পাঠ করাইলেন ও অনুজ্ঞা দিলেন। এমন সময় আমি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইয়া গয়ালি পাণ্ডা ঠাকুরকে প্রণামী দিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তথা হইতে বিদায় হইলাম। রাস্তায় বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, আপনি ঐরূপভাবে কাঁদিলেন কেন?" প্রাণের কথা গোপন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "কান্না পাইল, তাই কাঁদিলাম।" গোস্বামী মহাশয় এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন কোন দর্শনের পর সে কথা কাহাকেও না বলিতে পারিলেই ভাল। কেননা তাহা কাহাকেও বলিলে হয়ত তিনি সহানুভূতি না দেখাইয়া প্রতিবাদ বা সমালোচনা করিবেন। তাহাতে বিপরীত ফল হওয়া অসম্ভব নহে।

গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতিক্রমে এক সময়ে আমি দুই জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাসাগর ও যাজপুর হইয়া ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম। যাজপুরে নামিয়া বৈতরণীকৃত্য করিবার সময়েও ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। এই সকল ঘটনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মনুষ্যের পরলোকে বিশ্বাস অমূলক নহে।

একদিন ঢাকা প্রচারনিবাসে অবস্থিতিকালে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার থাকিবার ঘরের সংলগ্ন পশ্চিমের কোঠার ভিতর দিয়া পায়খানায় যাইবার জন্য

চলিলেন। গিয়া দেখেন ঐ কোঠার কবাট বন্ধ। তখন তিনি কুতুবুড়ীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সময় পরিবারস্থ সকলে অন্য ঘরে ছিলেন। তাঁহাদের কেহই ডাক শুনিতে পান নাই। তখন একটি ছোট মেয়ে কবাট খুলিয়া দিয়া অদৃশ্য হইলেন।

ঠাকুর ভাবে অবশ হইয়া পড়িলেন। পরে শৌচান্তে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেহ আসিয়াছিলেন কি না। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা কিছুই জানি না।" কুতুবুড়ী বলিল "বাবা, আমিত যাই নাই।" তখন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "মা, এই বুঝি রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধা," এই বলিয়া ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

গোস্বামী মহাশয়কে এক সময় তাঁহার গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ত যথেচ্ছাচার করিয়াছ, এমন কি করিয়াছিলে যাহাতে সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিলে?'

গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্ম থাকাকালেও প্রতিদিনই নানা বিঘ্নের মধ্যেও গায়ত্রী জপ করিতাম। বোধ হয় সেই কারণেই সদ্গুরুর কৃপালাভ করিয়াছি।"

ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজে মাঘোৎসবের সময় গোস্বামী মহাশয়কে ব্রাহ্মেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশ্বাস হয় কিরূপে?" তিনি বলিলেন, "বিশ্বাসীর পদানত হইলে বিশ্বাসলাভ হইয়া থাকে।" ডাক্তার পি, কে, রায় বলিলেন,—মানুষের পদানত কেন হইব? গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, যাহার বিশ্বাসের প্রয়োজন, তাহাকে মানুষের পদানত হইতেই হইবে।

ঠাকুর একবার হিমালয়ে যান। তথায় একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি বরফাবৃত ছিলেন; বরফ গলিয়া প্রকাশিত হইলে ঠাকুরকে খুব আদর করিলেন। ইনি বঙ্গদেশবাসী গোস্বামিসন্তান। ঠাকুরকে

দেখিয়া বলিলেন—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "এদেশ যে দিন দিন সর্ব্ববিষয়ে হীন হইয়া যাইতেছে, কি উপায়ে ইহার কল্যাণ হয়? তাহাতে তিনি বলিলেন, কেবল বীর্য্যরক্ষা করিলে ও সত্য কথা বলিলেই এ দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হইবে।

এক দিন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয় ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আপনি একদিন একটি গোলাপ ফুল হাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন আমি আপনাকে দেখি। এই বলিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা যদি ছেলেদের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া নিজ জীবনের সমস্ত বিষয় বলিবার সুবিধা দেন ও বীর্য্যরক্ষা করিতে এবং সত্য কথা বলিতে অভ্যাস করাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাহাদের ও দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয়।

এক সময় গোঁসাইজী শ্রীমুখে এই বিবরণ বলিয়াছিলেন,—

আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলাম, তখন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি। কোন এক ব্যক্তি গয়ায় গিয়াছেন। তাঁহার পিতা একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন, বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, তবে আমায় একটি পিণ্ড দিয়ে যাও। তিনি ওসব বিশ্বাস করেন না, তাই উহাতে আস্থা দিলেন না। আরও একদিন ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, আপনার পিণ্ড দেওয়াই উচিত। আপনি ত আপনার বিশ্বাস মত দিবেন না, তাঁহার বিশ্বাস মত দিবেন। তিনি তাহাতেও সম্মত হইলেন না। পরে একদিন শুয়ে আছেন, একটু তন্দ্রার মত হয়েছে, তখন তাঁহার পিতা যোড় হাত করে বল্লেন, বাপু, আমাকে একটি পিণ্ড দিয়ে দেও। আমি বলিলাম, যদি অগত্যা আপনি না দেন, তবে আপনার প্রতিনিধি করে একজনকে দিয়ে পিণ্ড দিন। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন।

একজনকে প্রতিনিধি করে দেওয়া হইল। তিনি দেখিতে গেলেন, আমিও গেলাম। যখন পিণ্ড দেওয়া হইল, তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যখন পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন আপনি কাঁদিলেন কেন? তিনি বলিলেন, "যখন পিণ্ড দেওয়া হইল, আমি দেখিলাম পিতৃদেব অঞ্জলি পাতিয়া পিণ্ড গ্রহণ করিলেন। এরূপ জানিলে আমি নিজেই দিতাম।" ইহা কি যুক্তি তর্ক দিয়া বুঝিবার সাধ্য আছে?

প্রথম খণ্ডে যে এইরূপ একটী ঘটনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সংশোধিত ও বিস্তৃত ঘটনা উপরে প্রদত্ত হইল।

মা ঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর দৈববাণী শুনিলেন, "যাও গেণ্ডারিয়া গিয়া ইঁহার অস্থি সমাধিস্থ কর, ও নামব্রহ্মের মন্দির করিয়া উহার প্রতিষ্ঠা কর। এই কলিকালে আচার্য্যপূজা ও ব্রহ্মনাম ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যোগজীবন গোস্বামী একদিন কুটীরে ঠাকুরকে বলিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা একজন শুদ্ধাচারী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্দিরের পূজা অর্চ্চনা চালান। ঠাকুর বলিলেন, "ওরূপভাব মনে আসিতে দিও না। ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত জল তুলসী দিয়াও যদি কেহ পূজা করে, তাও যথেষ্ট। প্রণালীগত পূজাতে কৃপালাভ করা সম্ভব নয়, এ স্থানের পূজা ঐরূপ হইবে না।"

মেদিনীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"১। আমার একটী আত্মীয় ও ৺দেবেন্দ্রনাথ সামন্তের প্রমুখাৎ গোস্বামী মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইল ; একদিন রাত্রি প্রায় ৩টার সময় নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম একটি সৌম্যমূর্ত্তি জটাজূটধারী সন্ন্যাসী আমার শিয়রে বসিয়া বলিলেন, এই মন্ত্র জপ কর। মন্ত্রের অক্ষরগুলি যেন জ্বলন্ত অক্ষরে আমার সম্মুখে দেখিতে

পাইলাম। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম, আর ঘুম হইল না। দীক্ষা লইবার জন্য কাতর হইয়া পরদিনই মেদিনীপুর হইতে ষ্টিমারে কলিকাতায় যাইলাম। একটি বন্ধুর নিকট গোস্বামী মহাশয়ের ঠিকানা জানিয়া, আমি বেলা ৪টার সময় সুকিয়াষ্ট্রীটে ৺রাখাল বাবুর বাড়ীতে যাইয়া গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। সেদিন কোন কারণ জন্য আমার দীক্ষার কথা তাঁহাকে বলিতে পারিলাম না। পরদিন খুব ভোরে উঠিয়াই গোস্বামী মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন গাড়ি বারেন্দায় বেড়াইতেছিলেন; আমি তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম, তিনি আমার পানে তাকাইলেন; আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম মেদিনীপুর হইতে আপনার কাছে দীক্ষা লইবার জন্য আসিয়াছি; আমাকে কৃপা করুন। তিনি আমার প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, তুমি সাধন পাইবে, আগামী পরশ্ব বুধবার গঙ্গাস্নান করিয়া বেলা ৯টার সময় আসিবে। শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া একটু পরে আমি চলিয়া আসিলাম। বুধবার দিন গঙ্গাস্নান করিয়া যথাসময়ে পূর্ব্বোক্ত বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বাড়ীর ভিতরে ছিলেন; কিছুক্ষণ পরে তাঁর একজন শিষ্য আসিয়া আমাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর যে ঘরে গোস্বামী প্রভু বসিয়াছিলেন, তথায় লইয়া গেলেন। তাঁহার সম্মুখে একখানি কম্বলের আসন পাতা ছিল, আমাকে তাহাতে বসিতে বলিলেন এবং ঘরের সব জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ধূপ ধূনা দিলেন। আমি প্রভুর সম্মুখে বসিয়া তাঁহার মুখের অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া এক দৃষ্টে তাঁর পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি তখন চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, একটু পরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া, জয় গুরু, জয় গুরু, বলিয়া আমার পানে চাহিলেন। আমার ভিতর তাড়িৎ শক্তি বোধ করিতে লাগিলাম, যেমন ইলেকৃট্রিকবাটারি হাতে করিয়া ধরিলে হয়, তদ্রূপ বোধ হইতে লাগিল; আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে

লাগিল। গোঁসাইজী বারম্বার, গুরুদেব কৃপা কর, বলিতে লাগিলেন ও আমাকে স্থির হও, স্থির হও, বলিলেন।

আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। অনন্তর প্রভু আমাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। মন্ত্র শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। মনে হইল উক্তরূপ জটাজূটধারী সৌম্যমূর্ত্তিই আমাকে পূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় ঐ মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছিলেন; গুরুদেবও সেই মন্ত্র দান করিলেন। আনন্দে আমার চক্ষে জল আসিল। আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলাম এবং দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

"২। শ্রীগুরুদেব সাধনের যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন আমি নাম জপ নিয়ম মত করিতেছি, কিন্তু প্রাণায়াম আমার ঠিক মত করা হইতেছেনা; এ বিষয় ঠাকুরকে জানাইব এবং তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করিব এই অভিপ্রায়ে আমি কলিকাতায় আসিলাম। শ্রীগুরুদেব তখন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে থাকেন; আমি সেই বাসায় যাইলাম। উপরে উঠিয়া শ্রীযুক্ত যোগজীবন দাদার সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া গোঁসাইজীর ঘরে যাইলাম। তিনি তখন ধ্যানাবস্থায় ছিলেন, আমি সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। একটু পরেই প্রভু বলিলেন, উপদেশ মত নামজপেই সব হয়, ভক্তি-পূর্ব্বক নাম করা চাই। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, আমার মনের ভাব বুঝিয়াই ঐ কথা বলিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি চাহিলেন, আমি ঠাকুরকে বলিলাম, আপনার উপদেশ মত নাম জপ করি, কিন্তু প্রাণায়াম আমার ঠিক মত হই-তেছে না, বাসায় গোলমাল, নির্জ্জন স্থানের অভাব। তিনি বলিলেন অপর লোকের নিকট প্রাণায়াম করা নিষেধ, ভোর রাত্রে বা যে সময় সুবিধা হইবে করিও। নাম জপ যত করিতে পার চেষ্টা করিবে। এই কথা বলিয়াই পুনরায় চক্ষুঃ মুদ্রিত করিলেন, আমি প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বারেন্দায় যোগজীবন দাদার কাছে আসিয়া বসিলাম, কয়েকজন গুরু ভ্রাতাও সেখানে

বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। খানিক পরে একজন গুরুভ্রাতা মিষ্টান্ন প্রসাদ আনিয়া সকলকে দিলেন। সন্ধ্যায় সময় খুব সংকীর্ত্তন হইল, গোঁসাইজীর মধুর নৃত্য ও ভাব দেখিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম।

"৩। ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনার্থে আমি কলিকাতায় আসিলাম। গোঁসাইজী তখন হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে থাকেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আমার পিসতুত ভ্রাতার বাসায় আমার জিনিষ পত্র রাখিয়া আমি তাঁহার নিকট যাইলাম। পথে গিয়া মনে হইল ভায়াকে বলিয়া আসিলাম না, অনেক দিন প্রভুর প্রসাদ খাই নাই, সেই খানে আহার করিলেই ভাল হইবে। এখন বেলা প্রায় ১০টা, আমি ঠাকুরের নিকট গিয়া তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বসিলাম, তাঁহার সহিত দুই একটী কথা কহিয়া প্রাণাম করিয়া যোগজীবন দাদা যে ঘরে ছিলেন সেখানে যাইলাম; তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন ও কবে মেদিনীপুর হইতে আসিয়াছেন? আমি বলিলাম আজই আসিয়াছি। আমি দাদার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, একটি গুরুভ্রাতা আসিয়া বলিলেন প্রভু এখানে আপনাকে আহার করিতে বলিলেন। আমি শুনিয়া মনে মনে খুব আহ্লাদিত হইলাম। খানিক পরে আমরা সেখানে আহার করিতে যাইলাম। একটী শ্বেত পাথরের থালায় করিয়া প্রভুর প্রসাদ আনিয়া সকলকে দেওয়া হইল। আমরা সকলে আহার করিতে বসিলাম। আমি পরমানন্দে প্রসাদ পাইলাম।

বৈকালে আমি ঠাকুরের ওখানে গেলাম, তিনি তখন ছাদের উপর বসিয়াছিলেন। আমি তথায় গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম। অনেকগুলি ভদ্র লোক ও গুরুভ্রাতা তাঁহার কাছে বসিয়া উপদেশ শুনিতেছেন। গোঁসাইজী বলিলেন, সত্যপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

সত্যই ধর্ম্মের ভিত্তি।

শুক্রধারণই ব্রহ্মচর্য্য।

নামজপই শ্রেষ্ঠ সাধন।

সকলেই তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? প্রভু বলিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখা যায়। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানের দর্শন লাভ করা বড়ই কঠিন, কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায়? গোঁসাইজী বলিলেন, পাখীর ডিমে বাচ্চা নিশ্চয়ই আছে, পাখীরা ডিমে তা দিতে দিতে তবে এক দিন ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়; কিন্তু যদি ডিমে তা না দেয়, তবে ডিম পচিয়া যায়। ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন, সাধনরূপ তাপ দিতে দিতে তবে এক দিন তাঁর দর্শন-লাভ হয়; বিনা ভজন সাধনে কিছুই হয় না। পরে সন্ধ্যার সময় প্রভু নামিয়া আসিয়া তাঁহার আসনে গিয়া বসিলেন; একটু পরেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, গোঁসাইজী "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন, বলিয়া উঠিয়া দুই বাহু তুলিয়া, হরিবোল হরিবোল, বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে হরিবোল বলিয়া নাচিলাম, রাত্রি প্রায় ৮৷০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হইল।"

রাখাল বাবুর বাটীতে একদিন ব্রাহ্ম কালীনাথ বাবু গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন, মহাশয়, আমার কন্যাটী আমার অমতে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয়কে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। আমি নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দিগকে, এরূপ বিবাহ যাহাতে না হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা আমার অনুনয় ও অনুরোধ গ্রাহ্য করেন না।" তৎপর তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন, এখন আমার চাকুরী নাই। মেয়েটী বেথুন স্কুলে কাজ করিয়া যে কয়টী টাকা পায়, তাহাই এখন আমাদের উপজীবিকা। সীতানাথ বাবু দোজবর, প্রথম পক্ষের কয়েকটী কন্যা আছে, বিবাহ হইলে মেয়েটী বেথুন স্কুলে আর কাজ করিতে পারিবে না। আর সীতানাথ বাবুরও কিছু বেশী আয় নয়; সুতরাং আমরাই অধিক কষ্টে পতিত হইব।" তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "আমি ত এখন ব্রাহ্ম সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছি,

আমি আর কি করিতে পারি?" তাহাতে তিনি বলিলেন, আপনার নিকট তাঁহারা আসিলে আপনি তাঁহাদিগকে আমার এই সকল কথা বলিতে পারেন। তিনি বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু আসেন বটে, শিবনাথ বাবু আসেন না। নগেন্দ্র বাবু আসিলে তাঁহাকে আপনার কথা বলিব। তৎপর একদিন নগেন্দ্র বাবু তথায় আসিলে গোস্বামী মহাশয় ঐ সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, মনোনয়নপ্রথাই ব্রাহ্ম সমাজের বিবাহের আদর্শ। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সম্মত হইলে আমরা কি করিব? গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। তখন সে স্থানে আমি উপস্থিত ছিলাম। কন্যার পিতার কথা ও নগেন্দ্র বাবুর উত্তর শুনিয়া আমার মনে ক্লেশ হইল। আমি নগেন্দ্র বাবুকে বলিলাম, মহাশয়, আপনিও বৃদ্ধ হইলেন, আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি। ব্রাহ্ম সমাজের অভিজ্ঞতা ও বয়সের দরুন বহুদর্শিতা আমাদের উভয়েরই আছে। আপনারা যাহাকে আদর্শবিবাহ বলিয়া মনে করেন, তাহা বাস্তবিক আদর্শবিবাহ বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, বর ও কন্যার অভিভাবকগণ শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া শাস্ত্র-বিধানোক্ত সুসম্মিলনবিবাহ সংঘটন করিলে তাহা পাত্র পাত্রী উভয়কে চিরকাল ইহলোকে ও পরলোকে সুখী করিবে। আপনাদের বিধানোক্ত বিবাহে বরকন্যার সেরূপ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। পরস্পরের পরমাণু পরস্পরকে সম্মিলনের জন্য আকর্ষণ করে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। এ অবস্থায় বুদ্ধি স্থির রাখিয়া বিচার দ্বারা নিজেদের ইষ্টানিষ্ট অবধারণ করা সম্ভবপর নহে। অভিভাবকগণের সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই। ইহাই যথার্থ শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম বিবাহ। আমরা আজ কাল শাস্ত্রের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া বিদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে যাইয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি। আশু ইন্দ্রিয়সুখের বশবর্ত্তী হইয়া মনগড়া মতে ও ভাবে চলিতে গিয়া সামাজিক অবনতির পথ প্রশস্ত করিতেছি।

আমি এই সকল কথা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলায় তিনি আর কোন উত্তর না করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তৎপর কিছুকাল পরে তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলে গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন, "আপনি ত আজ নগেন্দ্র বাবুকে খুব বলিলেন।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয়, আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু বলি নাই। কালীনাথ বাবুর কথা ও নগেন্দ্র বাবুর উত্তর শুনিয়া মনে ক্লেশ হইয়াছিল, তাই কে যেন আমার মুখ দিয়া ঐ সকল কথা বলাইল। তিনি শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না।

প্রথম বারে কাকিনীয়া ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবের পর একদিন তথাকার পদ্মপুকুরের তীরে আটচালা ঘরে ব্রাহ্ম বন্ধুরা সমবেত হইয়া নানা বিষয়ে কথোপকথন করেন। কথাপ্রসঙ্গে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া গোস্বামী মহাশয় বলেন, "ঢাকাতে সে দিন সাপ্তাহিক উপাসনার দিন, বেদিতে বসিয়া উপাসনার কার্য্য করিলাম এবং অনেক প্রকার প্রাণের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে দিন ব্রহ্মদর্শনলাভ হইল না। শূন্য মনে প্রচারনিবাসে আসিয়া আহারান্তে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। সেই দিন দারোপগমনের দিন ছিল। স্ত্রীর মুখে আমার ব্রহ্মদর্শন হইল এবং আমি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম।" এই কথা বলিবার পর গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন। "ছিছি, এই সব কথা কি বলিতে আছে? এখানে অনেক ছেলে পিলে আছে।" তদুত্তরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "দারোপ-গমন মহাযজ্ঞ। যাঁহারা অপবিত্র ভাবে ইহা করেন, তাঁহারা ইহার মর্ম্ম কি বুঝিবেন? শাস্ত্রকর্ত্তারা বলিয়াছেন যে, এই কালে ভগবদারাধনা এবং পরলোকবাসী পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাতে যে কতদূর চিত্তসংযমের প্রয়োজন, তাহা যাঁহারা স্ত্রীকে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার যন্ত্রস্বরূপ মনে করেন, তাঁহারা কিরূপে বুঝিবেন? তাঁহাদের এ তথ্য বুঝিবার অধিকার নাই।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(৪)

এক সময় কোন গুরুভ্রাতা শৌচে যাইয়া হাত পা ধুইয়া কাপড় না ছাড়িয়া গোস্বামী মহাশয়ের জন্য যে জালায় জল রক্ষিত হইত, সেই জালা হইতে জল তুলিয়া লইয়াছিলেন। সেই কথা গোস্বামী মহাশয়ের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি সেই জালাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলেন; সুতরাং তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইহাতে গুরুভ্রাতাটীর অভিমানে আঘাত লাগিল। তিনি প্রায় মাসাবধি তাঁহার সহিত কথা বলিলেন না। প্রাতে গঙ্গাস্নানের পর আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখের বারাণ্ডায় যাইয়া একটী প্রণাম করিয়া আসেন। যখনই তিনি দায়ে ঠেকিয়া প্রাতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতেন, তখনই গোঁসাই হাসিতে হাসিতে বলিতেন "—মহাশয়ের জয়, আমারই ক্ষয়"।

এক সময় একটী ভদ্রলোক গোস্বামী প্রভুর নিকটে করজোড়ে বলিলেন আপনি আমাকে দয়া করিয়া আমার চিত্তটী ভাল করিয়া দিন। দেখুন আমি নিজে উপার্জ্জন করিয়া ৪।৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছি। তদ্ভিন্ন জমিদারী আছে। স্ত্রী, পুত্র কেহই আমার সঙ্গে যাবে না ইহা বুঝি, ৪০।৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও যে কিছু ক্ষতি হয় এমতও নহে। তবু দেখুন, আমার কি দুর্ভাগ্য যে, আমি পাঁচটী করিয়া টাকা আপনার সেবার জন্য দিতে পারি না। গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, এ যাত্রায় ইহা হইবে না, ইহা আপনার কর্ম্ম।

অতঃপর একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, দাদা মহাশয়, আপনারা দয়া করিয়া আমার প্রাণটা খুলিয়া দিন না? আমি তাঁহাকে বলিলাম কি

রকম? তিনি বলিলেন আমি উপার্জ্জন করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, তন্মধ্যে ৪০।৫০ হাজার টাকা গেলেও আমার কিছু আসে যায় না; কিন্তু আমি তাহার কিছুই সৎকাজে ব্যয় করিতে পারিতেছি না। আইরণ চেষ্ট হইতে একটী টাকা বাহির করিতে আমার বুক ধড়ফড় করে ও বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া যায় ও বুক ভাঙ্গিয়া যায়। আপনারা দয়া করিয়া আমার প্রাণের অবস্থা খুলিয়া দিন। আমি শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম, চাবি ত আপনারই হাতে, আপনি নিজের ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া অপরকে তাহা খুলিয়া দিতে বলেন? দেখুন, যাঁহারা অর্থকে অত্যধিক ভালবাসিয়া তাহাতে আসক্ত হন, তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। যে কৃপণ, সে সৎ অসৎ কোন কাজেই অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। আমি এ বিষয় আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। যদি আপনি আমার কথা মতে কার্য্য করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণের কপাট খুলিয়া যাইবে। তখন তিনি বলিলেন, কি পরামর্শ বলুন না। আমি বলিলাম আগে বলুন, কথামত কাজ করিবেন কি না। তিনি বলিলেন শুনিলে বলিতে পারি। আমি বলিলাম,আপনি বোধ হয় ভয় পাইয়া থাকিবেন, না জানি আমি কি বলি; কিন্তু দেখুন লম্বা চওড়া কথাইত আপনি বলিয়াছেন, আমি আপনাকে লম্বা চওড়া পরামর্শ দিতেছি না। আপনি ত প্রত্যহ আমাদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে যান। আপনি আমার পরামর্শ মতে সাত দিবস কাজ করিরা দেখুন, আপনার প্রাণ খোলে কি না? প্রথম দিন একটী টাকা ভাঙ্গাইয়া পয়সা সঙ্গে লইবেন। গঙ্গার ঘাটে যত দুঃখী দরিদ্র দেখিবেন, তাহাদিগকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিয়া কিছু কিছু দিবেন। ঘাটের ব্রাহ্মণগণকে কিছু কিছু দিবেন। পর দিবস দুই টাকা এই ভাবে দিবেন। তৎপর দিবস চার টাকা; এই ভাবে প্রত্যহ দ্বিগুণ করিয়া সাত দিন দান করুন, তৎপর আমাকে বলিবেন যে আপনার প্রাণের কি অবস্থা। কিন্তু কথাই সার হইল, কাজে কিছুই হইল না। গোস্বামী প্রভুর বাক্যই সত্য হইল।

হরিনারায়ণ বাবুর বাটীতে একদিন শ্রীযুক্ত অন্নদা বাবু ও হরিনারায়ণ বাবুর নিকট শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার মিত্র বলিয়াছিল যে, গোঁসাই রাত্রিতে নিদ্রা-যান না, সমস্ত রাত্রিই আসনে বসিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা পরীক্ষা করিবার মানসে একদিন রাত্রিতে তাঁহার নিকট উপস্থিন হন। তথায় কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দেখিলেন, আসনে বসিয়া আছেন, অথচ গোস্বামী মহাশয়ের খুব নাক ডাকিতেছে। ইহা দর্শন করিয়া তাঁহারা যে ধারণা লইয়া চলিয়া গেলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিছুকাল পরে হরিনারায়ণ বাবু একবার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া একটি বাবাজীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আগমন করেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার ইষ্ট মন্ত্র বলিয়া দিলে আশ্চর্য্য হইলেন। তৎপর গোঁসাই প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন যে, কোন সাধু সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিতে নাই। ইহাতে তাঁহার সেই নিদ্রা-পরীক্ষার কথা মনে হইল এবং ভ্রম বিদূরিত হইল।

মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন ঃ—

১। একদিন গোস্বামী মহাশয়, কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে কলিকাতার নিমতলার ঘাটের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তথায় বেড়াইতে বেড়াইতে দাহস্থলের বাহিরে দক্ষিণ দিকে যখন গেলেন, সেখানে একটী দরিদ্র দীন হীন কাঙ্গালবেশী সাধু দেখিতে পাইলেন। তাঁহার দেহ ধূলিধূসরিত, মস্তকের চুল মলিন রুক্ষ শুষ্ক ও জড়িত। পরিধানে একখানি সহস্রচ্ছিদ্র এক হাত প্রসারের বহির্ব্বাস মাত্র কোন মতে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। তিনি গঙ্গার পাড়ে বসিয়া গঙ্গামুখী হইয়া স্থিরভাবে ভজনাবস্থায় ভূমিতে আসীন ছিলেন। দেখিলে কেহ তাঁহাকে সাধু বলিয়া বুঝিতে পারে না। কত লোক চলিয়া যায়, কেহ তাঁহার দিকে লক্ষ্যও করে না। সর্ব্বজনপরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত অবস্থায় আপন মনে বসিয়া আছেন। তাঁহারও ভাব পৃথিবীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বলিয়া মনে হয়; তাঁহাকে

দেখিলে বোধ হয় যেন আপন ভাবে এক পিশাচপ্রাপ্ত ব্যক্তি বসিয়া আছে।

গোস্বামী মহাশয় ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট গেলেন। তিনি আসীনাবস্থায় গোস্বামী মহাশয়কে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই যেন তাঁহাকে বসিবার আসন দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কারণ, তিনি নিরবলম্ব ও নিঃসম্বল অবস্থায় ছিলেন। বসিতে দিবার জন্য অন্য কিছু আসন না পাইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিজ পরিধেয় সেই সহস্রচ্ছিদ্র জানুপ্রসার স্বল্পবিস্তার বহির্ব্বাস খানি অর্থাৎ ঐ ন্যাকড়াখানি খুলিয়া নিজে নগ্ন হইয়া সেই বস্ত্রখানি আসনরূপে পাতিয়া দিতে গেলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার এই আদরের দান বাক্য দ্বারা গ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি উহা পরুন—আমরা এখন অন্যত্র যাইতেছি, বসিব না।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় লইবার সময় বলিলেন,—"আপনি আপনার ভজন করুন, আমরা আপনার সময় নষ্ট করিতে চাহি না।" পরে গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আরও কিছুক্ষণ থাকিলে উহাঁর ব্যাপার অনেক রকম দেখিতে পাইতেন।" স্বর্ণনির্ম্মিত রত্নখচিত সিংহাসন দিয়াও এত মর্য্যাদা কেহ করিতে পারে না।

২। আর এক দিন গোস্বামী মহাশয় কতিপয় শিষ্য সঙ্গে করিয়া কলিকাতা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ দিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ফুট পাথের ধারে একটী পাগল বসিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিয়াই জানে এবং তাঁহার ব্যবহারও তদ্বৎ; যা তা কুড়াইয়া আহার করেন, আর কেমন কেমন ভাবে বেড়িয়া বেড়ান। গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া তিনি কিছুক্ষণ সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"আমাদের এমনি অবস্থায়, এমনি ভাবে রেখে তুমি সুখে আছ ত ?" গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে

আমি ছিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম এটি কি পাগলের উক্তি? এই কথার কি কোন তাৎপর্য্য আছে? গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "উঁহার কতকটা দৃষ্টি খুলিয়াছে, উহা পাগলামীর উক্তি নহে।"

৩। প্রয়াগধামে ১৩০০ সনের কুম্ভ মেলায় এক দিন গোস্বামী মহাশয় সাধু দর্শন করিয়া নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে আর একটী সাধু তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তিনি বিপরীত দিক হইতে গোস্বামী মহাশয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছিলেন; নিকটবর্ত্তী হইয়া যাইতে যাইতে গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিয়া গেলেন, "এমনি করিয়া কি লুকাইয়া বেড়াইতে হয়? এমনি করিয়া আত্ম-গোপন করিয়া বেড়াইতেছেন?" পরে গোস্বামী মহাশয়কে প্রশ্ন করা হইল, "উনি কি ভাবে আপনাকে একথা বলিলেন?" তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "উনি একজন জ্যোতিষী; গর্গ ঋষির মত জ্যোতিষজ্ঞ।"

শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থমণির কুঞ্জে যখন গোস্বামী মহাশয় ছিলেন, সেই সময় এক দিন একটী বাঁদরের বাচ্চা রান্নাঘরের সম্মুখের ছাদের ছাউনীর শীক গলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে চারিদিকে বানরের দল আসিয়া রাগে উৎফুল্ল হইয়া সেস্থান ঘিরিয়া ফেলিল। শীকগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার যোগাড়। বিধু বাবু যাইয়া বানরগুলিকে শীক বা দরজা ভাঙ্গায় বাধা দিতে ও দরজা খুলিয়া না দিবার জন্য দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রবেশ নিবারণ করিতে গেলেন। তখন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "বিধু, অমন করিওনা। অমন করিলে বিপরীত ফল হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজে যাইয়া বানরদের সম্মুখীন হইয়া জোড় হাত করিয়া বলিলেন, "জয় মহাবীর! জয় মহাবীর! জয় বীর হনুমান! তোমরা শান্ত হও; আমাদের কাহারও দোষ নাই, বাচ্চা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে। আমি বাচ্চাকে বাহির কয়িয়া দেওয়াইতেছি।" এই কথা বলিবামাত্র বানর-

গুলির উৎফুল্ল গাত্রলোম নমিত হইল ও তাহারা কোনরূপ উপদ্রব করিল না।

পরে বিধুবাবু কবাট খুলিয়া দিলে বাচ্চাটী বাহির হইয়া গেল। বানরগুলি পূর্ব্বে যেরূপ রাগিয়াছিল, সে অবস্থায় দরজা খুলিয়া দিলে বানরের দল ঘরে প্রবেশ করিয়া ভীষণ অত্যাচার করিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু গোস্বামী মহাশয় বিনীত বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট ও শান্ত করিয়া তবে দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিতেন— বানরেরাও কথা বুঝে ও ঠাণ্ডা হইয়া বলিলে তাহারাও কথা শুনে।

গোপীনাথের বাগে দাউজীর কুঞ্জে থাকা সময় একদিন একটী বানর তাঁহার একটী বৃদ্ধা শিষ্যার ঘটী লইয়া যায়। তাহাতে তথাকার দামোদর পূজারি আসিয়া লাঠী লইয়া তাড়া করে। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "অমন করিলে হইবে না, খাবার টাবার দেও, তবে ঘটী দিবে।" তদনুসারে খাবার দেওয়া হইল, কিন্তু ঘটীহস্তে আসিয়া খাবার লইয়া গেল, ঘটী দিয়া গেল না। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "তোমরা যে আগে লাটী লইয়া তাড়া করিয়াছ, তাই ঘটী দিল না।"

ঐ বাসায় গোস্বামী মহাশয়ের পাঠের সময় প্রত্যহ একটী বুড়া বানর তাঁহার আসনের ধারে আসিয়া বসিয়া পাঠ শুনিত। সে দিন সে পাঠ শুনিতে আসিলে গোস্বামী মহাশয় তাহাকে বলিলেন, বুড়ো! আমাদের ঘটিটী যাবে— আমারা ঘটিটী পাব না? এই কথা বলিবা মাত্র বুড়া উঠিয়া গেল এবং তাহাদের দলের মধ্যে যাইয়া ঘটিটী বিশেষ চেষ্টা করিয়া আনিয়া আস্তে আস্তে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে রাখিল।

একদিন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় বসিয়া আছি, অন্য লোক জন নাই। ঠাকুর ধ্যানস্থ হইয়াছেন। আমিও নিকটে বসিয়া একমনে সাধন করিতেছি, হঠাৎ চাহিয়া দেখি ঠাকুর আর তেমন নাই; বর্ণ কাল, চুল লম্বা;

তিনি শ্যামামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আকুলনয়নে তাকাইতেছেন। আমি এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। কিছুকাল পরে আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন 'কে বিশ্বাস মহাশয় ?'—বলিয়া নীরব হইলেন।

ঠাকুর সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় একখানা কাগজে এই অনুশাসন-বাক্য লিখিয়া তাঁহার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দেওয়াইয়াছিলেন—"এস্থানে যাঁহারা আছেন বা আসিবেন, তাঁহারা কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা করিতে পারিবেন না।" তিনি সাধন দেওয়ার সময়ে সকলকে এই উপদেশ দিতেন যে, কেহ নিজকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিবে না। মুসলমান ও খৃষ্টান-দিগের স্বকীয় ধর্ম্ম পালনে নিষেধ নাই। ঐ সঙ্গে সঙ্গে তিনি দীক্ষাকালীন যাহা বলিয়া দিতেন, তাহারও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। একজন ব্রাহ্মভাবে উপাসনা করিতেছেন, তিনি তাহাই করিবেন, উহার সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামী মহাশয় যে উপদেশ ও মন্ত্র দিতেন তাহাও পালন করিতে হইবে।

শ্রীযুত বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় সময়ে সময়ে গেণ্ডারিয়া, কলিকাতা ও পুরীক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গান কয়েকটী ঠাকুরকে শুনাইতেন ঃ—

১। যাও হে যাও আর কি সুধাও নারদ তপোধন।
সুখময় বৃন্দাবনে দেওগে নিমন্ত্রণ॥
কি ময়ূর আর কি ময়ূরী, কি ভ্রমর আর কি ভ্রমরী,
নিমন্ত্রিবে শুক শারী গোপ গোপী গোধন।
সখা বৃন্দে সখী বৃন্দে, সানন্দাদি উপানন্দে, বল আনন্দে,
কেবল আমার পিতা নন্দে মা যশোদায় বারণ॥

২। ধন্য মানি জীবন, হেরিলাম বৃন্দাবন, প্রাণে জুড়ালাম।
যোগ তত্ত্ব শিখাইতে, ব্রজে এসেছিলাম, (কৃষ্ণের আদেশে আমি ব্রজে এসেছিলাম) এবে গোপিকাকণিকাপ্রেমে মূলে বিকাইলাম।
ধন্য বৃন্দারণ্য ধন্য, ধন্য গোপীগণ, ধন্য আহিরিয়া বধূ মধুরসধাম।

৩। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন,
কবে দরশন পাব, জুড়াবে তাপিত জীবন।
ব্রহ্মার দুর্লভ আশ, খদ্যোতের অভিলাষ,
কৃপা করি পূরাও আশ, প্রভু রূপ সনাতন॥

৪। এমন দয়াল ভাই আর নাই, গৌর নিতাই দু ভাই ভিন্ন।
কলিযুগে, জীবের লেগে, হ'ল দুই ভাই অবতীর্ণ॥
বলিহারি যাইরে, নাহি জীবের ভয় আর অন্য।
শ্রীচৈতন্য কি লাবণ্য, জিনি জাম্বুনদ স্বর্ণ,
অভিন্ন চৈতন্য নিত্যানন্দরাম ধন্য,
এই যে নিমাই, ব্রজের কানাই, শচী রত্নগর্ভে রত্ন।
শ্যামরূপ ঢাকা, রাইরূপ মাখা, নয়ন বাঁকা আছে চিহ্ন।
পুষ্পবন্ত যুগে সদয়, চন্দ্র সূর্য্যে একত্রোদয়,
কিরণে সমুদয়, চিত্তশব্দ তমঃশূন্য।
আচণ্ডালে করি কোলে, অশ্রুজলে নিতাই মগ্ন।
প্রেমে নাচে, প্রেমধন যাচে, নাহি বাছে কোন বর্ণ॥

৫। জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে (শ্যাম) গৌর হয়েছে।
কারে জানি বাস্‌তো ভাল, সে মনের মতই ছিল,
তাই মন ছিল ঐ রূপের কাছে।
তারে ধর্‌বে ব'লে ঝাপ দিয়ে তায় পেলে না নদে এসেছে।
নাইকো ওর দুখের অন্ত, হয়েছে পথ ভ্রান্ত,
সদা তাই ভ্রান্ত নয়ন ঝরিতেছে;
উহার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয় নয়নে নিশানা আছে। (বাঁকা)

ও তার পায়না দেখা, তাইতে একা, দেখার জন্য কাঁদতে আছে।
কৃষ্ণকান্ত বলে, শান্তি নাই আর, যাবৎ জীবন তাবৎ আছে॥

শ্রীযুত বিধু মজুমদার মহাশয়, এই গান কয়টী ঠাকুরের নিকট বিনীত ভাবে বসিয়া সুমধুর কণ্ঠস্বরে কীর্ত্তন করিতেন; তখন প্রাণ যেন এক অপূর্ব্ব রাজ্যে প্রবেশ করিত; প্রাণে শান্তি ও আনন্দ মধুর হইতে মধুরতম হইয়া খেলিত। ঠাকুর অনেক সময়ে ইঁহাকে নিকটে বসাইয়া ইঁহার মধুর কণ্ঠের গান শ্রবণ করিতেন। ইনি কলিকাতা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসায় ও হারিশন্ রোডের বাসায় এবং পুরীধামে নীলমণি বর্ম্মণের বাসায় ঠাকুরের নিকটে চৈতন্যচরিতামৃত ও নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে এমনই ভাবে পাঠ করিতেন, শ্রোতৃগণ সকলেই নিমগ্নচিত্তে বসিয়া শ্রবণ করিতেন। তাঁহার পাঠান্তে মনে হইত যেন একটা উৎসব হইয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, 'বিধুর শুধু পাঠ নয়, যেন কীর্ত্তন করিতেছেন।"

শ্রীযুত প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয়, ঠাকুরের নিকটে প্রাতে হারিশন্ রোডের বাসায় ও পুরী ধামে নিম্নলিখিত দেবগোষ্টটী গান করিয়া ঠাকুরকে শুনাইতেন।

দেবগোষ্ঠ।

ওগো রাণি! বনেতে দেখ্‌লেম অপূর্ব্ব লীলে॥
দেখ্‌লেম দশভুজা একরমণী কানাই ভাইকে নিয়ে কোলে॥
১। কর্‌তে গোষ্ঠের খেলা কানাইর সনে সব রাখাল মিলে,
আমরা দেখে এলেম সকলে,
সিংহপৃষ্ঠে দশভুজা, ঐরাবতে এলো ইন্দ্ররাজা
সবাই করে কৃষ্ণপূজা, মা তোর কৃষ্ণ ধনের নাম ব'লে।

আমরা সকলেতে, দেখ্‌লেম স্বচক্ষুতে,
কৃষ্ণের জন্মাবধি এ চক্ষুতে দেখি নাই আর এমন লীলে॥
২। এলো আর একজন, সেই বৃষবাহন, ভস্ম মাখা গায়,
মুখে ববম্‌ ববম্‌ গাল বাজায়,
কৃষ্ণরূপ নিরখিয়ে, ধূলাতে লুণ্ঠিত হয়ে,
কর যোড়ে প্রণাম করে, মা তোর প্রাণ গোপালের রাঙ্গা পায়।
মকরবাহন, এলো আর একজন,
একজন মা তোর প্রাণ গোপালের যুগল চরণ মস্তকে ধারণ করিলে॥
৩। মা তোর কানাইকে তুই মানুষ বলিস্‌, কানাই মানুষ নয়,
বনে দেখে হয়েছি বিস্ময়,
চতুরানন হংসোপরে, কানাইর চরণ পূজা করে,
নারদ মুনি বীণাযন্ত্রে, মা তোর প্রাণগোপালের গুণ গায়, দুই বাহু তুলে,—
ও কেউ হরি ব'লে মা তোর কানাইর চরণ পূজা করে সচন্দন তুলসী দলে॥
৪। ওমা যশোদে গো, কত বল্‌ব কানাইর বিবরণ।
সেযে গোষ্ঠে যেয়ে ব'সে থাকেগো, দেবলোকে চরায় গোধন॥
একজন চতুর্ম্মুখ বটে, নিত্য এসে হংস পীঠে,
ব'সে থাকে কানাইর সম্মুখে।
সে যে কর যোড়ে স্তুতি করে রে, তা, দেবলোকে করে শ্রবণ।
একজন নারী স্বর্ণবর্ণ, কি বল্‌ব তাঁর রূপের বর্ণ,
না জানি গো তাহারি মর্ম্ম।
সে যে দশ হাতে খাওয়ায় ননী রে, ধ'রে কানাইর চাঁদ বদন॥

গোস্বামী প্রভু একদিন হরিনামের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :—
তোমাকে, আমাকে এবং এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,

আমি তাঁকে চাই, প্রাণ কাঁদে তাঁর জন্য। আমার প্রভুকে যদি কেউ ডাকে, অমনি আমার প্রাণ কেড়ে নেয়। তাঁহাকে যে যা বলিয়া ডাক, হরি, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, খোদা, আল্লা, সূর্য্য, জল, যাহাই বল না, তিনি ত সকলেরই প্রভু। তাঁহার কোন নাম নাই; ভক্তেরাই তাঁহার নামকরণ করেন। যে নামে যাহার পাপহরণ হয়, তাহাই হরিনাম। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী হরিনাম। হরি, দুর্গা, বিষ্ণু, রাম, কালী, শিব, গায়ত্রী এ সমস্তই হরিনাম।

ঠাকুর স্ত্রীলোকসম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিতে বলিতেন। প্রায়ই তিনি এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেন,

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।"

অর্থাৎ মাতা, ভগিনী এমন কি কন্যার সহিতও নির্জ্জনে একাসনে বসিবে না; কেন না, বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বান্ পুরুষকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

মাণিকতলার মাতাকে ঠাকুর মাতৃসম্বোধন করিতেন। তিনি কখনও আসিলে ঠাকুরের গৃহে ভিন্ন আসনে বসিতেন। তাঁহাকেও সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের সাক্ষাতে একদিন ঠাকুর বলিলেন, "আমি যে ঘরে থাকি, সে ঘরে স্ত্রীলোক আসা নিষেধ।"

"শাস্ত্রে যাহা নাই, তাহা সদাচার হইতে পারে না; সুতরাং কদাপি তাহা করিবে না। যদি ঐরূপ করিতে কখনও দেখ, মনে করিবে দুষ্ট লোক নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ঐরূপ করিতেছে। যদি উহা কেহ ধর্ম্ম বলে, উহা ধর্ম্ম নহে, পাপ নরক, উহা কখনই শুনিবে না। স্ত্রীলোক সর্ব্বদা পবিত্র ভাবে থাকিবে, শাস্ত্রে যাহা নাই তাহা যদি কোন মহাপুরুষেও বলেন, তাহা অগ্রাহ্য; কখনই তাহা কয়া উচিত নহে। কারণ, কখন কখন মহাপুরুষেরাও পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু লাভ করিবে তাহা 'নাম' দ্বারা; 'নামই' সাধন।

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন :—

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় প্রসন্ন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন একটি ব্রাহ্ম আসিয়া উপদেশ চান। গোঁসাইজী বলিলেন, —"ধর্ম্মপুস্তকপাঠ, ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতর জাতিকে ঘৃণা না করিয়া মান্য করা, বিশেষতঃ গুরু, বৈষ্ণব-গণকে শ্রদ্ধার সহিত সেবা করা কর্ত্তব্য।" যেই এই কথা বলা, অমনি ব্রাহ্ম ভদ্রলোক বলিলেন যে, আপনিই বলিয়াছিলেন গুরুটুরু নাই, শাস্ত্র সব মিথ্যা।" তাহাতে গোঁসাই বলিলেন, "ওহে, আমি আর এখন সেই আমি নাই। এখন বলিতেছি যে গুরুব্যতীত উদ্ধারের উপায় নাই। এই যে শাস্ত্রগ্রন্থ দেখিতেছ, ইহার একটি অক্ষরও মিথ্যা নয়, এই সকল পুস্তকের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন।"

গোস্বামী মহাশয় সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় থাকার সময় একদিন উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁহাকে বলিলেন, "সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তনাদিতে গোলমাল হইয়া থাকে, তাহা বন্ধ করিলে হয় না?" তিনি বলিলেন —"না, তাহাতে আমার কোন কষ্ট হয় না। উহাতেই আমি ভাল থাকি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(৫)

কোনও গুরুভ্রাত্রার পুত্র প্রায় ৫ বৎসর বয়সেয় সময় দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়। তাহার সে সময়ের ভাবের বিকাশ ও নৃত্য দেখিয়া অনেকেরই তাহার উপর চক্ষু পড়ে। ইহা গোস্বামী প্রভু বুঝিতে পারিয়া বালকের পিতাকে বলিলেন যে, ইহাতে বালকের অহঙ্কার জন্মিয়া অনিষ্ট করিতে পারে; সুতরাং এখন ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়াই প্রয়োজন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, যেমন আপনার ইচ্ছা অপনি তাহাই করুন। তদবধি তাহার সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল; কিন্তু গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, সময়ে পুনরায় ইহার বিকাশ হইবে।

আমরা যখন ঠাকুরের সহিত কুম্ভমেলায় ছিলাম, তখন ঠাকুর সমস্ত শিষ্যবৃন্দকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার গুরুদেব ভিক্ষা দ্বারা সাধুসেবা করিতে বলিয়াছেন। কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী ইহা শুনিয়া তাঁহার গলস্থিত সোণার হার তখনই ঐ কার্য্যে অর্পণ করেন। ঐ হারের মূল্য প্রায় তিন শত টাকা ছিল।

গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যার বিবাহ-উপলক্ষ্যে বহু লোককে মহাসমারোহে ভোজন করান হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহার করিলে পর কর্ম্মচারী ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি ৩০।৪০ জন লোক আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় নগেন্দ্র বাবু বলিলেন আমাদিগকে দৈ দাও। মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, অতি সামান্য ছোট একটা পাত্রে অল্পপরিমাণ দধি রহিয়াছে, উহাতে কিছুই হইবে না। নগেন্দ্র বাবু ঐ কথা শুনিলেন না,

গোঁসাই, দৈ খাওয়াইতে হইবে, গোঁসাই দই খাওয়াইতে হইবে, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গোঁসাই মা ঠাকুরাণীর নিকট হইতে দধির পাত্র ও খুরি লইয়া বলিলেন, আচ্ছা, দৈ খাওয়াইতেছি। মা ঠাকুরাণী বলিলেন, এতে কি করিয়া দিবে, পাগল হয়েছ? ঠাকুর দধি দিতে লাগিলেন, প্রচুর পরিমাণে দধি সকলে খাইতে লাগিল, কিন্তু কাহারও মনে এই প্রশ্ন আসিল না কোথা হইতে দধি আসিতেছে। মা ঠাকুরাণী এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দর্শন করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পর দিন নগেন্দ্র বাবুর হুঁস হইল, একি ঘটনা ঘটিয়া গেল, গোঁসাই এত অল্প দধি দ্বারা কিরূপে যথেষ্ট পরিমাণে সকলকে খাওয়াইলেন? নগেন্দ্র বাবু গোঁসাইকে বলিলেন, এ কি আশ্চর্য্য! আমাদের এ বিষয়ে হুঁসও হইল না। এ কি করিলেন? ঠাকুর বলিলেন, ভগবানের দয়া হইলে কিছুই আশ্চর্য্য নহে; দেখুন, দীনবন্ধু দাদার গল্পে সরলমতি বিশ্বাসী বালক এক ঘট দধি দিয়া শত লোককে ভোজন করাইয়াছিলেন। এই বলিয়া দীনবন্ধু দাদার গল্প করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত লিখিয়াছেন ঃ—

একদিন গুরুজীর ঘরে শুইয়া আছি, গভীর রাত্রিতে শুনিতে পাইলাম গুরুজী কি কথা বলিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একটী মৃন্ময় ভূত, অর্থাৎ যাহার দেহ মৃত্তিকাময়, সেখানে আসিয়াছিল। প্রথমে সে উপকার পাইবার জন্য, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসে, কিন্তু সেখানে আসিয়া সে স্বভাবগুণে আপন উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায় এবং অপকারের চেষ্টা করে। সে নাকি গোস্বামী মহাশয় ও শিষ্যদের সকলেরই অপকারের চেষ্টায় ছিল, কিন্তু অবশেষে গুরুজীর শক্তিতে ভীত হইয়া পলাইয়া যায়। তার পর গুরুজী বলিলেন, তোমরা শয়নকালে পণ্ডিত মহাশয়কে যে মন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া নিদ্রা যাইবে, কোন ভয় থাকিবে না।

মন্ত্র এই—

পরমাত্মা শিরঃপাতু, হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ।
কণ্ঠং পাতু জগৎপাতা, বদনং সর্ব্বদৃগ বিভুঃ॥
করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা, পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পরব্রহ্ম সনাতনম্॥

৺ শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন ঃ—

১। গুরুভাই লালের মুখে শুনিয়াছি, একবার গোঁসাই শান্তিপুরে রাসযাত্রার সময়, রাস দেখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন; "আজ চেষ্টা করিতে লাগিলাম, স্ত্রীলোকের দিকে কু-দৃষ্টিপাত করিতে পারি কিনা; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই পারিলাম না।"

২। একসময় দেখিয়াছি, গোস্বামী প্রভু ঢাকায় যে কুটীরে থাকিতেন, সেই কুটীরে কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতে পারিত না। ইদানীন্তন কোন স্ত্রীলোক প্রণাম করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। স্ত্রীলোক স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সঙ্গে একত্রে সাধন না করে, এই বিষয় নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীলোককে দীক্ষার সময়, তাহার স্বামী কি অভিভাবক বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সাধন লইতে যাইতে হইত।

৩। প্রয়াগে কোন দেবমন্দিরেও বদ্ধ কপাট আপনা আপনি খুলিয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে গুরুভাই কালীকান্ত নন্দী মহাশয় ছিলেন।

৪। একদিন গোস্বামী প্রভু বলিলেন, "ভগবান্ আমাকে সাপ ও বাঘ হইয়া দেখা দিয়াছেন। একদিন বরাহনগর হইতে কলিকাতা আসিতেছিলাম, বড় রাস্তার উপর সহরে বাঘ দেখিতে পাইলাম। আমি মনে করিলাম এ কি? পরেই বুঝিতে পারিলাম, এ সামান্য বাঘ নহে, ভগবান্ ঐরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।

হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের অসীম মহিমা। উহাতে স্নান করিয়া এক

আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যেই স্নান করিয়া উঠিলাম, অমনি দেখি গোঁসাই উপরে এক মন্দিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; দেখিতে দেখিতে তিনি অন্তর্ধান হইলেন। গোঁসাই এই সময়ে বাসায় ছিলেন এবং স্নান করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন !!



আমি দ্বারভাঙ্গায় একদিন, দর্শনের কথা ঠাকুরকে বলায়, তিনি আমাকে বলিলেন নবকুমার বাবু, "যাহা দর্শন পাইয়াছেন, তাহা কদাচ প্রকাশ করিবেন না। প্রকাশ করিলে আর বেশী দিন নয়" অর্থাৎ তিনি দেহত্যাগ করিবেন ইহাতে তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, হরিনারায়ণ বাবুদের বাড়ী যাহা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা ত বলিয়া ফেলিয়াছি। ঠাকুর বলিলেন, "যাহা করিয়াছেন, করিয়াছেন, আর প্রকাশ করিবেন না।" আমি ঠাকুরের জীবদ্দশায় এই সকল কথা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই।

মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন :—

শ্রীধর ঘোষের দেহত্যাগের দুই একদিন পূর্ব্বে, নির্জ্জনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি অকপটে যদি বল, তবে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার সাধন পাবার পর হইতে ঠাকুরের সম্বন্ধে কি কি বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছ?

শ্রীধর বলিলেন,—"আমি সাধন পাওয়ার পরই যখন ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করি, তখন মাথা তুলিয়া দেখি, তিনি ষড়্ভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। অন্য এক সময়েও তাঁহারই বিগ্রহে কৃষ্ণ বলরাম একাধারে বর্ত্তমান দর্শন পাই। সময়ান্তরে পুনরায় তাঁহাকে ষড়্ভুজবিগ্রহ দর্শন পাইয়াছিলাম।

আমি ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলাম,—সৎসঙ্গের প্রয়োজন কতদিন পর্য্যন্ত? ঠাকুর উত্তর করিলেন,—যত দিন সদ্গুরুর কৃপালাভ না হয়; তৎপরে আর প্রয়োজন নাই।

শিবরাত্রির সময় শ্রীক্ষেত্রে আসিলাম, দর্শন করিতে মন্দিরে গেলাম। দেখি, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্বেতবর্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জগন্নাথদেবকে শ্বেতবর্ণ দেখিলাম কেন? ঠাকুর বলিলেন,—"লোকনাথ ও জগন্নাথদেব যে এক, ইহাই আপনাকে দেখাইলেন।"

আমার স্ত্রী, দেশে একদিন দেখিতে পাইলেন, দালানের জানালা দিয়া এক প্রকার উজ্জ্বল সাদা আলোক বাহির হইতেছে; তার পর গোঁসাই প্রকাশ হইলেন। ঠাকুরকে তিনি কখনও দেখেন নাই, একজন সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিলেন। পরে যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন বলিলেন,—"ইনিই সেই।" আমি এ সকল শুনিয়া প্রত্যয়ের জন্ম ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন,—ঘটনা সত্য।

শান্তিপুরের বাটীতে কয়েক দিন গোঁসাইজী ভাগবত পাঠ করিয়া তাহার বাঙ্গালা অর্থ আমাকে শুনাইতেন। এক দিন আমি বলিলাম, ভাগবত আমি কিছুই শুনিনা, কেবল আপনি যে সুর করিয়া পড়েন, তাহাই আমার নিকট মিষ্ট লাগে ও তাহাতে আরাম পাই। অন্য দিনের মত এ দিনও পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ বসিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার নিদ্রা আসিল। সেই সময় অত্যন্ত গ্রীষ্ম হওয়ায় আমার শরীর ঘামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কে যেন বাতাস করিতেছে অনুভব হইল। আস্তে আস্তে চোখ খুলিয়া দেখি, গোঁসাই ভাগবত চাপা দিয়া রাখিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন। ইহা দেখিয়া পুনরায় চক্ষুঃ বুজিলাম। বাতাস করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, ভালই, কিছুক্ষণ করুন। ক্ষণেক পরে উঠিলাম।

শ্রীধর বলিয়াছেন :—

"গেণ্ডারিয়া আশ্রমে একদিন মা ঠাকুরাণীর ইচ্ছা হইল, ঠাকুরকে পূজা করিবেন। তিনি ইহা আমাকে বলিলেন। আমি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিলাম। তিনি ঠাকুরের ঘরে যাইয়া সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং

ঠাকুরের পদে পুষ্প দিয়া পূজা করিলেন। দিদি মা, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দরজার নীচের একটী ছিদ্র দিয়া উহা দর্শন করিতে লাগিলেন। পূজা শেষ হইলে ঠাকুর তাঁহার মুখ ধরিয়া আদর করিলেন। পরে দিদি মা আমাকে ডাকিলেন, আমি দেখিলাম, মা ঠাকুরাণী সাষ্টাঙ্গ হইয়া ঠাকুরের পদসমীপে পড়িয়া আছেন। তিনিও পা ছড়াইয়া তাঁহার মাথার উপর পা দিয়াছেন। উভয়েই বাহ্যচৈতন্যরহিত।”

প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গোঁসাইজী হরিদাস বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখুন, একটা বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর আছে; এক জনের হাতে চাবি, তাঁহার ইচ্ছা হইলে মূহূর্ত্তে বৎসরের আলোকিত ঘর অন্ধকার করিতে পারেন, এবং লক্ষ বৎসরের অন্ধকার ঘর আলো করিতে পারেন, ঘরের কি কোন গুণ আছে?

কলিকাতা মল্লিক পোস্তায়, যোগীন্দ্র সামন্ত মহাশয়ের বাসা হইতে নামিয়া যোগজীবন বলিলেন, ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমের কোঠা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছি, ঠাকুর স্নান করিতে যাইতেছেন। সিঁড়ির নিকট একটু দাঁড়াইয়া বলিলেন,—“ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, একটা আনন্দের স্রোত খুলিয়া দিতে পারেন; প্রারব্ধ নষ্ট করিতে কেবল একজনই (সদ্‌গুরু) পারেন।”

উকীল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রমোহন দাস লিখিয়াছেনঃ—১২৮৫ সনে, যখন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে যান, তখন প্রায়ই দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। আমি গোবিন্দজীর বাড়ী ঠাকুরের সহিত গিয়াছি; কিছুক্ষণ দর্শন করিয়া হঠাৎ কদলী বৃক্ষের মত দুপ্‌ করিয়া সানের উপর ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। এইরূপ অন্যান্য বিগ্রহ দর্শন করিতে করিতেও মূর্চ্ছা হইয়াছিল। হঠাৎ দাঁড়ান অবস্থায় উপর হইতে এইরূপ পড়িয়া যাইতেন। আমরা যখন

বিশ্রামঘাটের আরতিদর্শনে নৌকায় উঠি, তখন আমার পিতাঠাকুর ভয় করিয়াছিলেন, উনি নৌকার উপর হইতে এইরূপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন; ভাগ্যক্রমে সেইরূপ ঘটে নাই।

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন:—"যখন ঠাকুর কটকের ঘাটে নৌকা হইতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়িতে উঠিবেন; তখন অপূর্ব্ব দৃশ্য; সেই গৈরিক বসন, জটা পৃষ্ঠদেশে শোভমান; প্রাতঃসূর্য্য-কিরণ তাহার উপর পতিত হইয়াছে। একপদ ঘাটের সিঁড়িতে, আর এক পদ নৌকায়; দুই খানি নোট হস্তে ষ্টীমার ও বোট নৌকার মাঝিদিগকে বলিলেন, "তোমাদের জন্যই, তোমাদের প্রসাদেই আমার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব দর্শন হইতেছে। আশীর্ব্বাদ কর যেন দর্শন পাই। তোমরা বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আনিয়াছ। আমার আকাশবৃত্তি। তোমরা কত মহাজন, কত বড় মানুষকে লইয়া আসিতেছ। কত বেশী বক্‌সিস্ পাইয়াছ। আমার আকাশবৃত্তির যাহা কিছু দিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া আশী-র্ব্বাদ কর যেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন হয়। ঘাটে প্রায় ৪০০ শত লোক দাঁড়াইয়া সকলে অবাক্, মাঝিরাও অবাক্। তাহারা টাকা পায় বটে, কিন্তু এরূপ দেবতার নিজ হস্ত হইতে পায় না।

"নৌকাতে ঠাকুরের সঙ্গে শাস্ত্রীর আলাপও অনেক হয়। ছোট সতীশ বাবু অবতারের কথা জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে তিনি বলেন, অবতার নিজের মনে যখন প্রকাশ হইবে, যখন অবতার নিজজ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিবে, তখন অবতার উপলব্ধি হইল। নতুবা অবতার মুখে বলিলে হইবে না।"



ঢাকা একরামপুরের বাসায় গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থিতিসময়ে একদিন একটি সাধু একটি ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া তথায় বেলা প্রায় ১২ টার সময় আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্রন্দন করত করযোড়ে বলিতে

লাগিলেন, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। তিনি কি হইয়াছে অবস্থা জানিতে চাহিলে ভদ্রলোকটী বলিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটীর নিকট সাধু অকপটে আত্মকাহিনী বলিয়াছিলেন। এই দিব্যকান্তি সুন্দর যুবক সাধু বিহারীলাল ঠাকুরের আখড়ায় ঢাকা মালাকার টোলায় কিছুকাল হইতে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় ঠাকুরদর্শনার্থে স্ত্রীলোক ও পুরুষ অনেকে প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যার পরে গমন করেন। একটী বড় লোকের কন্যা তাহার ঝিকে সঙ্গে লইয়া তথায় দর্শন করিতে যাইত, কিন্তু যুবতী এই যুবক সাধুকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়; পরে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার ঝিকে মনোগত ভাব ব্যক্ত করে। ক্রমে নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী ভোজনার্থ ইহাঁর সমীপে প্রেরণ করে ও আপনিও সঙ্গে যায়। এই ভাবে কিছু দিন গত হইলে ঝির দ্বারা ইহাঁর নিকট অভীপ্সিত ব্যক্ত করে। কিছু দিন এই ভাবে চলিলে কামিনীকাঞ্চনসম্পর্কে এই যুবক সাধুর মন পরিবর্ত্তন হওয়ায় ইনি ব্রতভ্রষ্ট হইয়াছেন। তৎপর আত্মগ্লানিতে অধীর হইয়া উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, অমি খেয়াঘাটে পার হইয়া উহাঁর নিকটে যাইয়া ক্রন্দনের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আপনার সমীপে আসিতে পরামর্শ দিয়া নিজে উহাঁকে সঙ্গে করিয়া আপনার সমীপে আসিয়াছি। গোস্বামী মহাশয় সমস্ত অবগত হইয়া সেই মূহূর্ত্তেই তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গুরুসন্নিধানে যাইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। গুরু অপ্রকট হইয়া থাকিলে সাধুদের সঙ্গে থাকিতে অনুমতি করিলেন। তৎক্ষণাৎ সাধু তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তৎপর আমরা কখনও আর তাঁহাকে দেখি নাই।

১২৯৪ সন ২৬শে চৈত্র গোস্বামী মহাশয়ের ঢাকা নগরীতে এক্রামপুরের বাসায় অবস্থিতিসময়ে একবার ভয়ানক প্রবল ঘূর্ণিবায়ু (টর্‌নেডো) হয়। ইহা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে ভীষণ বেগে

প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব কোণে চলিয়া যায়। ইহাতে ঢাকা নগরীর অনেক স্থানের লোকের দালান কোটা ঘরবাড়ী ভগ্ন ও পতিত হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। নবাব গণি মিঞা সাহেবের বাটীতে একটী দালান ভগ্ন হইয়া পতিত হয়; তাহাতে নাজির জগবন্ধু বসু ও অপর একটি ভদ্রলোক মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইভাবে কতস্থানে যে কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার সংবাদ কে রাখে? তৎকালে বুড়ীগঙ্গা নদীতে যে সকল ছোট বড় নৌকা ছিল, তাহার কতকগুলি ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যায়, কতকগুলি প্রবল বায়ুবেগে ডাঙ্গায় উঠিয়াছিল, অনেকগুলি ছোট ডিঙ্গি নৌকা এই ঝঞ্ঝাবায়ুতে বৃক্ষের উপর উঠিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আরও কত প্রকারের ক্ষতি হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

চতুর্দ্দিকে লোকের হাহাকার ও ক্রন্দনের শব্দ শ্রুত হইতেছিল। এই সময় গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বাসার ছাদের উপরে উঠিয়াছিলেন। আমরাও সঙ্গে ছাদে উঠিলাম। আকাশ পানে তাকাইয়া দেখিলাম, প্রবল একটী আগুনের গোলা; যেন একটী কিম্ভূত কিমাকার প্রকৃতির ব্যক্তি ঐ গোলা শূন্য দিকে ছুড়িতেছে ও পুনঃ লুফিয়া উহা হস্ত দ্বারা ধরিতেছে। তাহার একপদ একবার উঠাইতেছে, অন্যপদ নিম্নদিকে প্রসারিত করিতেছে। এইরূপ কিম্ভূত কিমাকার দর্শন করিলাম। তখন গোস্বামী মহাশয় তাহা দর্শন করিয়া বক্ষে দুই হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন. "জয় মহাবীর" "জয় মহাবীর" "আমার বুকে নিক্ষেপ কর"।

তৎপর কিছুকাল পরে আমরা লোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া নীচে নামিয়া দর্শন করিতে বাহির হইয়া সহরে চলিলাম। রাস্তায় বাহির হইয়া চলিতে পথ পাইলাম না। কেবলই লোকের আর্ত্তনাদের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। যে দিক্ দিয়া চলিতে ইচ্ছা করি সর্ব্বত্রই পথ বন্ধ ও ঐরূপ আর্ত্তনাদ ও

ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম। অগত্যা আমরা বাসার দিকে ফিরিতে বাধ্য হইলাম।

গুরু ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন :—

গোস্বামী প্রভু যখন ৪৫ নং হ্যারিসেন রোডের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, তখন একদিন আমি প্রাতঃকালে তাঁহার ঘরে বসিয়াছিলাম। অন্যান্য গুরুভ্রাতারাও উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ছোট সতীশ) গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে নিত্যানন্দ প্রভু মদ্য মাংস ব্যবহার করিতেন, ইহা কি সত্য? শুনিবামাত্রই ঠাকুর বলিলেন, একথা শুনিলে কাণে হাত দিতে হয় এবং ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে দুই হস্তে নিজ কর্ণ আচ্ছাদন করিলেন। এই প্রসঙ্গে বলিলেন, এখন যার যাহা খুসি, সে তাহাই বলিতেছে।

১ম খণ্ড—৪৪৩ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ঘটনাটী এইরূপ হইবে।

প্রথমতঃ ৺ভগীরথ চৌধুরী ভোগ দিয়া আনিয়াছিলেন। পরে কালীকিশোর নন্দী মহাশয় ভোগ দিয়া আনেন।

যে সময় ৺গঙ্গাধর আচার্য্য মহাশয় মেদিনীপুর হাই স্কুলের হেড্মাষ্টার ছিলেন, সেই সময় একবার গোস্বামী মহাশয় প্রচারার্থে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। মেদিনীপুর সহরের প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে গোপগিরি নামে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। ঐ স্থানে একদিন গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম ভক্তগণের সহিত গমন করিয়াছিলেন। স্থানটী অতীব রমণীয়। অদূরে শালবৃক্ষের শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। পাদদেশে কংসাবতী প্রবাহিতা। নদীর অপর পারে গ্রামগুলি নানাবিধ বৃক্ষপত্রে সমাচ্ছাদিত থাকিয়া যেন পুঞ্জীভূত নীলিমা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে

থাকে। এই পাহাড়টীর সম্বন্ধে দুইটী কিংবদন্তী আছে। এস্থলে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম কিংবদন্তী এই যে, ইহা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে মহারাট্টাদিগের দুর্গ ছিল। ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে, ঐ পাহাড়ের এক পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর ন্যায় গর্ত্ত আছে। দেখিলে মনে হয়, উহা পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। হয় ত যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ঐ স্থানে রক্ষিত হইত এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে সৈনিকেরাও উহার আশ্রয় গ্রহণ করিত।

দ্বিতীয় কিংবদন্তী এই যে, ইহা মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটরাজের দক্ষিণ গোগৃহ। এবিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলে বোধ হয় ইহার মূল আবিষ্কৃত হইতে পারে। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান জয়পুর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশই মৎস্য দেশ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উহা শাস্ত্রোক্ত মধ্যদেশের নিকটবর্ত্তী। মধ্যদেশের এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় :—

"হিমবদ্‌বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যং যঃ প্রাগ্‌বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগস্য মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

যাহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র ও পূর্ব্বে প্রয়াগ সেই প্রদেশ মধ্যদেশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক গোপগিরি কিরূপে বিরাটরাজের গোগৃহ হইতে পারে।

ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে জানা যায়, কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেদিনীপুর মধ্যদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহার দুইটী প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ

এই—যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ৺পুরীধাম হইতে রাঢ় দেশে আগমন করিতেছেন, সেই প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ আছে :—

"কথো দিনে উৎকলের সীমা ছাড়াইলা।
মধ্যদেশ হইয়া রাঢ় দেশে প্রবেশিলা॥"

৺ ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর লিখিয়াছেন :—

"বাঙলার সীমা নেড়া দেউল ছাড়িয়া।"

সুতরাং উত্তরে নেড়া দেউল ও দক্ষিণে উৎকল, এই উভয় সীমার মধ্যবর্ত্তী দেশ মধ্যদেশ এবং ইহাই মেদিনীপুর জেলা। অল্পদিন পূর্ব্বে ইহার সহিত উত্তরে ঘাঁটাল পর্য্যন্ত যোগ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ কুলতত্ত্বার্ণবনামক কুলগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কুল-গ্রন্থ প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দমিশ্রকর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইনি নবাব হোশেন শার সমসাময়িক। এই গ্রন্থে আছে :—

"মধ্যশ্রেণীতি বিখ্যাতা মধ্যদেশনিবাসতঃ।"

রাজা কংসনারায়ণের (রাজা গণেশের) সময়ে রাঢ়ীয় আট জন কুলীন ও বত্রিশ জন শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তদানীন্তন ঘটকদিগের অবিচারে বিরক্ত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরে বসতি করেন। যেমন দেশানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে, সেইরূপ ইঁহাদেরও মধ্যদেশ-অনুসারে মধ্যশ্রেণী বলিয়া নামকরণ হইয়াছে, ইহাই উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধে গ্রন্থকার পরিচয় দিয়াছেন।

অতএব এই প্রমাণেও মেদিনীপুর মধ্যদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল, ইহা জানা যাইতেছে।

এক্ষণে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, শাস্ত্রোক্ত মধ্যদেশকে এই মধ্যদেশ বলিয়া ভ্রম করিবার ফলে বিরাট রাজার গোগৃহ গোপগিরিতে স্থাপিত, এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালী প্রচুর মৎস্য ভক্ষণ করে বলিয়া প্রাচীন মৎস্য দেশকে বাঙ্গলাদেশের অন্তর্গত করিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

মেদিনীপুরে এই প্রসিদ্ধ গোপগিরিতে গোস্বামী মহাশয় ভক্তগণের সহিত বহু রমণীয় স্বভাবসৌন্দর্য্যের মধ্যে উপবেশন করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর উপাসনা ও উপদেশে সমাগত ভক্তমণ্ডলী পরম আনন্দ লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। এক সময় তাঁহার পদরেণু মেদিনীপুরে পতিত হইয়াছে, ইহা মেদিনীপুরের কম সৌভাগ্য নহে।

একটী গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন ঃ—

১। গোস্বামী প্রভু যখন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাটীতে থাকিতেন, সেই সময় আমি একদিন তাঁহার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় একটী লোক গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটী সাজ পোষাকে একটী দারোয়ানের মত; মুখ প্রফুল্ল এবং দেখিলেই অতি সরলপ্রকৃতি বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, গোস্বামী প্রভু যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন, সেই সময় লোকটীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। লোকটী আসিবামাত্র গোঁসাইজী আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিজের আসনে বসাইলেন এবং অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। লোকটীকে নিজের আসনেই বসাইয়া রাখিলেন। ইহা দেখিয়া একটী গুরুভ্রাতা রাগে গর গর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমি এরূপ দেখিতে পারি না; অর্থাৎ অপরকে গুরুদেবের আসনে বসিতে দেখিতে পারি না। প্রভু বলিলেন, যদি দেখিতে না পার, ত দেখ। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, ভেদবুদ্ধির জন্য ক্লেশ পাইতেছে।

২। আমি যখন দীক্ষা লাভ করি, তখন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে অবতার এ সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাঠ করি নাই, সুতরাং তিনি একজন ভক্ত, এইরূপই ধারণা ছিল। একদিন পূর্ব্বোক্ত বাটীতে গোঁসাইজীর ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ উঠিল। আমি বলিলাম, ভগবান্ তাঁহাকে যেরূপ

করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তদনুরূপ হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "তিনি নিজেই ভগবান্।" শুনিবা মাত্র আমার যেন একটা চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

৩। পূর্ব্বোক্ত বাটীতে একদিন গোঁসাইজীর ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় একটী ব্রাহ্ম ভদ্রলোক আসিয়া প্রভুকে অন্য এক বাটীতে যাইতে আহ্বান করিলেন। গোস্বামী প্রভু বলিলেন, আমার গুরুর হুকুম না পাইলে আমার কোথাও যাইবার উপায় নাই। ভদ্রলোকটী বলিলেন, আপনার গুরু ত বহুদূরে থাকেন, তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয় কিরূপে? প্রভু বলিলেন, এখানে বসিয়াই হয়; সে অতি স্বভাবিক। পরে কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মটী বলিলেন, ব্রহ্মই গুরু। প্রভু বলিলেন, গুরুই ব্রহ্ম। ভদ্রলোকটি যতবার বলিলেন ব্রহ্মই গুরু; তিনি ততবার বলিলেন, গুরুই ব্রহ্ম।

৪। আর এক দিন একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন মানুষ মরিলে কি তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়? প্রভু উত্তর করিলেন। হাঁ, পুনর্জ্জন্ম হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

(১)

এক্ষণে আমরা পুনরায় পুরীর ঘটনাবলী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

একদিন প্রাতঃকালে গোস্বামী মহাশয় বড়দাণ্ডের রাস্তা দিয়া সমুদ্র-স্নানে যাইতেছিলেন। তখন পশ্চিমদেশীয়া এক বৃদ্ধা কোমরে একহাত ও মাথায় একহাত দিয়া নৃত্য করিতেছিলেন ও 'রাম বিনা মেরা জীবন হীনা' প্রভৃতি গান করিতেছিলেন। তথায় বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নৃত্য ও গানে আনন্দে বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এক বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন "ভাইয়া দেখ্‌লাও, মহারাজজীকা সাচ্চা জটা দেখ্‌লাও।" গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধাকে প্রায় ৪০৲ টাকা মূল্যের একখানা রেশমী বস্ত্র প্রদান করিলেন। ঐ গানে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার চন্দন যাত্রার সময় একদিন নিশীথসময়ে ঠাকুর চন্দনপুকুরে ফুলমালাসজ্জিত মদনমোহনের সাজ দেখিতে গেলেন। সে দিন ঠাকুরের গজোদ্ধারণ বেশ হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সেবকেরা কিছু ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতে ও আমোদ আহ্লাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট কিছু অর্থ চাহিলেন। ঠাকুরের নিকট টাকা না থাকায় কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের নিকট হইতে ২০৲ টাকা চাহিয়া আনিতে বলিলেন। বিধু ঘোষ মহাশয় কুঞ্জবাবুর নিকট হইতে টাকা চাহিয়া সেবকদিগকে দিলেন। কুঞ্জ বাবুই ধন্য, যাঁহার নিকট হইতে ঠাকুর টাকা চাহিয়া আনিয়া সেবকদের দান করিলেন। ঢাকায় ১ম ধ্বলটে কুঞ্জবাবুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাপ্রভু রূপসনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া যেরূপ সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, আজ আমি ইহাঁকে আলিঙ্গন করিয়া তদ্রূপ সুখানুভব করিলাম।

একসময়ে ঢাকাতে ইহাঁর গানবাদ্যে ঠাকুর ও অন্যান্য সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি পুরীতে আসিয়া ঠাকুরের প্রীতির নিমিত্ত ছয় সাত শত টাকা ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্রদান ও কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছিলেন। ঠাকুরের দানে তিন হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

প্রত্যহ সমুদ্রস্নানে যাওয়ার সময় দানের নিমিত্ত ঠাকুর কিছু পয়সা সঙ্গে নিতে বলিতেন। একদিন হাতে মোটেই পয়সা ছিল না। কাহারও নিকট পয়সা পাইলাম না। ঠাকুরকে এবিষয় জানাইলে তাঁহার আদেশমত তাঁহার ঘটীটা বিক্রয় করিয়া একটাকা পাইলাম। তদ্দ্বারা গরুর ঘাস কেনা ও টিনদাস বাবাজীর পয়সা দেওয়া ও অন্যান্য দান করা হইল। একদিন কাঙ্গালদের কিছু দেওয়া হয় নাই। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"আজ দিনটা বৃথাই গেল।" তৎপর কাঙ্গালদের কিছু দেওয়াইলেন।

সমুদ্রতীরে কতকগুলি জেলে বাস করে। ঠাকুর ইহাদিগকে খুব প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন; কেননা, তিনি বলিতেন,"ইহারাই, মহাপ্রভুকে সমুদ্রগর্ভ হইতে জালে করিয়া উঠাইয়াছিল।" একজন জেলে সম্মুখে আসিলে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমার নাম 'কৃষ্ণম্'।" ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, ইহাদের ভিতরে এখনও মহাপ্রভুর প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; নাম রাখিয়াছে 'কৃষ্ণম্'।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমরা যে সমুদ্রে জাল দিয়া মাছ ধর, মাথায় জল যায় না?" সে বলিল, "আমরা একপ্রকার টুপী ব্যবহার করি।" ঠাকুর সেরূপ একটি টুপী চাওয়ায় কয়েকদিন পরে সেই জেলে একটা টুপী তৈয়ার করিয়া বাসায় আনিল। মহাপ্রভুকে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমুদ্র হইতে উঠাইয়াছিল, ঠাকুর সেই ভাবেই ডগমগ। ঠাকুরের আদেশানুসারে টুপীটা মাথায় পরাইয়াদিল। ঠাকুর তুষ্ট হইয়া তাহাকে উহার দাম তিন টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

স্নানের সময় জেলেদের ছেলেমেয়েরা আসিয়া ঠাকুরের নিকট দাঁড়ায়।

ঠাকুর একদিন বিধু ঘোষকে বলিলেন, "বিধু, ইহাদিগকে আম খাওয়াইতে পার ?" পরদিন প্রত্যুষে বিধুবাবু সরলনাথের দ্বারা সমুদ্রতীরে দুইশত আম লইয়া গেলেন কৃষ্ণম্ আসিয়া উহা সকলকে বাঁটিয়া দিল। আম কিছু কম পড়ায় বাকী সকলকে পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন।

ঠাকুর ধীরে ধীরে বাসায় গমন করিতেন। পথে কখনও কখনও পাণ্ডা ঠাকুরদের সহিত আলাপ হইত। কখন কখন ব্রাহ্মণ বালকেরা পুস্তক ও পয়সা চাহিত। তাহাদের উহা দিতে অনুমতি দিয়া বাসায় প্রবেশ করিতেন।

তিনি কাঙ্গালী ভোজনের পরে আহার করিতেন। জ্যৈষ্ঠমাসে আম উঠিলে অগ্রে জগন্নাথদেবকে ও কাঙ্গালীদিগকে, জগন্নাথবল্লভ-মঠের পাঠার্থী ছাত্রদিগকে, পণ্ডিতজীকে ও ছেলেমেয়েদিগকে আম দেওয়াইয়া তবে নিজে আম খাইতেন। বানরগণও পাইত, সময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট প্রসাদ ও আম প্রভৃতি কাঙ্গালদিগকে ভোজন করাইতেন। জগন্নাথবল্লভের বৈষ্ণবগণও কিছুদিন তথায় মহাপ্রসাদ পাইতেন।

পুরীতে কখনও কখনও সরলনাথ অন্য কাজে বাহিরে চলিয়া যাইতেন। অন্য কোন কোন গুরুভ্রাতা সকলকে চা বণ্টন করিয়া দিতেন। তাহাতে তাঁহারা তারতম্য করিতেন; নিজেরা অধিক রাখিতেন ও যাহাকে আপনার মনে করিতেন, তাহাকে বেশী করিয়া দিতেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতির চা কম হইত। তাঁহারা প্রায়ই ইহা লইয়া আন্দোলন ও আলোচনা করিতেন। এই আলোচনার কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় রাত্রিতে সরলনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এখন চা করে কে ? সরলনাথ তাঁহাদের নাম বলিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি কল্য হইতে চা করিয়া সকলকে দিয়া অন্য কাজে যাইবে। খাবার জিনিষ সকলকে সমান ভাবে দেওয়া উঠিত। যাহারা লোভবশতঃ নিজের জন্য বেশী রাখে, তাহাদের কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না।"

যোগজীবন একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে মন্দিরে খুব

ভাল খাবার জিনিষ পাওয়া যায়—লাড্ডু, খাজা, জগন্নাথবল্লভী প্রভৃতি, তাহা তোমার জন্য আনাইয়া দিব? তিনি বলিলেন, "মেথর পর্য্যন্ত সকলকে যদি তাহা দিতে পার, তবে আন; নচেৎ শুধু আমার জন্য আনিলে উহা আমি খাইব না।" তখন যোগজীবন প্রত্যহ দশ টাকার ঐ খাবার আনাইতেন এবং মেথর পর্য্যন্ত সকলকে তাহা বণ্টন করিয়া দিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের পুরী আসা অবধি বেতন ব্যতীত মেথর প্রত্যহ পারস পাইত। সে পারসে তাহাদের তিন চারি জনের বেশ চলিয়া যাইত। কলিকাতা সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় ও হ্যারিসন রোডের বাসায় থাকার সময়েও মেথর বেতন ভিন্ন পারস পাইত; তদুপরি বস্ত্রাদিও সর্ব্বত্রই পাইত।

আমি এবং কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা পুরীতে অবস্থিতিসময় গোস্বামী মহাশয়ের মৌনী-অবস্থায় লিখিত উপদেশগুলি মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি। তাহা শুনিয়া তিনি আমাদিগকে উহা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "উহা করিলে লোকের উপকার না হইয়া বরং অকল্যাণই হইবে। আমার লিখিত বহু প্রবন্ধ আছে, যাহা ধর্ম্মতত্ত্ব, তত্ত্বকৌমুদী, তত্ত্ববোধিনী, বামাবোধিনী এবং সুলভ সমাচার প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ছাপাইতে পারেন। উমেশ দত্ত মহাশয়কে বলিলে তিনি তাহা দেখাইয়া দিবেন। অতঃপর কুঞ্জবাবু প্রভৃতি দত্ত মহাশয়ের সমীপে যাইয়া তদ্বিষয়ে প্রস্তাব করায় তিনি তাঁহার লিখিত বিষয়গুলি দেখাইয়া দিতে পারিবেন কিন্তু লিখিয়া দিতে পারিবেন না বলিলেন। সুতরাং অপর লোক দ্বারা লেখাইয়া লইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হইল না।

গোস্বামী মহাশয় এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "গুরুগৃহে ভোজনে পংক্তিবিচার নাই; মহোৎসবেও নাই। এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মান উচিত নহে। যাঁহারা যে সমাজে আছেন, তাঁহারা সেই সমাজমতেই চলিবেন।"

শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে ক্ষুদ্রপাখী টুন্টুই যেমন নিজের শক্তিবলে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল, পুরীতে ঠাকুরের অজস্র দানের সময়ে শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস মহাশয়ও সেইরূপ গোস্বামী মহাশয়ের দানের কথা শুনিয়া ৫৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাই আমার পাঁচ লাখ।" তিনি লোকের প্রাণের অবস্থা দেখিয়া বিচার করিতেন।

গোস্বামী মহাশয়ের পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীকুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী ও ছোট সতীশের মধ্যে সমুদ্রস্নানে যাইবার পথে ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে একজন বলিলেন, "আমি যে কথা তোমাকে বলিলাম, ইহা গোঁসাই আমাকে বলিয়াছেন এবং আমি তাহা লিখিয়া রাখিয়াছি। অতঃপর তাঁহারা সমুদ্রস্নান ও জগন্নাথদর্শনান্তে বাসায় আসিলেন। অপর গুরু-ভাইটি গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহাদের বিরোধের বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন "কোথায় কি লেখা আছে তাহা আনিয়া আমাকে দেখাও দেখি।" তাঁহার কথামতে সেই লিখিত খাতা আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি তাহা দেখিয়া ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি তাহাকে ডাক।" তিনি নিকটে আসিলে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি যাহা বলি নাই তাহাই লিখিয়াছ? তোমার এ সমস্ত খাতা এখনই পোড়াইয়া ফেল।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, পোড়াইয়া ফেলছি।" কিছুক্ষণ পরে সেই গুরুভাইটি তাঁহার সমীপে গিয়া বলিলেন, "এগুলি পড়িয়া আমার উপকার হয়, ইহা পোড়াইতে আমার ক্লেশ হয়। তখন তিনি বলিলেন, "ইহা পড়িয়া যদি তোমার উপকার হয় এবং পোড়াইতে কষ্ট হয়, তবে তুমি ইহা নিজে নিজে পড়িবে, কাহাকেও পড়িতে দিবে না বা প্রকাশ করিবে না।" তখন গুরুভাইটি 'আচ্ছা, তাই হইবে' বলিয়া চলিয়া গেলেন। এখন ঐ সমস্ত কথা প্রকাশিত হইতেছে এবং সাধারণে

পড়িতেছেন। তাঁহারা পাঠ করিয়া বলেন, এমন ত কোন দোষের কথা আমরা দেখিতে পাই না। দোষ না থাকে ভাল, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় যে ও গুলি প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এটীও সত্য ঘটনা। ইহার সামঞ্জস্য কোথায় পাঠক নিজেই বিবেচনা করিবেন।

এক সময় এখানে একটি গুরুভাইকে গোঁসাই বলিয়াছিলেন, "তোমার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়াছে, তুমি বাড়ী গিয়া বিবাহ কর।"

এক দিন কোন বিশেষ ঘটনা-উপলক্ষ্যে গোস্বামী মহাশয় আমার নিকট বলিলেন, "দুইটি কার্য্যে গুরুতর অপরাধ হইয়া থাকে। যেখানে যুগ যুগান্তর হইতে কোন প্রসিদ্ধ দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেখানে আবার নূতন করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলে অপরাধ হয়। তাহার হেতু একমাত্র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় অপরাধ, ব্রাহ্মণেতর হইয়া ব্রাহ্মণকে শিষ্য করা। এই দুইটিই গর্হিত কার্য্য। পরে তিনি বলিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ব্রাহ্মণেতর জাতি কখনও শিষ্য করেন নাই। তাঁহার অপ্রকট অবস্থার পরেও কিছু কাল এ বিধির বিপর্য্যয় ঘটে নাই। নরোত্তমদাস প্রভৃতির সমসাময়িক কতকগুলি ব্রাহ্মণেতর জাতি, বৈদ্য ও কায়স্থ, এমন কি পরে শূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্য।"

একদিন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, জগন্নাথদেবের মন্দির যে পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে নীলাচল বলে। এখন নীলাচলের প্রায় তিনভাগ মন্দির সহ মাটির নীচে বসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দির তাহারই উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে; এই স্থান হইতে একটি সুড়ঙ্গ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত ছিল। এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের চারিদিকে অনেক মন্দির মাটির নীচে প্রোথিত আছে। তাহার উদ্ধার-সাধন বহুব্যয়সাধ্য। শ্বেতগঙ্গা দর্শন করিয়া বলিলেন, ইহার উত্তর ও পশ্চিমদিকে যে সকল ঘর বাড়ী আছে তাহা পূর্ব্বে ছিল না। মন্দিরের নিকট প্রায় সমস্ত স্থানই শ্বেতগঙ্গা ছিল;

তাহাই পূর্ণ করিয়া ক্রমে লোকে বাড়ীঘর করিয়াছে। মহাপ্রভু তখন এই শ্বেতগঙ্গায় পাদপ্রক্ষালন করিয়া মন্দিরে যাইতেন। ইহা তীর্থস্থান বলিয়া যে টুকু না রাখিলে নয় তাহাই রাখা হইয়াছে।

একদিন ভোরে মন্দিরের দিকে যাইবার সময় পথে গোস্বামী মহাশয় ব্রজবাসী মিঠাইওয়ালাকে তাঁহার পুত্রের উপনয়নের জন্য ছয়টী টাকা দিয়া বলিলেন 'পত্র পুষ্প দিয়া কোনরূপে কাজ সমাধা করিও।' ব্রজবাসী তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "রাধারাণী আপকো বনায়ে রাখো, অ্যা হামকো লাখ রূপেয়া হ্যায়।" ব্রজবাসী একটি স্ত্রীলোককে টাকা দেখাইয়া বলিল, "বাবা মহারাজকি জয়, যমুনামায়ী আপকো বনায়ে রাখো।"



এই পুরীর আশ্রমে গোস্বামী প্রভু এইরূপ নিয়মে চলিতেন। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া তিনি চা ও অন্য কিছু মহাপ্রসাদ দ্বারা জলযোগ করিতেন। তৎপর আমাদের মধ্যে কেহ নিত্যপাঠের গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, বাংলা শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্য কিছু পাঠ করিতেন। এই পাঠ শেষ হইলে তিনি নিজে গ্রন্থসাহেব ও অন্যান্য সংস্কৃত কিংবা হিন্দী-গ্রন্থ পাঠ করিতেন। ভোর কীর্ত্তনের সময় হইতেই একটি তুলসীবৃক্ষ গ্রন্থ সকলের সম্মুখে তাঁহার আসনের নিকট রাখা হইত। তুলসীগাছের নিকট চড়ুই পাখী সকলকে রোজ চাউল দেওয়াইতেন। বানরের বাচ্চাগুলিও আসিয়া ঐ চাউল খুটিয়া খুটিয়া খাইত এবং গ্রন্থ সকলের নীচে যাইয়া তাহারা নিঃশঙ্কভাবে বাতাসা কুড়াইয়া খাইত। হরিলুঠের পর ঠাকুর প্রত্যহ ইহাদের জন্য উহা রাখিয়া দিতেন, প্রত্যূষে বড়রাস্তায় পশুপক্ষীদিগকে চাউল ও মাটির গামলায় জল দেওয়াইতেন।

৺পুরীধামে একসময় গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে বলিলেন, "আমরা জাতিভেদ উঠাইতে চেষ্টা ও সংগ্রাম করিয়াছি, কিন্তু তাহা এখানে কি ভাবে

হইয়াছে? জগন্নাথের ভোগ না হওয়া অবধি ভোগের সামগ্রীসকল অস্পৃশ্য জাতি স্পর্শ করিলে তাহা দ্বারা ভোগ হইতে পারে না। সামগ্রী সকল ব্রাহ্মণে রান্না করিয়া ভোগ হইয়া গেলে উহা অস্পৃশ্য জাতি লইয়া গিয়া পরিবেশন করিলে বড় বড় পণ্ডিত, ব্রাহ্মণাদি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহা ভোজন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করেন; কিন্তু সেই সকল অস্পৃশ্যজাতি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজনের পূর্ব্বে পদপ্রক্ষালনের জন্য জল দিলে কদাচ তাহা তাঁহারা ব্যবহার করেন না। ভক্তিযোগে যাহা হয়, মায়িকবুদ্ধির বলে তাহা হয় না।"

একদিন শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের রচিত 'মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়,' ইত্যাদি সঙ্গীতের ভাবে কাতর হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের সমীপে যাইয়া বলিলেন "আপনার নিকট আসিতে আমার ভয় হয়।" উত্তরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—ভয় কিসের? আপনাকে যেরূপ মনে করেন, আমাকেও সেইরূপ মনে করিবেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গণপুরনিবাসী ৺মহাবিষ্ণুজ্যোতি বাবু গোস্বামী মহাশয়ের অবিকল রূপবর্ণনা করিয়া একটি গান রচনা করিয়া এই নীলমণি বর্ম্মণের বাড়ীতে তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। গানটি নিম্নে দেওয়া গেল:—

অপরূপ শ্রীগুরুরূপ, হৃদয়ে সদা ভাবনা রে,
ভবন বন সমান হবে শমনভয় আর রবে না রে।
তরুণ রবিকিরণ দুটি চরণপাশে পরকাশে,
ধন্য সেজন ও চরণ যাঁর হৃদিসরসে সদা ভাসে,
কোটি জন্মের পাপনাশে, ও রাঙ্গা পদপরশে,
মজ ও পদে মনভৃঙ্গ, আন সঙ্গ ছাড়না রে।

কটিতে ঝাপি কৌপীন বহির্ব্বসন শোভে সুন্দর,
দণ্ড কমণ্ডলূ করে শোভে কিবা মনোহর,
যেন মদমত্ত কুঞ্জর, গমন কিবা মন্থর,
মধুর হাস মধুর ভাষ মধুমাখা সব ব্যবহারে।
সুবিশাল বক্ষে শোভে সপ্তলহরী মাল,
উর্দ্ধতিলকরেখা ভালে কিবা শোভে ভাল,
মৌলীরচিত চূড়া, যেন শ্যামের মোহন চূড়া
কিম্বা ফণিকণা যেন শোভে গঙ্গাধরশিরে।
পৃষ্ঠে দোলে বেণী যেন ভানুরাজনন্দিনী,
প্রেমনীরে ভাসে সদা শ্রীমুখকমলখানি,
আনন্দময় সব, আনন্দরসখনি,
মগন দিবারজনী কিবা আনন্দ-সায়রে।

গানটী শুনিয়া গোস্বামীপ্রভু কিছু না বলিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এক সময়ে পুরীতে অর্থের অনটন হওয়ায় গোস্বামী মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি শান্তিসুধার নিকট হইতে তাহার অলঙ্কারাদি লইয়া কোন স্থান হইতে ২।৩ শত টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিন।" আমি বলিলাম, 'শুধু শান্তিসুধা নয়, জগদ্বন্ধু বাবুকেও ডাকাইয়া আপনি একথা বলিয়া দিন।" তিনি তাঁহাদিগকে গহনা দিবার কথা বলিলেন। শ্রীমতী শান্তিসুধা তাহা শুনিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমিই আমাকে গহনা দিয়াছ, তুমিই নিবে, তাহা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে কি?" জগদ্বন্ধু বাবু বলিলেন, "তা এখন নিবেন, আবার খালাস করিয়া দিবেন।"

এ কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "তা নাও দিতে পারি।" শান্তিসুধা কোন কথা না বলিয়া জিনিষগুলি আমাকে আনিয়া দিলেন। আমি

বড় হরিশ বাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া টাকা আনিয়া দিলাম। পরে গোস্বামী মহাশয় সেগুলি ফিরাইয়া আনিয়া শান্তিসুধাকে দিয়াছিলেন।

নীলমণি বর্ম্মণের বাড়ী থাকার সময়ে গোস্বামী মহাশয় একদিন আমাকে বলিলেন যে, গাজিপুরের পওহারী বাবা দেহ রাখিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত দিন হইল? কি হইয়াছিল?" তিনি বলিলেন, "সে বেশী দিন হয় নাই। আপনি ত তাঁহাকে দেখিয়াছেন ও জানেন। তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া তাঁহার নিকট থাকিতেন। তিনিই উদ্বেগের কারণ হইয়াছিলেন। সেই শেঠ ও লালাদের ঘটনা এবারও ঘটিয়াছিল, তাহাই তাঁহার দেহ রাখার কারণ হইয়াছিল। সাধুমহাপুরুষ দিগের পিছনে কেহ লাগিলেই উদ্বেগ, অশান্তি ও বিপদ ঘটে। তিনি বাড়ীঘর ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে আপনার মনে আপনি থাকিতেন। স্বার্থসাধন যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা কি কখন পিছন ছাড়ে? জ্যেষ্ঠভাই বলিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না। অনেকদিন হইতেই তিনি গুহার ভিতর থাকিতেন, বাহিরে আসিতেন না। দেহ ছাড়িলে এ আপদ ঘুচিবে ভাবিয়া শিষ্যকে দিয়া কিছু ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠ আনাইয়া প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া উহা লইয়া গুহার ভিতরে গেলেন ও দরজা বন্ধ করিলেন। তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গুহা হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাস্নানান্তে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা শিষ্যকে দিয়া আনাইয়া গুহায় প্রবেশ করিতেন ও সমস্তদিনরাত্রি গুহার ভিতরেই থাকিতেন। সেদিনও তাহাই করিলেন। আহারাদি যাহাকিছু প্রয়োজন হইত, তাহাও সেই গুহার মধ্যেই সম্পন্ন করিতেন। গুহার মধ্যে ধুনীর ও পাকের জন্য যথেষ্ট কাষ্ঠ থাকিত। সেদিন তদ্দ্বারা নিজের শ্মশান সাজাইয়া তাহাতে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, ধূপ ধূনা প্রভৃতি রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া দেহ ভস্মীভূত করিলেন। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হওয়ায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও উপস্থিত জনগণ দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে"

একবার আমরা তথায় থাকিতে এক মাড়োয়ারী, লালা ও শেঠ সেস্থানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ধনী লোক ও পওহারী বাবার পরমভক্ত। পওহারী বাবার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা যদি আশ্রমের সেবার জন্য একটি জমিদারী খরিদ করিয়া কয়েক খানা পাকা বাড়ী তৈয়ার করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়া যান, তবে আপনাদের পুণ্য হইবে ও নামযশঃ বাড়িবে।" তাহারা বলিলেন, "মহারাজ যদি সে কথা বলেন, তবে আমরা দিতে পারি।" জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিলেন, "আমরাই ত দেখ্‌ব, শুন্‌ব, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার কি?" তাঁহারা তাহাতে সম্মত না হইয়া কিছু প্রণামী দিয়া চলিয়া গেলেন। পওহারী বাবা গুহা হইতে সব কথাই শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে যাহা কিছু বলা প্রয়োজন, তাহা তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা পুনরায় তথায় আসিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই কথাই বলিলেন। পওহারী বাবার নিষেধ-সত্ত্বেও তাঁহাদের নিকট এই কথা বলা হয় বলিয়া তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তাহাতেই এই শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে।

-০---

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

(২)

হরিদাস ঠাকুর হরিনাম করিতেন, এই অপরাধে তাঁহাকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। গ্রীসদেশীয় মহাজ্ঞানী সক্রাটিস্ তদানীন্তন যুবকদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ দিতেন, এই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। যীশু খ্রীষ্ট দীন হীন বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেন, এই অপরাধে তাঁহাকে ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা জগতে বিরল নহে। গোস্বামী প্রভু পুরীধামে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই; স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম হইয়া আসনে বসিয়া থাকিতেন। যেমন দিবসের আলোক পেচকের সহ্য হয় না, তদ্রূপ তাঁহার জীবে অজস্রধারে করুণা, অলৌকিক দান ও সর্ব্বোপরি এক-চ্ছত্র অযাচিত প্রতিষ্ঠা কতকগুলি অনুদার প্রতিষ্ঠাকামী লোকের সহ্য হইল না। তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হইল।

এক দিন বেলা প্রায় দুই প্রহর, ঠাকুরের ঘরে কেহই নাই; ব্রহ্মচারী ঠাকুরের লেঙ্গট ও বহির্ব্বাস ধৌত করিতে জগন্নাথবল্লভ মঠের পুকুরে গিয়াছেন। এই সুযোগ বুঝিয়া একটী লোক নাকি ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথদেবের প্রসাদ বলিয়া একটী লাড়ু ঠাকুরকে দিল। ঠাকুর উহা দেখিয়া বলিলেন, থাক্ থাক্, এখন থাক্। সে বলিল মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্র ভক্ষণ করিতে হয়, কালবিলম্ব করা নিষেধ। এই কথা বলিয়া একটী শ্লোক আবৃত্তি করিল। ঠাকুর মহাপ্রসাদের অবমাননা হয় মনে করিয়া উহা গ্রহণ করিয়া গলাধঃকরণ করিলেন।

লাড্ডু ভক্ষণ করিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন; পরদিন সংজ্ঞা লাভ করিয়া এ সকল ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এমন বিষ, হাতীকে দিলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইবে। মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি জানিয়া শুনিয়াই উহা খাইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমি জানিয়া শুনিয়াই উহা খাইয়াছি। না খাইলে মহাপ্রসাদকে অমান্য করা হয়, সেই জন্যই খাইয়াছি। আমার অনিচ্ছায় আমার শরীরের একটী লোমও কাহারও স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই।"

ঠাকুরকে খাদ্যাদির সহিত বিষ প্রয়োগ করা সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কয়েক বারের ঘটনার কথা আমরা শুনিয়াছিলাম। সে সকল ঘটনায় তাঁহার কিছুই হয় নাই জানিয়া আমরা কেহ বিশেষ অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম না। এ দিকে তাঁহার শরীর ক্রমেই অত্যন্ত নিস্তেজ ও যারপরনাই দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এক এক দিন রাত্রিতে তিনি ক্লেশ ব্যক্ত করিতেন; আবার এক এক দিন দেখিতাম যে, তিনি আসনে দিব্য বসিয়া বাম দিকের তাকিয়ার উপর মস্তক রাখিয়া নিঃশব্দে স্থির ভাবে আছেন, ক্লেশের কোনই অভিব্যক্তি নাই। এ সমস্ত দেখিয়া আমি তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম। - আপনাকে এক এক দিন ক্লেশব্যঞ্জক শব্দে চীৎকার করিতে শুনি, আবার এক এক দিন দেখি যেন কোনই ক্লেশ নাই; নিঃশব্দে আসনে স্থিরভাবে আছেন। ইহার কারণ কি? আমার কথা শুনিয়া তিনি কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন, দেখুন, শরীর যখন নিতান্তই অসহ্য ক্লেশ বহন করিতে অপারগ হয়, তখনই এই অবস্থায় থাকি। এ অবস্থায় থাকিলে শরীরের মধ্য দিয়া যাহা হইয়া যায়, তাহাতে আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন আমি বলিলাম, তবে ত ইহাই বেশ। তিনি বলিলেন, না, তাহা ঠিক নয়। এই ভোগটী না করিয়া গেলে আবার এই জন্য আসিতে হয়।

এই দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ হওয়ায়, একদিন পুঃ ইঃ শ্রীযুত নারায়ণ

বাবু, শশীবাবু, জগৎ বাবু, মুন্সেফ বাবু প্রভৃতি আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এ কাজের প্রবর্ত্তক সেই দুষ্ট লোকের নাম জানিতে চাহিলেন এবং বলিলেন, আমরা তাহাকে ইহার বিশেষ প্রতিফল প্রদান করিব। আপনি কেবল নামটী বলিয়া দিন, আপনাকে অন্য কিছুই করিতে হইবে না, সকলই আমরাই করিব। আপনাকে কাছারিতেও যাইতে হইবে না। তিনি বলিলেন অন্যায়ের বিচারক শাস্তিদাতা একজন আছেন, তিনিই যাহা ইচ্ছা বিধান করিবেন। আমরা কেন সে ভার গ্রহণ করিতে যাই? পুঃ ইঃ নারায়ণ বাবু বলিলেন, আপনি ক্ষমা করিতে চান, করুন, কিন্তু সেই দুষ্ট লোকটা কে জানিতে পারিলে তাহাকে চিনিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারি, নচেৎ অপর কাহারও প্রতি এমন অসদ্ব্যবহার সে করিতে পারে। তিনি বলিলেন, যাহারা ভগবানকে চায়, তাহারা কি রাজদ্বারে যায়? তিনি নাম বলিলেন না, সুতরাং তাঁহারা নিরস্ত হইয়া বিদায় লইলেন।

যাঁহার প্ররোচনায় বিষ প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই লোকটী নাকি একদিন গোস্বামী মহাশয়ের বাসার দরজার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ জানাইয়াছিলেন যে, তিনি দেখিতে আসিতে চান। গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন, তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দাও, তাঁহাকে আর এখানে আসিতে হইবে না। সুতরাং তাঁহার এই কথা শুনিয়া তিনি চলিয়া যান। পরে ঠাকুর তাঁহাকে পঞ্চাশটী টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ছাড়া অন্যে কেহ ঐ ব্যক্তির পরিচয় যেন জানিতে না পারে, এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই দুর্ঘটনার সময়ে বড় ছাতার মোহন্ত মহাশয় ভীত হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন, উপস্থিত ঘটনা লইয়া নাকি আপনারা পুলিশে খবর দিয়া মোকদ্দমা করিবেন? তিনি বলিলেন, না, না, আমাদের দ্বারা এ সম্বন্ধে কিছুই হইবে না। আপনি তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। অতঃপর দুই চারি কথা আলাপের পরে তিনি চলিয়া গেলেন।

এই অসুখের সময় একবার গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন, এখনও যদি একটা বড় নদীর মধ্যে যাইয়া কিছুদিন থাকিতে পারি, তাহা হইলে এ যাত্রায়ও সাম্লাইয়া লইতে পারি। পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের সে বাড়ীটা (হ্যারিসন্‌রোডের বাড়ী) কি খালি আছে? আমি বলিলাম, আমি যত দূর জানি, শুনিয়াছি সে বাড়ীটা এখনও খালি আছে। এখন তিনি সর্ব্বদাই কেবল কাল জাম ও বেদানা প্রভৃতি ঠাণ্ডা জিনিষ চাহিতেন। কলিকাতা সহরে কোথাও একটি বেদানা সে সময় পাওয়া গেল না। শুনিয়াছিলাম, কলিকাতা উইলসন্ সাহেবের হোটেলে বেদানার রস পাওয়া যায়, তাই আমি যোগজীবনকে বলিলাম, গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া, তিনি যদি বলেন, তবে উহা আনিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়কে সে কথা জানাইতে ব্রহ্মচারীকে বলিলেন। ব্রহ্মচারী গোস্বামী মহাশয়কে তাহা বলায় তিনি বলিলেন, আরে রাম! রাম! পূর্ব্বে যাহা করিয়াছি, এখনও আবার তাহাই কি করিতে হইবে? সুতরাং বেদানার রস আনান রহিত হইল।

অমরা এখানে কাল জামের জন্য দুইজন লোককে রোজ সাত আট আনা মজুরী দিয়া গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিতাম, তাহারা অপরাহ্নে ৫।৭টী অপক্ক জাম আনিয়া দিত; সুতরাং দুই চারিদিন দেখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। ইতিপূর্ব্বে ফলের জন্য স্থানে স্থানে কাহার কাহার নিকট টেলিগ্রাফ্ করা ও পত্র লেখা হইয়াছিল। তাঁহারা যে সকল ফল পাঠাইতেছিলেন, তাহা যথাসময়ে পৌঁছিত না। রেলকর্ম্মচারীদের বন্দোবস্তের ক্রটীতে উহা অধিকাংশ অপহৃত হইত এবং পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। অনেক বিলম্বে তাহাই ষ্টেশন হইতে আনিয়া তন্মধ্যে যাহা কিছু ভাল পাওয়া যাইত, তাহাই পচাটুকু বাদ দিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে দেওয়া যাইত। তিনি আবার তাহা সকলকে কিছু কিছু না দিয়া খাইতে চাহিতেন না। কাজেই একটু একটু সকলকে দিয়া যৎকিঞ্চিৎ তিনি গ্রহণ করিতেন।

আমি এই সময় তাঁহাকে এখান হইতে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম; কিন্তু অদৃষ্টগুণে সকল প্রকার চেষ্টা যত্নই বিফল হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনার শরীরের জন্য এখন যাহা প্রয়োজন, এখানে ত অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়াও তাহার কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। যদি আপনি বলেন, তবে আপনাকে লইয়া আমরা কলিকাতা যাইতে ইচ্ছা করি। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, এখন শরীরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, তাহা কিছুই এখানে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল; এ অবস্থায় কি করিয়া যাই? আমি বলিলাম, সেই জন্যই ত আপনাকে লইয়া যাইতে চাই। বিশেষতঃ এবার বর্ষার পুর্ব্বে আর একটী মাত্র স্পেশেল ট্রেন আছে, রেল কর্ত্তৃপক্ষ নোটীশ দিয়াছে তাহারও অধিক বিলম্ব নাই। সেটীতে যাইতে না পারিলে বর্ষার পূর্ব্বে আর ট্রেনে যাওয়া হইবে না। পুনরায় অগ্রহায়ণ মাসে জল শুকাইলে তবে ট্রেনে যাওয়া যাইতে পারে; কারণ, তখনও ট্রেনের রাস্তা কলিকাতা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। মাঠের মধ্য দিয়া রেলে তখন কোলাঘাট পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত। তাহাও বর্ষার সময় নয়। তৎপর ষ্টীমারযোগে কলিকাতা আরমানি ঘাট যাইয়া নামিতে হইত।

আমি তাঁহাকে এই সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম, আপনার ইচ্ছা হইলে গঙ্গা বা অন্য যে কোন নদীতে বোটে থাকিতে পারিবেন; অথবা অভিপ্রায় হইলে একবারে হ্যারিশন রোডের বাসায় গিয়াও অবস্থিত করিতে পারেন। তিনি আমার এই সকল কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন, আমার শরীর যে দুর্ব্বল, কি করিয়া যাই? আমি তাঁহাকে বলিলাম, সেই জন্যইত আপনাকে লইয়া যাইতে এত আগ্রহ করি; কেন না, এখানে আপনার আহারের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু কিছুই পাওয়া যায় না। আপনি বলিলে আমি হরিবল্লভ বাবুকে বলিয়া তাঁহার গাড়ীখানা আনিয়া

এখান হইতে সে গাড়ীতে আপনাকে প্ল্যাটফরমে লইয়া গিয়া রেল গাড়ীতে বসাইয়া দিব। পূর্ব্বে কেহ কোলাঘাট যাইয়া একখানা গাড়ী বা পাল্কী যোগাড় করিয়া রাখিলে তাহাতে করিয়া ষ্টীমারে উঠাইলেই নিশ্চিন্ত। তৎপর কলিকাতা পৌঁছিয়া আরমানিঘাট হইতে একখান গাড়ী করিয়া আপনাকে লইয়া বাসায় যাইতে পারিব। আর আমি ভরসা করি, শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বাবু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গাড়ীখানা দিবেন এবং আমরা যদি অন্য কোন সাহায্য তাঁহার নিকটে পাইতে ইচ্ছা করি, তাহাও তিনি আনন্দের সহিত করিবেন। তখন তিনি বলিলেন, এখানে ঋণ থাকিতে আমি কি করিয়া যাই? আমি বলিলাম, নানা স্থান হইতে যে রূপ টেলিগ্রাফ্ ও পত্রাদি আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই ঋণপরিশোধ হইবে। আপনি ইচ্ছা করিলে শ্রীযুক্ত জগৎ বাবু, কিশোরী বাবু ও শশীবাবু প্রভৃতিকে ঋণপরিশোধের জন্য পাওনাদার-গণকে মোকাবিলা করিয়া দিলে তাঁহারা ইহাতে কোন আপত্তি করিবেন না। আর আমাদের মধ্যে আপনি যাঁহাদিগকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই আপনার সঙ্গে যাইবেন, অবশিষ্ট সকলে এখানে থাকিয়া ঋণপরিশোধ হইলে যাইবেন। তিনি তথাপি বলিলেন, ঋণ থাকিতে আমি কেমন করিয়া যাইব? আর পাওনাদারগণই বা কি মনে করিবে? আপনাকে আমি বলি যে ঋণ পরিশোধ হইলে আমি আর এক দিনও থাকিব না। তাঁহার এই কথায় বুঝিলাম, এই স্পেশেল ট্রেনে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইল। তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপরে আমি অধিক আর পীড়াপীড়ি কি করিব? নিরাশ হইয়া ভগ্ন মনে নিরস্ত হইলাম।

অতঃপর একদিন রাত্রিতে পাণ্ডা হরেকৃষ্ণ খুটিয়া একজনকে দুর্গামূর্ত্তি সাজাইয়া অতি সুন্দর সাজ সজ্জা করতঃ গোস্বামী মহাশয়কে দেখাইতে লইয়া আসেন। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় থাকিয়া দুর্গা দেবী বাদ্যের সহিত তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বারেন্দায় দাঁড়াইয়া তাহা

দর্শন করিতেছিলেন। দুর্গাদেবীকে বলিলেন, মা আমার এই বিষের জালাটা নিবারণ করিয়া দেও। তাহাদিগকে দশ টাকা দিয়া বিদায় করিলেন। ইহা কি দেহত্যাগের সূচনা করিলেন? ইহার অবশ্য গূঢ় অভিপ্রায় আছে, কেন না তিনি কখনও কাম্য প্রার্থনা করিতেন না।

একদিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন আপনার শরীরের অবস্থা কেমন? তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, হাঁ, এখন গতিটা ফিরেছে; রক্তে আছে, এখানেই শেষ। আমি বলিলাম, তারপর কি? তিনি বলিলেন, তারপর মাংসে, তৎপর অস্থিতে; তাহা হইলে সে বড় ক্লেশ। দেহ যে আর রক্ষা হইবে না প্রকারান্তরে সে কথা তিনি বলিলেন, কিন্তু উপস্থিত আমরা সকলেই এ কথা এইরূপ বুঝিলাম যে, এখানে অর্থাৎ এই রক্তে থাকিতেই সকল আপদ বিপদ ঘুচিয়া গেল, আর মাংসে অস্থিতে যাইবে না। এখানেই ক্লেশের নিবৃত্তি অর্থাৎ বিনাশ হইয়া শান্তি হইবে। হায়! আমাদের আশা আকাশকুসুমের মত অলীক হইয়া গেল। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। পরে আমি মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রভৃতিকে আমার উপরোক্ত ধারণার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারাও আমারই মত বুঝিয়াছিলেন বলিলেন। এইরূপ আরও কয়েকটী ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছি, যদিও ঠাকুরের কথা সাদাসিদা, তথাপি তিনি যাহা ইচ্ছা করিতেন না, তাহা সহজ কথা হইলেও আমরা তাহার প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে পারিতাম না। তিনি দেহ রাখিবার পূর্ব্বে আমরা যেন কেহ তাহা না বুঝি, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয়। পুরীযাত্রাকালে চাঁদপালের ঘাটে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, মনোরঞ্জন, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার যেন শ্রীক্ষেত্রধামপ্রাপ্তি হয়। এত সহজ মোটা কথা; কিন্তু আমরা তাহা তখন গ্রহণ করিতে পারি নাই; বিপরীত ভাবেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। একদিন রাত্রিতে যোগজীবনকে বলিলেন, যোগজীবন, মার কথাই সত্য হইল। তিনি পুরী আসিলে আর

ফিরিবেন না, ইহাই তাঁহার মাতার ধারণা ছিল। যোগজীবন ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বলিলে? তখন তিনি এ কথা সেকথা পাঁচ কথা পাড়িয়া যোগজীবনকে ভুলাইয়া দিলেন। যোগজীবন তাঁহার নিকটেই রাত্রিতে শয়ন করিতেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সকল দেখিয়া মনে হয়, ঠাকুর এখানেই দেহ রাখিবেন বলিয়াই যেন জানিয়া শুনিয়া আসিয়াছিলেন; কেননা, কিছুতেই তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিলাম না।

একদিন গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণকে বলিলেন, "আমিত তোমাদের হাতে বিক্রীত, তোমরা ইচ্ছা করিলে রাখিতে পার, ইচ্ছা হইলে বিদায় দিতে পার।" এই কথা বলিবার হেতুও আছে বলিয়া মনে হয়। বিষপ্রয়োগে যখন তাঁহার দেহ অবসন্ন ও ভগ্নপ্রায়, তখন আমাদের একজন গুরুভাই ৺ জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ঠাকুর, এখন শীঘ্র শীঘ্র ইঁহাকে (গোস্বামীমহাশয়কে) লইয়া যাও।" তথাহইতে আসিয়া ইনিই একথা আমাকে ও মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় যেন বজ্রাহত হইল। তখন মনের ক্লেশে বলিয়া উঠিলাম,—

'ত্রিশকোটি পরশমণি তুচ্ছ গণি যাঁর দয়ায়।
এমন প্রভু গুননিধি তাঁকে (তুই) বিদায় দিলি কোন হিয়ায়।"

একদিন শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "আমি যে আসনে বসিয়া থাকি আমার কি কোন কর্ম্ম আছে? আমি কেবল তোমাদের জন্যই বসিয়া থাকি। তোমাদের ভার একজন লইয়াছেন, তোমরা আনন্দ কর। তোমাদের আনন্দ দেখিলেই আমার আনন্দ। তোমাদের মধ্যে যে ঝগড়া কলহ হয়, তাহা আমার পক্ষে বিষজ্বালা অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক। আমি তোমাদের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি, তোমরা ইচ্ছা হইলে আমাকে রাখিতে পার, না হয় বিদায় দিতে পার।" ক্রন্দন করিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিলেন "তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।" গুরুভ্রাতাটীর পূর্ব্বোক্ত বিদায়-

প্রার্থনার সহিত এ কথার কোন যোগ আছে কিনা পাঠক বিবেচনা করিবেন। আরও এক কথা এই যে, এই সময় কয়েকটী গুরুভাই গোস্বামী প্রভুর সেবার দিকে মনোযোগ না দিয়া পরস্পর বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা ও কলহ করিতেন, তাহাতে আশ্রমে অত্যন্ত অশান্তি হইত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, শান্তির প্রস্রবণের নিকট থাকিয়াও হিংসাদ্বেষের বহ্নির জ্বালা ইহাঁরা ভোগ করিতেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্!

এই সময় শ্রীমদ্‌ঈশ্বরপুরী গোঁসাই কায়স্থবংশোদ্ভব বলিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু এই মত সমর্থন করিয়া প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নিজকে "শাস্ত্র ও সদাচাররক্ষাকারী সর্ব্বসজ্জনগণের দাসানুদাস" লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অভিপ্রায় ও মত স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

পুরীতে গোস্বামী মহাশয়ের দেহ রাখিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে একটী শিষ্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি দেহ রাখিলে আমরা কি লইয়া থাকিব?" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ! এই ক্লেদময় অনিত্য দেহের প্রতি তোমাদের এত আসক্তি কেন? একদিন ত দেহ নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে; তবে তার জন্য আবার ক্ষোভ কি? বরং দেহত্যাগ হইলে কাজ করিবার আরও সুবিধা হইবে।"

পুরীতে গোস্বামী মহাশয়ের অসুস্থাবস্থায় তাঁহার কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী তাহাঁর সমীপে বসিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি দেহ রাখিলে আমার কি উপায় হইবে? আমার কয়েকটি ছেলে মেয়ে হইয়াছে। আমাকে এমন লোকের হাতে দিয়াছ যে, তিনি উপায় করিয়া আমাদিগের ভরণপোষণ করিবেন সে আশা নাই।" গোস্বামী মহাশয় তাহাঁর কথা শুনিয়া বলিলেন,

"শান্তি, তুই ভাবনা করিস্ কেন? আমি তোকে একটা কথা বলি, তুই তাই করিস্; তুই কখনও মিথ্যা কথা বলিস্ না এবং কিছু সঞ্চয় করিস্ না। আমি বলিতেছি তুই শত শত লোককে খাওয়াইতে পারিবি।"

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয় লিখিয়াছেন:—

ইংরেজী ১৮৯৯ সালের মে মাসে বিদ্যালয়সমূহ গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইলে শ্রীমদ্‌গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি আমাদের নিবাসগ্রাম হইতে পলাইয়া আসি ও পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত শ্রীনীলাচলক্ষেত্র পলায়ন করি। ইহার প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন স্কুলে অধ্যয়ন করিতাম, তখন পরম পূজনীয় হরিচরণ রায় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট এক দিবস যোগসাধনপ্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের অভাবনীয়রূপে দীক্ষাপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ করি। গোস্বামী মহাশয়ের নাম শ্রবণ মাত্রেই সর্ব্বশরীর এরূপ রোমাঞ্চিত হইল যেন প্রতি রোমকূপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষদর্শনলাভের পরেও দুই একবার তদীয় অযাচিত কৃপাবলে স্বপ্নে যখন দর্শন পাইয়াছি, তখনও সেই শান্তি-নিকেতন শ্রীচরণস্পর্শে উক্তরূপ অভাবনীয় ফললাভ করিয়াছি; কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রথম নামশ্রবণ অবধি দশ বার বৎসর যাবৎ তদীয় নাম বা লীলা শ্রবণ বা পঠন এ অধমের দগ্ধ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। মনুষ্যের দুর্দ্দৈব কি এতই প্রবল যে, যাঁহার প্রথম নামশ্রবণে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, যিনি বঙ্গের শত শত নরনারীর হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়া মায়ামোহভবপারের ভার লইতেছিলেন, যিনি বঙ্গের নগরে নগরে প্রেমের ঠাকুর গৌর নিতাই সীতানাথের সাক্ষাৎ আবির্ভাব করাইয়া প্রেমের বন্যায় জীবসমূহকে ভাসাইতেছিলেন, দশ বার বৎসর যাবৎ

তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা এ অধমের শ্রবণপথে পতিত হয় নাই। ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অধ্যয়নার্থ যখন কলিকাতাপ্রবাস করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৯০।৯১ সালে গোস্বামীজীউ মধ্যে মধ্যে কলিকাতা নগরীতে আসিয়া সংকীর্ত্তনানন্দে ভক্তবৃন্দকে উন্মত্ত করিতেছিলেন ও আমার সহাধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপ্রমথনাথবসুপ্রমুখ কত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি তদীয় কৃপালাভে স্বীয় স্বীয় মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে-ছিলেন, তখন ঘুণাক্ষরেও তাঁহার নাম বা লীলা আমার শ্রবণবিবরে ক্ষণ কালের জন্যও উদয় হয় নাই। পরিশেষে অধ্যয়নার্থ কলিকাতাপ্রবাসী অনুজদ্বয়ের মুখে যখন তদীয় লীলাকথা শ্রবণ করিলাম, তখন হইতে তদীয় শ্রীচরণদর্শনাভিলাষ জাগিয়া উঠিল ও ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে আমাকে একান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

ঘোর রাত্রিতে আমাদের পল্লীগৃহের পরিবারবর্গ নিদ্রাভিভূত হইলে একাকী নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসিলাম এবং সমস্ত শেষ রাত্রি ও পর দিবস হাঁটিয়া ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় চারিটার সময় মেদিনীপুরে আসিয়া স্নানাহার কোনক্রমে সম্পাদন করিয়া লইলাম। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত যুক্তি স্থির করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সান্ধ্য আরাত্রিক, ভোগ ও শয়নকার্য্য সম্পন্ন হইলেই উভয়ে কাহাকেও না বলিয়া শ্রীমদ্গোস্বামিপাদের শ্রীপদকমল স্মরণ করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। কংসাবতী নদী পার হইয়া খড়্গপুরাভিমুখে সানন্দ-পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলাম। সেই রাত্রির আনন্দ স্মরণ করিলে অদ্যাপি হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। খড়্গপুর হইতে তখনও প্যাসেঞ্জার গাড়ীর যাতায়াত বা টিকিট দেওয়া আরম্ভ হয় নাই। কয়েকটী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রেলওয়ে ব্রিজ্ প্রস্তুত করণের জন্য লৌহাদি সরঞ্জাম লইয়া একটা মালগাড়ী রাত্রি ২টার সময় ছাড়িবে। একটী কর্ম্মচারী অনুগ্রহ

করিয়া আমাদিগকে তাঁহার আফিসের কঙ্করময় মেজেতে শুইয়া থাকিতে দিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় আসিলে গার্ডসাহেবকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া সাহেবের সহিত তাঁহার কামরাতে উঠিলাম। গার্ড সাহেব কটকে আমাদিগকে নামাইয়া দিলেন। কটকে একরাত্রি কোনরূপে কাটাইয়া খুরদা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া তথায় টিকিট করিয়া পুরীর গাড়ীতে উঠিলাম এবং বেলা প্রায় ১০টার সময় শ্রীপুরীধামে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়াই গোস্বামীজীউর শ্রীচরণ দর্শন ও অভিবাদন পূর্ব্বক উপবেশন করিবামাত্র শুনিলাম, কোন দুর্বৃত্তকর্ত্তৃক গোস্বামী প্রভুর শরীরে বিষপ্রয়োগ করা হইয়াছে। যদিও অতি অলৌকিক ভাবে দেহখানি মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষিত হইয়াছে, তথাপি দেখিলেই বোধ হয়, যেন কোন বিশেষ কারণবশতঃ সেই মৃতদেহখানি জীবিতবৎ বসিয়া আছেন মাত্র। উক্ত বিশেষ কারণ এই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞাক্রমে প্রভুপাদ যে মহাদানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার ঋণ তখনও শোধ হয় নাই। প্রত্যহ গোস্বামী প্রভু, যোগজীবন গোস্বামী প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ঋণশোধের আর কত বাকী?" যেন ঋণশোধ হইলেই একটা ঘটনা ঘটিবে। কেহ ভাবিতেছেন, ঋণশোধ হইলেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন; কারণ, পুরীধামে ইচ্ছানুরূপ মেওয়াফল পাওয়া যাইতেছে না, যদ্দ্বারা সেই মৃতকল্প শরীর রক্ষিত হইতে পারে; কেহ বা অন্যরূপ ভাবিতেছেন।

এক দিন সমুদ্রস্নানান্তে পাকাল প্রসাদভোজন করিয়া আমরা বসিয়াছি, কোন অর্থার্থী ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুপাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার দানযজ্ঞের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণটি বলিলেন, "মহাদাতা বলিয়া জটিয়া বাবার নাম পৃথ্বীমণ্ডলে জাহির থাকিবে।" গোস্বামিপাদ বলিলেন, "জটিয়া বাবার নাম পৃথিবী হইতে লোপ প্রাপ্ত হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যাঁহার আজ্ঞাক্রমে এই দানযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহার নাম পৃথিবীতলে

উজ্জলাক্ষরে জাহির থাকুক। জটিয়া বাবার কৌপীন সম্বল, কাণা কড়ি সম্বল নাই। ঠাকুর যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, জটিয়া বাবা তাহাই করিয়াছে। ঠাকুর যদি বলিতেন, 'সমুদ্রের বালুকার নীচ হইতে অথবা তোমার আসনের নীচ হইতে অর্থ বাহির করিয়া কোটী বস্ত্র দান কর;' জটিয়া বাবা তাহাই করিত।"

এক দিন পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন ও ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা আমার সাধনপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া প্রভুপাদের দালানে দূরে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছি—আমার কি সাধন মিলিবে? আমি ত সাধন পাইবার উপযুক্ত নহি, তবে যদি কৃপা করিয়া দেন। কিরূপ ব্যক্তি সাধন পাইবার উপযুক্ত? অমনি ধ্যানমগ্নাবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ জাগিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটীর ভাব অতি ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়া আবার ধ্যানযোগে নিত্যলোকে ডুবিলেন। বলিলেন,—

"ভগবান্ বলিয়াছেন, যাঁহারা কোনরূপে তাঁহার লীলাকথাদি শুনিতে পাইলে তাহাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েন ও আনন্দানুভব করেন, যাঁহাদের একেবারে সংসারে বৈরাগ্য আসে নাই, অথচ সংসারের কোন বিষয়ে বিশেষ আসক্তও নহেন, তাঁহারাই এই সাধন পাইবার যোগ্য, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

থিয়োজফিষ্টদিগের পুস্তকপাঠে আমার ধারণা ছিল চেলা হইবার উপযোগী গুণ আমার একটীও নাই। গোস্বামী প্রভুপাদের উপরি-উক্ত কথা শ্রবণে কিঞ্চিৎ আশা জন্মিল, কৃপা হইলে পাইলেও পাইতে পারি; কিন্তু রেবতী বাবু ও ক্ষেত্রবাবুর মুখে শুনিলাম প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "শরীরের বর্ত্তমান অবস্থাতে কাহাকেও সাধন দিতে নাই, পরে সাক্ষাৎ হইলেই পাইবেন।" তখন ভাবিলাম, আমার মঙ্গল কিসে হইবে, তাহা আমা অপেক্ষা সদ্গুরুদেবই বিশেষরূপ জানেন; কলিকাতা যাইবার কথা হইতেছে, কলিকাতাতে গিয়া

শরীর সুস্থ হইলেই আবার প্রার্থী হইব। কিন্তু হা দুর্ভাগ্য! আমরা পুরী হইতে চলিয়া আসিবার দিন কয়েক পরেই গোস্বামিপাদ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ধামে চলিয়া গেলেন। আহা! কত জন্ম পরে সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে, যাহাতে সেই শ্রীচরণদর্শন পাইয়া তাঁহার অলৌকিক কৃপাকণা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইব।

এই সময় গোস্বামী প্রভুর সহিত প্রায় ৩০ জন শিষ্য ছিলেন। নীলমণি বর্ম্মণের বাড়ীতে স্থানের অকুলান হওয়ায় পার্শ্বের আর একটী বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। সেই বাড়ীতে অন্যান্য শিষ্যবর্গের সহিত আমাদের দুইজনের বাসা দেওয়া হইল। ইহাঁরা সকলে পূর্ব্বাহ্নে পাকাল প্রসাদ ও অপরাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ আসিলে ভোজন করিতেন ও রাত্রিতে কিছু আহার করিতেন না। কাহারও আবশ্যক হইলে আম রম্ভা আদি ফল লইয়া রাখিতেন। প্রথম দিন আমরা এ সকল খবর রাখি নাই ও ফল চাহিয়া লইয়া রাখি নাই। রাত্রিতে আমার ক্ষুধার উদ্রেক হইল; কিন্তু তাহা কাহাকেও বলিলাম না। কিন্তু অন্তর্যামী ও শরণাগতপালক গোস্বামিপাদের কিছুই অবিদিত রহিল না। প্রাতঃকালে ফলাদিভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত যাঁহারা, তাঁহারা নিকটে আসিলে প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে ভৎ সনা করিয়া বলিলেন, "মেদিনীপুর হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা এখানকার নিয়ম জানেন না; রাত্রিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ফল দাও নাই কেন? ইহা তোমাদের ভারি অন্যায় হইয়াছে। তাঁহাদের আবশ্যক হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া ফল দিও।" আমরা যে কয় দিন পুরীধামে ছিলাম, গোস্বামী প্রভুর শিষ্য রেবতী নাথ আচার্য্য বা অপর কেহ সঙ্গে থাকায় প্রায়ই বিনা ব্যয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসিতাম। একদিন আমরা প্রভুপাদের দালানে বসিয়া আছি, সহসা তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শ্রীমূর্ত্তির সেবকেরা দর্শকদিগের নিকট কিছু পাইবার আশা রাখেন; সুতরাং বিনা পয়সায় দর্শন করা

উচিত নহে, সাধ্য মত দু চারি পয়সা দেওয়া ভাল।" পরে আমরা সেইরূপ করিতে লাগিলাম।

আর এক দিন বলিলেন, "ধামে আসিলে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয় ও শ্রীপ্রসাদান্নে পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ড দিতে হয়। পিতৃপুরুষেরা আশা করিয়া থাকেন, কবে তাঁহাদের অধস্তন বংশীয়েরা আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদান্নে পিণ্ড প্রদান করিবে।" আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রেই আমরা পরদিন মুণ্ডিতকেশ হইয়া শ্রীপ্রসাদান্ন লইয়া গিয়া স্বর্গদ্বার, চক্রতীর্থ প্রভৃতি যে কয়েক ক্ষেত্রে পিণ্ডাদি অর্পণ করিতে হয়, সেই সেই স্থানে গিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম।

সেই অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও সঙ্গ ছাড়িয়া আসিবার আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বাটী হইতে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে তলব যাওয়ায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। অপরাহ্ণে ৩ টার সময় রেলগাড়ী। প্রাতঃকালে গোস্বামিপাদকে জানাইয়া অনুমতি লইয়া রাখিয়াছি। ২॥ টার সময় তাড়াতাড়ি শ্রীপাদান্তিকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখি প্রভুপাদ গভীর ধ্যানমগ্ন। প্রণাম করিতেও পাইতেছি না, যাইতেও পারিতেছি না; ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় ৪।৫ মিনিট বসিলাম। অনেকে বলিলেন, আর সময় নাই, শীঘ্র যান, শীঘ্র যান। এমন সময় হঠাৎ মুখ তুলিয়া প্রভুপাদ দক্ষিণ হস্ত বারম্বার হেলন করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, শীঘ্র চলিয়া যাও। প্রণাম করিয়া আমরা ভগ্ন হৃদয়ে বহির্গত হইলাম। অনেকে বলিতে লাগিলেন গাড়ী পাইবেন না; সুতরাং অতি দ্রুতপদে আমরা চলিতে লাগিলাম, কিন্তু স্বীয় স্বীয় পোটলা লইয়া চলিতে পারি না; এমন সময় একটী বালক মুটিয়া আসিয়া দরদস্তুর না করিয়াই আমাদের অপেক্ষাও ব্যস্ত হইয়া "গাঁঠরি মোতে দিয়, গাঁঠরি মোতে দিয়" বলিয়া মোট দুটী আমাদের স্কন্ধ হইতে লইয়া ছুটিল। আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। ষ্টেশনে পৌঁছিবা মাত্র টিকিট মাষ্টার মহাশয় দুইটী টিকিট

ছেনী করিয়া লউন লউন বলিয়া আগবাড়াইয়া আমাদিগকে টিকিট দিলেন এবং আমরা গাড়ীর প্ল্যাট্‌ফর্‌মে পা দেওয়া মাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

প্রভুপাদের দেহের জন্য দুঃখ করিতে করিতে এবং তাঁহার সম্মুখে রুটীন মত পাঠ, সংকীর্ত্তন, ভগবদালোচনা, পক্ষী, বানর, কুক্কুর ও গোষণ্ড প্রভৃতিকে অন্নদান এবং প্রভুর পশ্চাতে প্রসাদভোজনাদির আনন্দ স্মরণ করিতে করিতে দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

বিষপ্রয়োগ জন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কাহাকেও পাদস্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না, সুতরাং সে সৌভাগ্যে আমি বঞ্চিত ছিলাম; তথাপি কেবল দর্শন ও প্রণামমাত্রে অন্তরে এরূপ কোন বস্তু দিয়াছিলেন, যাহা পাইয়া এ অধম কয়েক মাস ধন্য হইয়াই ছিল। নিষ্ঠাপূর্ব্বক সেই বস্তু ধ্যান করিতে পারিলে বোধ হয় আমার সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইত, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ না জানি কোন্ অপরাধে তাহা হারাইয়া এ পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি। আর কত জন্ম এরূপ বেড়াইব তিনিই জানেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অন্তর্ধান।

প্রভুর অন্তর্ধানের কিছু পূর্ব্বে রেবতী বাবু পুরীতে আসিয়াছিলেন। তিনি একদিন কীর্ত্তন করিলেন। 'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর' এই গানটী ধরিলেন। গোঁসাই ভাবে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই শেষ নৃত্য। ইহার পর আর তিনি নৃত্য করেন নাই। নৃত্যকালে গোঁসাই কোমর হইতে গৈরিক কটিবেষ্টনের এক ফালি রেবতী বাবুর দিকে ছুড়িয়া দিলেন, তাহা তাঁহার গলায় মালার ন্যায় পড়িয়া গেল। পরে বলিলেন—যিনি গান কচ্ছেন, তাঁকে একজোড়া লুই আনিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালিত হইল। এক জোড়া লুই আনিয়া রেবতী বাবুকে প্রদান করা হইল।

গোঁসাইর ঘরে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করা হইত। একদিন রেবতী বাবু চরিতামৃত পাঠ করিলেন। ঘরে কুলদা ব্রহ্মচারীও ছিলেন। এই শেষ দিন, আর তাঁহার ঘরে গ্রন্থ পাঠ হয় নাই। ইহার তৃতীয় দিবসে তিনি লীলা সংবরণ করেন। ঐ দিবস পাঠের বিষয় ছিল 'ছোট হরিদাস বর্জ্জন।' যখন পাঠ হইতেছিল, গোঁসাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। পাঠক মনে করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার পাঠ শুনিতেছেন না; কিন্তু যেই অধ্যায়টী শেষ হইল, অমনি গোঁসাই পাঠকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আবার ঐ অধ্যায়টী পাঠ কর। তখন পুনর্ব্বার অধ্যায়টী পাঠ করা হইল। এক অধ্যায়কে দুইবার পাঠ করিতে তিনি আর কখনও বলেন নাই।

রেবতী বাবু ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, এই যে দুইবার পাঠ করিতে বলিলেন, ইহা কি তোমার জন্য, না, আমার জন্য ?

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তৃতীয় দিবসে দেখা গেল, ঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়া প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইল। ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় হোরমিলার কোম্পানির একখানা ষ্টীমার ভাড়া করিয়া কটক হইতে ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতা যাওয়ার জন্য কথা বার্ত্তা করিয়াছিলেন। আঠার শত টাকা ভাড়া স্থির হইয়াছিল। সেই দিন শ্রীযুক্ত মণি বাবুর পত্রে ষ্টীমার ভাড়া সাব্যস্ত হইয়াছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ (পান্নালাল) দ্বারা প্রাতে টেলিগ্রাফে মণিবাবুর নিকটে আঠার শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। আমরা সমুদ্রস্নানে গেলাম। ঠাকুর আমাকে বলিলেন, আপনি দোকানদারদের কাহারও কিছু পাওনা আছে কিনা একবার অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া আমাকে বলিবেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, তাহারা কি আর পাওনা থাকিতে টাকা বুঝিয়া পড়িয়া লইয়াছে? ঠাকুর বলিলেন, কি জানি, যদি ভূলে কাহারও কিছু পাওনা থাকে, তবে আমরা এখান হইতে চলিয়া গেলে উহা তাহারা কাহার নিকটে পাইবে? একবার জানা ভাল। সমুদ্রস্নান করিয়া আসিবার সময় আমি দোকানদারদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহাদের আর কিছু পাওনা নাই। আমি বাসায় যাইয়া ঠাকুরকে জানাইলাম। পান্নাও সেই সময় টেলিগ্রাম করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে জানাইল। ঠাকুর আমাদের উভয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি পাখাল প্রসাদ খাইতে গজন্নাথবল্লভ মঠে বাসায় গেলাম।

এই দিবস প্রাতে শ্রীযুক্তা বুড়াঠাকুরাণী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বিজয়কৃষ্ণ! আজ তোমার জন্য কি রান্না করিব? উত্তরে তিনি বলিলেন, "আপনার যা ইচ্ছা, তাই রান্না করুন।" তখন বুড়াঠাকুরাণী বলিলেন, "তবু, তোমার কি খাইতে ইচ্ছা হয়?" গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। বুড়াঠাকুরাণী পীড়াপীড়ি করাতে

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "দেখুন, আজ দেহ টিকে কিনা ?" ইহা বলিয়াই সারদাকে দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন। বুড়াঠাকুরাণী একথা শুনিয়াও বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ইহাও ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুরের অসুখের সময় বুড়াঠাকুরাণী প্রত্যহ তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাহাতে কত অলৌকিক ঘটনাই ঘটিত। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, জগন্নাথ-দেব আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা আহার করিতেন। আমরা সাধারণ লোকে ইহা কি বুঝিব ?

সারদা বাবু গোঁসাইর ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার কিছু কাল পরে, তখন বেলা প্রায় ১০টা হইবে, এমন সময় ব্রহ্মচারী আমার নিকটে গিয়া বলিল, আপনি শীঘ্র আসিয়া দেখুন, গোঁসাইর কোন সাড়া শব্দ পাইতেছি না। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া তখনই ব্রহ্মচারীর সহিত চলিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যাইয়া দেখি, শ্রীযুক্ত রেবতী বাবু প্রভৃতি খোল করতাল লইয়া "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" এই গান তথায় বসিয়া করিতেছেন। ঠাকুর আসনে অচৈতন্যাবস্থায় বাম দিকের তাকিয়ার উপরে মস্তক হেলান দিয়া নিস্পন্দ ভাবে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে কি না তাহা বুঝা যায় না।

দ্বারভাঙ্গায় অবস্থিতিকালে পীড়ার সময়ে গোস্বামী মহাশয় আমাকে একবার বলিয়াছিলেন,—দেখুন, নবকুমার বাবু, আমার এই যে হার্টের পীড়া, ইহার জন্য আমার পকেটে রুমালে বান্ধা যে ঔষধের পুরিয়া থাকে, তাহা যথাসময়ে খাইতে না পারিলে শরীর এতই অসাড় ও অশক্ত হয় যে, উহা আর বাহির করিয়া খাইতে সামর্থ্য থাকে না। সেই জন্য আপনাকে বলিয়া রাখি, যদি কখনও আমার সেইরূপ অবস্থা দেখেন, তবে উহার এক পুরিয়া খাওয়াইয়া দিবেন, নচেৎ অত্যন্ত কষ্ট হইবে।

আমার তখন সেই কথা স্মরণ হওয়ায় আমি ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা

করিলাম, ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে কি? ব্রহ্মচারী বলিল, না, ঔষধ আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; অনেক ডাকাডাকি করিয়াও কোন প্রকার সাড়া শব্দ না পাইয়া উহা খাওয়াইতে পারি নাই। আমি তখন ঔষধ সেবন করাইতে ব্যস্ত হইলাম। ইতিমধ্যে কেহ কেহ সেই স্থানে তখন উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। শ্রীযুত রেবতী বাবু প্রভৃতিও খোল করতাল লইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের লইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমি নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া যোগজীবনকে লইয়া ঠাকুরের ঘরের বারেণ্ডায় যাইয়া তাঁহাকে বলিলাম; এই সময়ে ইহাঁরা কি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন? এখন ইহাঁকে ঔষধ খাওয়ান নিতান্ত প্রয়োজন। তুমি কীর্ত্তন থামাইয়া দাও। কিন্তু যোগজীবন সাহস করিল না। সে আমাকে থামাইয়া দিতে বলিল। আমি মহা বিপদ গণিলাম; এই সময়ে ইহাঁদিগকে বাধা দিতে গেলে হয়ত তুমুলকাণ্ড হইতে পারে; কি করি, ঘরে ও বাহিরে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক; একটুকু হাওয়া আসিবার সাধ্য নাই। লোকদিগকে বলিলেও তাঁহারা যাইতেছেন না; কি করা যায়? এমন সময়ে ঠাকুরের অসুখের সংবাদ পাইয়া মুন্‌সেফ্ শ্রীযুত কিশোরী বাবু অফিস বন্ধ করিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি বারেণ্ডায় আনিয়া বলিলাম, আপনি এখন এই কীর্ত্তন থামাইয়া দিন, ঠাকুরকে ঔষধ খাওয়াইতে না পারিলে আর উপায় দেখি না। তিনি প্রাতঃকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থায়ই আছেন। ইহাঁরা এত কীর্ত্তন ও হরিনাম করিতেছেন, তথাপি কোন সাড়া শব্দ নাই। আপনি শীঘ্র কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিন। তিনি, আচ্ছা, বলিয়া কীর্ত্তনের নিকটে যাইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে জগবন্ধু বাবু ঔষধ খাওয়াইলেন। অল্পক্ষণ পরে চক্ষুঃ মেলিয়া বলিলেন, ঘরের লোকদিগকে যাইতে বলুন। তখন আমি সকলকে বাহির করিয়া দিলাম। বাহিরের লোকদিগকেও যাইতে বলিলাম, তাহারাও গেল। মাত্র ব্রহ্মচারী, সারদা ও আমি ঘরে থাকিলাম।

সে দিবস ডেঃ মাঃ শশিমোহন দত্ত মহাশয় আমাদিগকে তাঁহার বাসায় মহাপ্রসাদ পাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। আমরা গোস্বামী মহাশয়কে কিছু সুস্থ মনে করিয়া মহাপ্রসাদ পাইতে শশীবাবুর বাসায় গেলাম। তথা হইতে মহাপ্রসাদ পাইয়া আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। বাসায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে দেখিলাম, সেই পূর্ব্ববৎ অবস্থায়ই আসনে বসিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মচারী আমাকে ও মহেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনারা এখন নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া ঘুমান। তিনি আর একবার নিজেই ঔষধ চাহিয়া খাইয়াছেন। ইহার পরে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। আর কোন ভাবনা নাই।" আমি এবং মহেন্দ্রবাবু ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া সানন্দে বাসায় গিয়া সমস্ত দিনের ক্লান্তি ও দুর্ভাবনা হইতে শান্তিলাভ করতঃ জগন্নাথবল্লভ মঠের উপর তলার ঘরে যাইয়া সুখে ঘুমাইলাম।

ইতিপূর্ব্বে তিনি শৌচে যাবেন বলিয়া সারদাকে বলিলেন। সারদা আসনের নিকটের লাঠী ধরিল। তিনি তাহা ভর করিয়া দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং সারদাকে বলিলেন, আমাকে আসনের নিকটে ঐ তুলসীর টবের সম্মুখে কাপড় পাতিয়া দেও। সারদা তাহা না দিয়া বলিল, আপনি আসনে চলুন। গোস্বামী মহাশয় তখন সারদাকে ধমক দিয়া বলিলেন, আমি যা বলি, তুমি তাই কর। শ্রীযুক্ত জগবন্ধুবাবু তখন সেই স্থানে শতরঞ্চে বসিয়াছিলেন। তিনিও সারদাকে বলিলেন, উনি যা বলেন, তাই করনা? তবু সারদা সঙ্কুচিত হইয়া ও ভয়ে তাহা করিতে পারিতেছে না। পরে গোস্বামী মহাশয় উপবিষ্ট অবস্থাতেই দরজার নিকট হইতে আসিয়া তুলসী গাছ মস্তকের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, আমাকে এইখানে একখান কাপড় পাতিয়া দাও। তখন সারদা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি তাহাই করিল, আসন হইতে তাকিয়া আনিয়া দিল, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া বসিলেন।

এক সময়ে ব্রহ্মচারী প্রভৃতি গোস্বামী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমরা বড় ভয় পাই। আপনি অনেক সময় আসনে বসিয়া থাকেন, অথচ কোন সাড়াশব্দ নাই ও কথা বলিলে কিছুই উত্তর পাই না। আপনি ধ্যানস্থ থাকেন, কি দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র যান, অথবা দেহই ত্যাগ করিয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারি না।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, তোমরা নিশ্চিত জানিও যে, যতক্ষণ আসনে থাকি, ততক্ষণ দেহত্যাগ হইবে না। আর ইহাও জানিও যে, আমি দেহ রাখিলে আমার দেহ দেখিয়া কাহারও কোন সন্দেহ হইবে না যে, আমি দেহ ছাড়ি নাই। এই সব কথা স্মরণ হওয়ায় সারদা তাঁহাকে আসনে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। আমাদের অদৃষ্টে কিন্তু তাহা ঘটিল না।

রাত্রি ৮৷৹টা কি ৯টার সময় ব্রহ্মচারী একটি হ্যারিকেন সহ আসিয়া আমাদিগকে ডাকিতে লাগিল। আমরা তখন ঘুমে অচেতন, কাজেই ব্রহ্মচারীর ডাক শুনিতে পাই নাই। ব্রহ্মচারী লণ্ঠনসহ সিড়ী দিয়া উপরে উঠিয়া আমাদের গাত্রে হস্ত দিয়া ডাকিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করিল। ব্রহ্মচারী বলিল, শীঘ্র আসুন, গোস্বামী মহাশয়কে কেমন কেমন দেখিতেছি। আমি চক্ষুঃ মেলিয়া অন্ধকার দেখিলাম। নৌকায় নিদ্রিত অবস্থায় নৌকা ডুবি হইলে আরোহী যেমন দিশাহারা হইয়া চতুর্দ্দিকই জলময় দেখে, কোন্‌দিক্ দিয়া গেলে তীর পাইবে, তাহা যেমন সে তখন বুঝিতে পারে না, আমারও তদ্রূপ অবস্থা হইল। পরে তথায় যাইয়া যাহা দেখিলাম, দেখিয়া চক্ষুঃ স্থির হইল, সে অবস্থায় কোন বাক্য সরে না।

ইতিমধ্যে শ্রীযুত জগবন্ধু মৈত্র মহাশয় গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্ত দিন আপনার চা খাওয়া হয় নাই, একটু চা করিয়া দিব কি? তিনি বলিলেন, তা দিতে পার। গোস্বামী মহাশয় ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাণ্ডা জিনিষ কিছু আছে? ব্রহ্মচারী বলিলেন, পাকালের

জল, ডাবের জল ও সরবৎ দিতে পারি। তিনি বলিলেন, "পাকালের জল দাও।" তাহাই আনিয়া দেওয়া হইল। তিনি উহা কিঞ্চিৎ পান করিলেন। জগবন্ধুবাবু চা করিতে গেলেন। মুন্সেফ শ্রীযুত কিশোরীবাবু এমন সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, আপনিই যাইয়া চা করুন। তিনি তৎক্ষণাৎ চলিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চা কি ষ্ট্রং করিব, না, লাইট্ করিব? গোস্বামী মহাশয়, বলিলেন, মাঝামাঝি। ইহা শুনিয়া তিনি চা করিতে গেলেন।

মুন্সেফ বাবু খুব ভাল চা করিতে জানেন এবং একদিন চা প্রস্তুত করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে খাওয়াইবেন বলিয়া বাসনা ছিল। আজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত চা প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে অনুমতি করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু চা প্রস্তুত করিয়া নারিকেলের মালায় করিয়া লইয়া আসিলেন। ছোট পাথরের বাটীতে উঠাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দেওয়া হইল। তিনি এক টানে তাহা সেবন করিলেন, দ্বিতীয়বারে দেওয়াতেও তদ্রূপ করিলেন। তৃতীয়বারে আর গলাধঃকরণ হইল না, মস্তক অবনত করিয়া যেন কাহাকে প্রণাম করিতেছেন এই ভাব দেখা গেল। মৈত্রী, মুদিতা ও করুণার কমনীয় মূর্ত্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর যাঁহারা ভাগ্যবান্, কেবল তাঁহারাই তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারেন, সাধারণ লোকচক্ষুঃ সেই মাধুর্য্যমূর্ত্তিদর্শনের পরিতৃপ্তি ও পরমানন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইল।

অতঃপর ডাক্তার আনিবার জন্য লোক পাঠান হইল। তিনি আসিয়া বিশেষরূপে দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'দেখুন, আমরা সামান্য দেহ দেখিয়া থাকি; এ মহাপুরুষের দেহ, নিশ্চয় করিয়া আপনাদিগকে কিছু

বলিতে পারিলাম না। তবে একটী কথা আমি আপনাদিগকে বলি যে, আপনারা ১৮ ঘণ্টার পূর্ব্বে ইহাঁর দেহ কোনরূপ সৎকার করিবেন না।' আমরা সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইলাম। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ এমন সময় কলিকাতা হইতে এক ঝুড়ি ফল লইয়া আসিয়া উপস্থিত। এই ঘটনা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুঃ স্থির, আর কোন বাক্য সরে না। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে আসিয়াছেন। তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করা হইল; তিনি নিদারুণ ক্লেশে সমস্ত রাত্রি অনশনেই রহিলেন। আমি গোঁসাইর নাসিকার নিকট কর্ণ রাখিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কোন নিদর্শন পাইলাম না। তৎপরে বুকে কর্ণ রাখিয়া কিছুই টের পাইলাম না। যোগজীবন আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখিলেন? আমি বলিলাম, কি বলিব? যোগজীবন আমার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, য়্যাঁ, আমি বলিলাম মাথায় বুঝি আমাদের বজ্রাঘাতই হইল, হাতে ও পায়ে নাড়ী পাইলাম না।

একটু পরে আমি যোগজীবনকে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার থাকিবার ঘরে গেলাম। আমাকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি যাহা দেখিলাম—দেখিয়াই চক্ষুঃ স্থির হইল। আমি বলিলাম, হা রে, এ কি সর্ব্বনাশ! তুমি এ কি করিতেছ? যোগজীবনের ঘরে দেওয়ালের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটী কাঠ দেওয়া ছিল। যোগজীবন নিজের লেঙ্গটের কাপড় গলায় বাঁধিয়া সেই কাষ্ঠে তাহা বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আর কিছু বিলম্ব হইলে আর দেখা হইত না। যোগজীবন আমার হাত ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তখন তাহাকে বলিলাম, দেখ, পিতামাতা লইয়া কে চিরদিন সংসারে বাস করে? তুমিই এখন আমাদের সকলের সান্ত্বনা ও আশার স্থল, ইহাতে কি তোমার এমন কর্ম্ম

করা সাজে ? দেখ, আমারও বাপ মা ছিলেন ; তাঁহারাই বা এখন কোথায় ? এই বলিয়া আমি তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া আসিলাম। এই সময়ে উপস্থিত আমরা সকলে প্রভুর প্রসাদী চা এ জীবনে এই শেষবার পাইলাম।

আশায় আশায় রাত্রি অবসান হইল, কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। আমি, পণ্ডিত মহাশয় ও মহেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি নিরাশ মনে বসিয়া বসিয়া সৎকারের জন্য কি কি বস্তু প্রয়োজন, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলাম। ঘৃত, গুগগুল, চন্দন কাষ্ঠ, ধূপ ধূনা প্রভৃতি কি পরিমাণ প্রয়োজন ইত্যাদি। আশ্চর্য্য এই যে, গোস্বামী মহাশয় যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের সে সময়ে সকলেরই বিস্মৃতি হইল। তিনি তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ কলিকাতায় যোগজীবনের দ্বারা করাইয়াছিলেন। প্রেমসখীর (কুতুবুড়ীর) বিবাহে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যোগজীবনের দ্বারা করাইয়াছিলেন। তিনি নিজেও আমাদের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাহাও কাহারও মনে নাই। এমন সময় মুন্সেফ শ্রীযুত কিশোরী বাবু তথায় আসিয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন ; আমাদের পরামর্শের কথা শুনিতে পাইয়া তথা হইতে চলিয়া গিয়া যোগজীবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, যোগজীবন বাবু, গোস্বামী মহাশয় দেহ রাখিলে তাঁহার দেহ কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে কি তিনি আপনাকে কখনও কোন উপদেশ করিয়াছিলেন ? তখন যোগজীবন বলিয়া উঠিলেন, হাঁ ঠিক, প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, "দেখ যোগজীবন, আমি সন্ন্যাস লইয়াছি, আমি দেহ রাখিলে আমার দেহ সমাধিস্থ করিও, পোড়াইও না। এখন ইহা কাহাকেও বলিও না।" তৎপর আমিও তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন আপনার কথায় উহা আমার মনে হইল।

তখন শ্রীযুত মুন্সেফ বাবু আমাদের নিকটে আসিয়া ঐ সকল কথা বলিলেন, এবং আমাদিগকে বলিলেন আপনারা ও কি পরামর্শ করিতেছেন ?

আমাদের ভ্রম বিদূরিত হইল এবং তাঁহার সকল কথাই আমাদের মনে হইল। ঠাকুরের কি আশ্চর্য্য কার্য্যপ্রণালী! আমরা জানিয়া শুনিয়া বিস্মৃত হইয়া বিপথে চলিয়াছি, তাহারই সংশোধন জন্য, যিনি পূর্ব্বে ইহার কিছুই জানেন না, তাঁহাদ্বারাই আমাদের ভ্রম অপনোদিত করিলেন। রাত্রিতে যে সর্ব্বনাশ ঘটিল, শ্রীযুক্তা বুড়া ঠাকুরাণী ও শ্রীমতী শান্তিসুধা কিছুই তখন জানিতে পারেন নাই। শেষে তাঁহারা জানিতে পারিয়া শোকে অধীর হইলেন।

সে সময় রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় মার্কণ্ডেয়সাহীতে থাকিতেন। তিনি গোস্বামী প্রভুর দেহ সমাধিস্থ করিবার উপযোগী একটী স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তাহা আমার নিকট ভাল বোধ হইল না। তৎপর ডেঃ মাঃ জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয় মাটিমণ্ডপসাহীতে একটী স্থানের কথা বলিলেন, তাহাও আমার পছন্দসই হইল না। তখন শ্রীযুত কিশোরী বাবু আমাকে লইয়া ঝিঙ্গারপুরের কুলমণি চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় চলিলেন। উক্ত বাসা আমাদের বাসার অপর পার্শ্বে। মুন্সেফ বাবু তথায় যাইয়া উকীল হরিশ্চন্দ্র ঘোষ, পুঃ ইঃ শ্রীযুত নারায়ণ বাবু, ডেঃ মাঃ শ্রীযুত শশিমোহন দত্ত ও জগচ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয়দিগকে তথায় আসিতে সংবাদ পাঠাইলেন।

আমরা গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়া এখানে আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছিলাম; কোথায় সমাধি দিবার স্থানের সুবিধা হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তখন বেলা প্রায় ৮টা হইবে, অথচ এখন স্থান ঠিক না করিলেও নয়, উপায় কি করি; যে সে স্থানে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতেও প্রাণে সায় দেয় না। অপর সকলে ক্লেশে হতবুদ্ধি হইয়া একরূপ নিশ্চিন্ত ভাবেই আছেন, এজন্য কেহই কোন উদ্যোগ বা চেষ্টা করিতেছেন না। জানি না কেন আমি ইহাঁদিগকে লইয়া চেষ্টা উদ্যোগ করিতেছি। ইতিমধ্যে উকীল হরিশ বাবু প্রভৃতি সকলে আসিয়া শ্রীযুত কুলমণি চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুত মুন্সেফ বাবু তাঁহাদিগকে সমাধির স্থান

নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলিলেন। যাঁহার যে রূপ অভিপ্রায় তিনি সেই রূপ স্থান নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উপদিষ্ট একটী স্থানও আমি মনোনীত করিতে পারিলাম না। তন্মধ্যে উকীল হরিশ বাবু প্রথমতঃ গুঞ্জাবাড়ীর সন্নিকটে বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে মিউনিসিপ্যালিটির ধর্ম্মশালা আছে, সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলেন; তাহাও মনোমত হইল না। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, নরেন্দ্রের উত্তর পাড়ের স্থানটা কি আপনার পছন্দ হয়? আমি বলিলাম, হাঁ, এ স্থান হইলে পছন্দ হয়। তখন ঐ স্থানই সমাধির জন্য নির্দ্ধারিত হইল এবং তথায় সমাধি খনন করান হইল। এতদ্‌বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

অতঃপর আমরা বিমানে করিয়া ঠাকুরের দেহ লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ঠাকুরকে যত বার দর্শন করি, তাঁহার মুখের উজ্জ্বলতা ও জ্যোতির কিছুমাত্র হ্রাস দেখিতে পাইতেছি না। যতই দেখি, ততই প্রাণ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠে; বুক যেন ফাটিয়া যায়। শ্রীযুক্ত পান্না লাল ঘোষ প্রভৃতি সেই সময়ের ফটো তুলিলেন। বাড়ীর আঙ্গিনার মধ্যে বিমান আনীত হইল এবং তাহা পুষ্প মাল্যে সুন্দররূপে মনের সাধে সুসজ্জিত করা হইল। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বেই বিমানকে নানাবিধ রঙ্গিন সুন্দর বস্ত্রে মণ্ডিত করাইয়াছিলেন। বিমানের চারিদিকে মসারি খাটাইবার জন্য ডাণ্ডি দিয়াছিলেন; তাহাতেই পুষ্পের মাল্য প্রভৃতি ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ঘর হইতে বহন করিয়া আনিয়া বিমানে শয়ন করাইয়া রাখা হইল। বড়দাণ্ডের রাস্তা লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নাই। সিংহদরজা হইতে নরেন্দ্রসরোবরের নিকট পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক দণ্ডায়মান।

এ দিকে বেলা অবসন্নপ্রায়, এমন সময়ে আমরা ঠাকুরের বিমান লইয়া রাস্তার বাহির হইলাম। হরিধ্বনি ও জয়ধ্বনি করতঃ বহুলোক আসিয়া

কেহ বিমানে স্কন্ধ, কেহ হস্ত, কেহ মস্তক দিয়া বিমান বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের দল আসিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। যোগজীবন দরিদ্রগণকে বিতরণ করিবার জন্য সিকি, দুআনি, পয়সা ও খই লোক দ্বারা ও নিজে বড় দাণ্ডের রাস্তার দুই ধারে ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। সমাধিস্থান আসা পর্য্যন্ত এই ভাবে বিতরণ করা হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রায় ৫টার সময় আমরা সমাধিস্থানে আসিয়া পৌছিলাম। বিমানবাহী অনেকেই সে সময়ে কাঁদিয়া অধীর, বাবাজী মহাশয়েরা কাঁদিয়া আকুল। অনেকেই একবার বিমান বহন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করতঃ স্কন্ধে লইয়া বহন করিতেছেন; কাহারও আগ্রহ দেখিলে তিনি নিজের স্কন্ধ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই বহন করিতে দিতেছেন। এই ভাবে সমাধিস্থান আসা পর্য্যন্ত চলিল।

সমাধিতে দিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে ৩।৪ মন লবণ লইয়া রাখা হইয়াছিল। রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তথায় উপস্থিত থাকিয়া সমুদ্র, নরেন্দ্র ও আঠার নালার জল দ্বারা যোগজীবনকে দিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে দেহ সমাধিস্থ করিতে বলিলেন। আমরা শ্রীঅঙ্গস্নানের সময় জন্মের মত প্রভুর চরণোদক পান করিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন, আসন করাইয়া বসাইয়া সমাধিস্থ করাই বিধি; কিন্তু হাত পা গুটাইয়া বসাইতে কেহই সম্মত হইলেন না; সুতরাং উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া মস্তকে জগন্নাথ-দেবের আশীর্ব্বাদী বস্ত্র পাগড়ী বাঁধিয়া লেঙ্গট ও বহির্ব্বাস পরিধানে রাখিয়া এবং দক্ষিণ হস্তের নিকট ককণ্ডলু দিয়া দেহ সমাধিস্থ করা হইল।

এই সময় একটী নানকপন্থী সাধু সমাধির ভিতরে নামিয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের তাহা ভাল বোধ হইল না। তিনি সন্দেহ করিলেন পাছে ঐ সাধু ঠাকুরের গাত্রের কোন অংশ কর্ত্তন করিয়া লন; এই ভাবিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এ ব্যবহার কাহারও ভাল লাগিল না।

তৎপরে বালি, লবণ ও মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া সকলেই কিছু কিছু দিতে লাগিলেন। তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা পড়িল বটে, কিন্তু মুখ ও মস্তকে কেহই বালি লবণ মিশ্রিত মৃত্তিকা দিতে পারিতেছিলেন না। আহা! তখনও সে মুখ উজ্জ্বল রহিয়াছে, কোন্ প্রাণে সে মুখ জীবনের মত আবরণ করা যায়! তাই কেহই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইতিমধ্যে কে যেন কতগুলি বালি, নুন, মাটি ঢালিয়া দিল, তাহাতেই সে চন্দ্রবদন চর্ম্মচক্ষের অগোচর হইয়া রহিল। তথায় প্রহরী রাখিয়া আমরা অধোবদনে ম্লান ভাবে বাসায় আসিলাম। যে পর্য্যন্ত সমাধির উপরে আচ্ছাদনগৃহ না হইবে, ততদিন তিন জন লোক রোজ প্রতিদিন ।০ হিসাবে ৸০ আনা স্থির করিয়া দিবা রাত্রির জন্য পাহারায় নিযুক্ত রাখা হইল। গোস্বামী মহাশয় যে আমাকে বলিয়াছিলেন ঋণপরিশোধ হইলে আমি আর একদিনও এখানে থাকিব না, তাহাই সত্য হইল, পূর্ব্বদিন সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়; পরদিনই দেহ রাখিলেন। দেহ রাখিবার পর দিন ষ্টিমারের জন্য কলিকাতায় মণিবাবুর নিকটে তাঁহার কথা মত যে আঠার শত টাকা প্রেরিত হইয়াছিল, যোগজীবন এই দুঃসংবাদ সহ টেলিগ্রাফ করিয়া তাহা এখানে আনাইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর আমাদের মনে হইল ঠাকুর কি উদ্দেশ্যে এত তাড়াতাড়ি টাকা পাঠাইলেন? দেহ এ যাত্রায় রক্ষা হইবে না, তাহা নিশ্চয়ই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে আমরা কেহ তাহা জানিতে পারি, ইহা তিনি ইচ্ছা করিতেন না। আর তিনি দেহ রক্ষা করিলে আমরা সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িব, তখন এখান হইতে টাকা চোরে লইতেও পারে এবং এতগুলি লোকের দেশে পুনঃ ফিরিয়া যাইতেও টাকার প্রয়োজন হইবে, অন্য কাজেও দরকার হইতে পারে, বোধ হয় এই সব মনে করিয়াই তিনি আমাদের সন্তোষের জন্য তখন ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রভুর লীলাসংবরণের কিছুদিন পূর্ব্বে ঋণ পরিশোধের টাকার জন্য তাঁহার

পত্র লইয়া বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় নানাস্থানে যাইয়া ঋণের টাকা সংগ্রহ করতঃ এখানে পাঠাইয়া দিতেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি পূরীতে আসিবেন, কি, কলিকাতায় থাকিবেন, অথবা কি করিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত মণিবাবু দ্বারা এক পত্র পাঠাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, বিধুর এখন এখানে আসিবার দরকার নাই; এখন কলিকাতাতেই থাকিতে বলিবে। এখানে আসিয়া বিধু বিষপ্রয়োগের কথা জানিতে পারিলে খুনাখুনি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহাই যেন আমাদের মনে হইল। গোস্বামী প্রভুর কার্য্যকলাপ আমাদের ন্যায় সাধারণ জীবের মত নহে। কখন কি গূঢ় অভিপ্রায়ে কি কার্য্য করিতেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে; সুতরাং তাহার বিচার আমরা করিতে পারি না। তিনি যখন যাহা করিতেন, তাহাই সুন্দর বোধ হইত। যদিও তিনি তাঁহার অন্তর্ধানের কথা পরিস্ফুট-রূপে কাহাকেও জানিতে দেন নাই, তথাপি পাছে তাঁহার অভাবে শিষ্যদের সহসা আর্থিক ক্লেশ হয়, সেই জন্যই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কোন গুরুভ্রাতার রচিত একটি সঙ্গীত পাঠকদিগকে উপহার দিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করি।

সুরট মল্লার—একতালা।

অপরূপ এক দ্বিজরাজ কপট সন্ন্যাসীর সাজ।
গুণগরিমা কো করু সীমা স্তব্ধ যত সাধুসমাজ॥
নদীয়া-ইন্দু-ভাবতরঙ্গ, উছলিছে সদা পুলক-অঙ্গ,
নামবিতরণে তেমতি রঙ্গ, বিহরিছে আসি নগর মাঝ॥
পূরব জনমে হেন মনে লয়, সন্ন্যাস করিয়া ছাড়িলা আলয়,
তরুণী বনিতা স্নেহময়ী মাতা বিরহপাথারে ডারিয়া,—
এবে কি পূরব ঋণ শুধিবারে, মাতা সুত কান্তা সহিত বিহরে,

অদ্‌ভূত লীলা সে বুঝিতে পারে, যে সঁপেছে পদে ধরম লাজ ॥
হেন অনুমানি পূরব জনমে, চিরমুণ্ডিত সন্ন্যাস-আশ্রমে,
বন পশু পাখী, অশ্রুময় আঁখি, নিরখি নিঠুর কাজ,—
এবে নিবারিতে জীবের ক্লেশ, কৃপায় ধরিলা সরব কেশ,
কিবা ব্রহ্ম-ঋষি কিবা ব্যোমকেশ, (রূপের) নাহিক তুলনা ভুবনমাঝ ॥
হেন চিতে ভায় শ্রীপুরুযোত্তমে, প্রকাশিলা লীলা পূরব জনমে,
কাঁপাইয়া বিশ্ব হরেকৃষ্ণনামে, বহিছে লহরী পবনে,—
এবে কি স্মউরি পূরব খেলা, লীলা সাঙ্গ তরে নীলাচলে গেলা,
প্রকাশ্যে এবারে লীলা সংবরিলা, শিরে সবাকার হানিয়া বাজ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শোকসংবাদ।

গোস্বামী প্রভুর পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া বহুলোক যোগজীবন গোস্বামীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকখানা লিপিবদ্ধ হইল।

(১)

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরো জয়তি।

প্রাণাধিকেষু,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু। ত্বদীয়কুশলং ভগবৎসমীপে সততং যাচে তত্র মমানন্দঃ পরঃ।

তোমার পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তোমার পত্র পাওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বেই সেই অপ্রাকৃত ভ্রাতৃবরের প্রাকৃত দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। প্রায় দেড় বৎসর গত হইল ভ্রাতৃবরের সহিত বিচ্ছেদ হয়। আশা ছিল শীঘ্রই তাঁহার স্বদেশ-আগমন হইবে এবং তাঁহার সঙ্গলাভে সুখী হইব। তাহা আর হইয়া উঠিল না। ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমিই সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিলাম, আমারই সর্ব্বাগ্রে পরলোকে যাওয়া উচিত ছিল।

গত ২০শে কি ২২শে জ্যৈষ্ঠ রঙ্গপুর মাইগঞ্জে রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতেছি, তেজস্বী, জটাজূটধারী শুভ্রবসন শুভ্রপুষ্পমালাশোভিত এক মহাপুরুষ আমার পদতলে বসিয়া আমার নিকট ইহলোক হইতে চিরবিদায় প্রার্থনা করিতেছেন। মহাপুরুষকে তাদৃশভাবে পদতলে উপবিষ্ট দেখিয়া 'আপনি আমার পদতলে বসিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছেন কেন' বলিয়া যেই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইতেছি, অমনি চৌকিদারের চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল। এখন মনে হয় প্রাণাধিক ভ্রাতা সূক্ষ্মদেহে আমার নিকট বিদায়প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন।

ভ্রাতার কাশীধামে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের কথা আমি জানি, সুতরাং তাঁহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করা শাস্ত্রবিহিত কার্য্যই হইয়াছে। আশা করি ভক্তগণ সমাধির উপর একটি স্থায়ী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

পিতৃভক্ত পুত্র তুমি। পিতার পাদমূলে থাকিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। ভগবানের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সংপ্রতি মন বড় ব্যাকুল। আর কিছু লিখিতে পারিলাম না। পরম পূজনীয়া মাত্রী মাতা ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবে। ইতি ৮ই আষাঢ়, ১৩০৬ বাং, কাকিনীয়া, রঙ্গপুর।

নিত্য আশীর্ব্বাদক

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ

(২)

গেণ্ডারিয়া, ঢাকা

৮ই আষাঢ়, ১৩০৬

প্রিয় যোগজীবন,

কি লিখিব? জগৎ শূন্য হইয়াছে, প্রাণ শূন্য হইয়াছে। ঠাকুরকে দেখিয়া মরিব এই আশা পূর্ণ হইল না। দারুণ রোগের সময় মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাহাতে বলিলেন, 'না, এখন হইবে না'। অবশেষে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন। জীবনের আলোক নিবিয়া গিয়াছে, এখন কেবল জীবনভার দেহভার বহন করিয়া যাওয়া। জীবন আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অবিশ্বাসের কথা, কিন্তু কি করিব? তাঁহার সঙ্গে আমার স্থূলভাবে পরিচয়। এখন হইতে তিনি সূক্ষ্মভাবে যাহা করিবেন, তাহা ত আমি আর দেখিতে পাইব না। সে মূর্ত্তি আর দেখিব না, সে বাক্য আর শুনিব না, সে চরণপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়া আর ত আরামলাভ ভাগ্যে ঘটিবে না।

* * * * *

ঠাকুর ইতিমধ্যে কাহাকেও দর্শন দিয়াছেন কিনা বা কোনরূপ আদেশ

করিয়াছেন কিনা জানি না। আমি একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্মৃতি যেন মুছিয়া গেল। আমাদের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির অভাবে বিরোধবিসংবাদে ঠাকুর বিষজ্বালায় জ্বলিয়াছেন। এখন যেন ঝগড়া বিবাদ করিয়া তাঁহার নামে আমরা কলঙ্ক না আনি। তিনি ক্ষমা চাহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা আমরা পালন করিতে পারি না। সেখানকার সকলকে আমার প্রণাম দিও। ......অমি অনিশ্চিত ভাবে অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া আছি। গুরুদেবের এই-রূপই আদেশ। ভবিষ্যতে আর আদেশ পাইবার আশা নাই ইতি।

তোমার—

কুঞ্জলাল।

(৩)

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পুরী হইতে আসিবার সময় বলিয়াছিলেন শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন। তথা হইতে আর কোথাও যাইবেন না। অনিত্যধামে অশান্তিজনক ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া শান্তিময় নিত্যবৃন্দাবনধামেই গিয়াছেন, যাইবার পূর্ব্বে যে সকল উপদেশ দিয়া যান তাহা ও দেহত্যাগের বৃত্তান্ত শ্যামাকান্ত ভ্রাতাকে লিখিতে বলিবেন। ১০৲ টাকা পাঠাইলাম। ইতি—

সেবকাধম—

শ্রীভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(৪)

শ্রীহরিশরণম্

বানরীপাড়া

২রা আষাঢ়

প্রিয় যোগজীবন বাবু,

আপনার চিঠি ও টেলিগ্রাফ পাইয়াছি। এই মহাবিপদের কথা

কখনও ভাবিতে পারি নাই। আমরা এখন কি করিব? কাহার দিকে চাহিব? বাস্তবিকই আমরা বন্ধুহীন ও আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছি। সংসারের নানারূপ জালা যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করিয়া যাঁহার নিকটে গিয়া শান্তি পাইতাম তিনি এখন কোথায়?······আপনার ২৬শে জ্যৈষ্ঠের পত্র আমাদিগকে অশান্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ শান্তি দিয়াছে। আপনারা স্থিরভাবে যে কাজ করিতেছেন তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট। ঠাকুরের অন্তর্ধান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখিবেন। সমাধির উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাতে সকলেই প্রাণ খুলিয়া যোগ দিবেন।······ইতি

আপনার

আর. গুহ।

(৫)

মজঃফর পুর।

২৩শে জুন।

শ্রীচরণেষু।

দাদা! আপনার পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলাম। দাদা, যাহারা তাঁহাকে ঐরূপ করিয়াছিল তাহাদের কি কঠিন প্রাণ। তাহাদের মনে একটু দয়াও হইল না। সকলই আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াই তাহারা ঐরূপ করিয়াছিল। ভাই, আর তাঁহার সেই কীর্ত্তনে নৃত্যও দর্শন করিতে পাইব না, আর তাঁহার সহিত কথা কহিয়াও জুড়াইতে পারিব না। ভাই! আমাদের মধ্যে যাঁহার সাধনবল আছে, তাঁহারাই তাঁহাকে ধ্যানে দর্শন করিতে পারিবেন, কিন্তু আমার ন্যায় লোকে আর কি করিয়া তাঁহার দর্শন পাইবে। ভাই, বড় মনে ক্ষোভ রহিল যে শেষ দেখা ভাল করিয়া করিতে পারিলাম না। আমার ন্যায় নরকের কীটকে তিনি দয়া করিয়া এই সাধন দিয়াছিলেন। আর কে অত দয়া

করিবে? কেই বা আদর করিয়া ডাকিবে? ভাই, কি করিলে তাঁহার দেখা পাইব, যদি কিছু তিনি বলিয়া গিয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া লিখিবেন; আমি আপনাদের ক্রীতদাস। ভাই, জনমে তাঁহার সেবা ত করিতে পারিলাম না। হতভাগ্য কপালে কি করিয়া হইবে? তিনি যে দয়া করিয়া নাম দিয়াছেন এই আমার কপালে যথেষ্ট। অত ভাগ্য কোথায় পাইব যে তাঁহার সেবা করিতে পাইব, ভাই, আমার পক্ষে সংসার অন্ধকার। বড়ই মনঃকষ্টে আছি।

ভাই, হাতে টাকা হইবামাত্র আমি তাঁহার মন্দিরের জন্য কিছু পাঠাইব। প্রাণ চায় যে সর্ব্বস্ব দিই, কি করি হতভাগ্য কপালে সেও করিতে দিতেছে না!

ভাই, এখানে কয়েকটী লোক তাঁহার নিকট সাধন লইবার জন্য বড় ব্যস্ত ও আমাকে অনুরোধ করিতেছিলেন যে তাঁহার সহিত যাহাতে আলাপ হয়। তাঁহারা এই অশুভ সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। দাদা, যদি তিনি এই সাধন দিবার কিছু বন্দোবস্ত করিয়া গিয়া থাকেন তবে দয়া করিয়া লিখিবেন। এই সাধন দেওয়ার কি কিছুই করিয়া যান নাই? আমার ত ভরসা যে তিনি অবশ্যই ইহার কিছু করিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি কোনও বন্দোবস্ত করিয়া গিয়া থাকেন তবে এই কয়েকটী লোক সাধন নেয়। তাহাদের কষ্ট দেখিয়া বড় কষ্ট হইতেছে। যদি তিনি কোনও উপায় করিয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে এই কয়টী লোক এই শক্তিসংযুক্ত নাম অর্থাৎ আমাদের সাধন গ্রহণ করেন। আমাকে আপনার দাস জ্ঞান করিয়া এই গোপনীয় বিষয় পত্রপাঠ লিখিলে কৃতকৃতার্থ হইব। যদি তিনি কোনও বন্দোবস্ত না করিয়া থাকেন তবে বড়ই কষ্ট হইবে। আপনারা সকলে কেমন থাকেন ও কে কে আপনারা ওখানে থাকবেন লিখিবেন। আপনাদের শ্রীচরণের কৃপায় আমি ভাল আছি। ইতি

দাসানুদাস

শ্রীশৈলজাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

(৬)

শ্রীহরিঃ।

ধীতপুর রাজ কাছারী
পোঃ শিবগঞ্জ, ময়মন সিংহ।
৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬।

শ্রীচরণকমলেষু।

আপনার ২৩শে জ্যৈষ্ঠের টেলিগ্রাম ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পাইয়াই মহোৎসবের জন্য ৫০৲ টাকা টেলিগ্রামে পাঠাইয়াছিলাম। তাহা উক্ত দিবসেই পঁউছিয়া ঠাকুরের কার্য্যে লাগিয়াছে কি না জানাইবেন।

আমরা যে এখন কি করিব, কাহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পাপ জীবন শান্ত করিব জানি না। আমাদের ঠাকুরের মৃত্যু নাই। তবে যে আমরা কাঁদি তাহা আমাদেরই স্বার্থের জন্য। ঠাকুরের এক টুকুও সেবা করিতে পারিলাম না। ইহা ভাবিয়াই মন বড়ই অস্থির হইতেছে। এ কার্য্যে আসার পূর্ব্বে সমুদার খোয়াইয়া পরিবারের এত অভাবের সূচনা করিয়াছিলাম যে, আগে তাহা দূর করিয়া ও একটা বাড়ী ঘর ঠিক করিয়া পরে ঠাকুরসেবায় যাহা পারি দিব। আমার মধ্যে এ পাপ মতি হইয়াছিল বলিয়াই এত দিন ঠাকুরের সেবায় একটী পয়সাও ব্যয় করিলাম না। প্রতি মাসে অন্ততঃ ১০৲ দশটী করিয়াও টাকা ঠাকুরের সেবায় ব্যয় করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি ঘোর নারকী বলিয়াই সে সুবিধা হারাইলাম। আমি জানি আমার পরম দয়াময় ঠাকুরের সেবার জন্য শত শত প্রাণ অবিরত ব্যস্ত ছিল, কিন্তু আমি নারকী কি করিলাম? নরকে পড়িতেছিলাম, ভগবানের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস ছিল না। দয়াময় ঠাকুর সে পাষণ্ডকে সপরিবারে চরণে স্থান দিয়াছিলেন। ঠাকুরের অপার কৃপা না থাকিলে এক সাধু যে ঠাকুরকে বিষ খাওয়াইয়াছিল

এ সংবাদ শুনিয়া আমার সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা কখনও কাঁদিত না, সে এ সংবাদে আকুল হইয়া কাঁদিয়া অধীর ও অস্থির হইয়াছিল।

প্লেগের হুজুগে কলিকাতা ডিস্পেনসরি আমি বেচিয়া ফেলিয়া বড়ই নিঃসম্বল হইয়াছিলাম। এক দিন কি করিব ভাবিয়া বড় হতাশ হইয়া রাত্রিতে ঠাকুরকে ডাকিয়াছিলাম। তাহার পরদিবসই অযাচিতভাবে যেন এ চাকুরিটী মিলিল। এ কৃপা কে বুঝিবে? ঠাকুর যাহা করিয়াছেন তাহাই হইয়াছে।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, জানাইবেন। ঠাকুরের সমাধি কিরূপ স্থানে হইয়াছে? সে স্থানে আমাদের গুরুভাইদের মন্দিরস্থাপনের চেষ্টা কর্ত্তব্য কি না? ঢাকা গেণ্ডারিয়াতে একটী আশ্রম, শ্রীবৃন্দাবনে কোনরূপ অনুষ্ঠান এবং শ্রীক্ষেত্রে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ ঠাকুরের সমাধিমন্দিরস্থাপনের চেষ্টা আমি এখন কর্ত্তব্য বোধ করি। গেণ্ডারিয়া আশ্রমে জন্মোৎসব, সমাধি-মন্দিরে তিরোভাবোৎসব ও বৃন্দাবনে তদ্রূপ কোন বাৎসরিক উৎসব করাই আমাদের কর্ত্তব্য। অবশ্য এখনও কার্য্য এক দিনে হওয়া অসম্ভব। গুরুভাইরা এক সঙ্গে মিলিয়া চেষ্টা করিলে কালে ইহা হইতে পারে। ঠাকুরের শক্তি বাহিরে প্রদর্শিত না হয় ইহা ঠাকুরের চির-ইচ্ছা ছিল। তত্রাচ এ সমস্ত বিষয় শ্রীযুক্ত দাদা কুঞ্জলাল নাগ প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এখন হইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। আপনি দেশে আসিবেন, কি, অন্য কিছু স্থির করিয়াছেন জানাইবেন। ঠাকুরের সেবার জন্য সেখানে কে থাকিবে? আমার পরম গুরুভক্ত দাদা শ্রীধর এ আঘাত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে কি? বিধু দাদাও উন্মত্ত হইয়া কাহাকে মারে ধরে নাই? আমাকে অনুপূর্ব্বিক অবস্থা জানাইবার জন্য গুরুভাইদের কাহাকেও অনুরোধ করিবেন। ঠাকুরের শেষ উপদেশ কি? শ্রীচরণমঙ্গল প্রার্থনীয়।

প্রণত সেবক—

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

(৭)

শ্রীশ্রীগুরুচরণ ভরসা।

আপিস

১৯-৬-৯৯।

প্রাণের যোগজীবন ভায়া,

গত শুক্রবার রেবতী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার বাসাতে অভয় বাবু, হীরালাল বাবু, বৃন্দাবন বাবাজিউ, চারু বাবু, কৈলাস বাবু, উমেশ বাবু এবং আমিও উপস্থিত ছিলাম। রেবতী বাবুর যতদূর স্মরণ হয়, ততদূর যথাযথ বর্ণন করিলেন। সকলেই যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে প্রায় মাসাবধিই ভুগিতেছিলেন। আমি অতি নরাধম ও নেমকহারাম যে এই সময়ের মধ্যে তাঁহার কথঞ্চিৎ সেবা করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে দেখিতে যাইতেও পারিলাম না। সমস্ত কথা শুনিয়া প্রাণে বড়ই লাগিতেছে। মন দিন দিন খারাপ হইতেছে ও হতাশ হইতেছে।

পিতার মৃত্যুর পর মাতা ছিলেন ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব ২।১টী ছিলেন। পরে মাতাঠাকুরাণীর জীবিত অবস্থাতেই গোস্বামী মহাশয়ের কৃপা পাই। এমন কৃপা আর কখনও পাই নাই, পাব না। এত অর্থকৃচ্ছ্র, এত আপিসের লাঞ্ছনা, এত দেনাদারের বাক্যযন্ত্রণা, এত সাংসারিক অশান্তির মধ্যে ঘোর আনন্দে ছিলাম, উৎসাহে ছিলাম, কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতাম না, কিন্তু আজ একবারে চারিদিক্ অন্ধকার। বাস্তবিক আপনার বলে, এমন কেহই আর নাই। তৎপর আবার অন্যান্য গুরুভাইগণের কথা শুনিয়া ধন্য হইলাম। অপনারা যথার্থই কৃতজ্ঞতার পাত্র। কারণ সেই বিদেশে আপনারা কয়েকটী যেরূপ বুক বাঁধিয়া আছেন তাহাই আশ্চর্য্য। সমাধিস্থানটীর সুব্যবস্থা না হইলে আপনারা আসিতে পারিতেছেন না। দেনা শোধ অবশ্যই হইবে, কিন্তু অনেক বিলম্ব হইবে। কিঞ্চিৎ সুস্থ হন, পরে বিবেচনা করিবেন।

শান্তি প্রভৃতিকে এখন সেখানে রাখা কর্ত্তব্য কি না? আপনারও আসা কর্ত্তব্য। আমারও আপনাদের দেখা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ কেবল চোখে দেখাও ভাল এই মনে হইতেছে। যদি দুই মাস বিলম্ব থাকে তবে আমি এক মাসের ছুটী লইয়া যাইব মনে করিতেছি। মাহিনা বাদ দিলেও যাইব, তবে আপিসে ছুটী পাইলে হয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু লিখিবেন। এখানকার সকলকার মত এই যে শান্তিরা ও আপনি আপাততঃ আসুন, পরে আপনি না হয় আবার যাইবেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত। যদিও এখন এত লেখাও পড়া বিরক্তিকর, তথাপি কতকটা লিখিলেও বুকের ভার কমে।

সেবক—
শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার

(৮)

শ্রীশ্রীগুরুচরণ
ভরসা।

বাশুণ্ডী।
টাকী পোঃ।
চব্বিশ পরগণা।

ভক্তিভাজন দাদাবাবু!

আমি বঙ্গবাসীতে হৃদয়ভেদী সংবাদ পাঠ করিয়া ব্যাকুল হইয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত মণিবাবু বলিলেন সমাধিমন্দির জন্য যায়গা খরিদ হইয়াছে। মন্দির প্রস্তুত করিয়া বোধ হয় আসিবেন। অগত্যা আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি কিন্তু কোথাও আমার আর শান্তি নাই। যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া পুত্র-শোক পর্য্যন্ত নিবারণ করিয়াছি, আজ তাঁহার অভাবে কিরূপে দিনপাত করিব জানি না। মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন "পরমারাধ্য ঠাকুরের শরীর বড় খারাপ, শীঘ্রই আমরা কলিকাতায় যাইব" ইহা যে ঘটিবে বুঝিতে

পারি নাই। কলিকাতায় আসার কথা না লিখিলে তথায় যাওয়ার সম্ভব হইত এবং শেষ দেখাও হইতে পারিত। কিন্তু পোড়া কপালে তাহা ঘটে নাই, মনকে প্রবোধ দিবার আমার কিছুই নাই। যাহা হউক আপনারা সকলে শারীরিক কেমন আছেন? কত দিন তথায় অবস্থিতি করার সম্ভব লিখিতে আজ্ঞা হইবে; আপনাদিগকে দেখিতে প্রাণ সতত চাহিতেছে। আর আমার মাঁথা মুণ্ডু কি লিখিব। ধন্য সতীশচন্দ্র যে তাহাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। আমি অদ্যাপি ঔষধ সেবন করিতেছি। কি জন্য এ দেহরক্ষার যত্ন করি তাহাও বুঝিতে পারি না। আপনাদিগের সকলের চরণে বার বার প্রণাম করি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ১০ আষাঢ়।

আপনাদিগের কৃপাপাত্র নরাধম
নবীন।
(ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোস্বামী প্রভুর সহিত তদীয় পরিবারবর্গ ও শিষ্যদের অনেকে একত্রে বাস করিতেন; সুতরাং প্রভুর জীবনীর সহিত তাঁহাদেরও জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত আছে। এই সকল শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পরলোকে গিয়াছেন এবং অনেকে অদ্যাপি জীবিত আছেন। যাঁহারা পরলোকগত, তাঁহাদের কতিপয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল।

শ্রীমতী যোগমায়া দেবী

ইঁহার সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে কিছু বলা হইয়াছে। এখনে ইঁহার পুণ্যময় জীবন-বৃত্তের আরও কতিপয় ঘটনা বিবৃত হইতেছে। গুরুভ্রাতা শ্রীধর ঘোষ বলিয়াছেন :—

গুরুমাতা জীবিত থাকা কালীন কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পল্লীতে প্রায় ২ বৎসর কাল তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হইত। ক্রমে ক্রমে দেখা সাক্ষাৎ হওয়াতে ঐ স্থানের অন্যান্য ব্রাহ্মিকাদিগের মধ্যে আর তাঁহার চেহারাতে এক বিশেষত্ব লক্ষিত হইত। সকলেই প্রায় মুখে ধর্ম্ম কথা বলেন, কিন্তু যোগমায়া ঠাকুরাণীর মুখে কখনও কোন প্রকার উপদেশ বা ধর্ম্মের কোন বক্তৃতা শুনি নাই। তাঁহার স্বভাব অতি গম্ভীর ছিল, এবং বাক্য খুব কম বলিতেন। আমার সঙ্গে তিনি কখন সর্ব্ব প্রথম কথা বলিলেন সে ঘটনাটী এই। এই ঘটনার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে আমার কেবল সাক্ষাৎ হইত। তিনি আমাকে চিনিতেন, আমি তাঁহাকে চিনিতাম। আমিও তাঁহার সঙ্গে কোন কথা বলি নাই, তিনিও আমার সঙ্গে কোন কথা বলেন নাই। আমি ঐ ব্রাহ্মপল্লীতে যখন ছিলাম, তখন আমি প্রত্যহই মধ্যাহ্ন-আহারের পর গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিতাম। এক দিবস তাঁহার নিকট বসিয়া-



শ্রীমতী যোগমায়া দেবী

ছিলাম, তিনি সুর করিয়া দেবীভাগবত পড়িতেছিলেন। আমি সংস্কৃত না জানাতে কি পাঠ করিয়াছিলেন তাহা কিছুই বুঝি নাই। কিন্তু তাঁহার সেই সুরের সহিত শব্দ সকল উচ্চারণ হওয়াতে আমার মনের মধ্যে কি ভাব হইয়াছিল জানি না, আমি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ি। কতক্ষণ পরে আমার চেতনা হইলে দেখি কয়েকটী ব্রাহ্ম বন্ধু আমার চারি দিকে রহিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় শুণ্ঠী-চূর্ণ আমার বুকে ও পায়ের তলায় মর্দ্দন করিতেছেন। আমি উঠিয়া বসিলাম। আমার এইরূপ মূর্চ্ছা-রোগ ছিল। ঐ দিবস ঐরূপ হওয়াতে গোস্বামী মহাশয় আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখ করিতে লাগিলেন, এবং উপস্থিত বন্ধুদিগের নিকট আমাকে কিছু দুধ খাওয়াইয়া সবল করিবেন, এইজন্য দুধের টাকা ভিক্ষা করিলেন ও আমাকে বলিলেন, তুমি কয়েকদিন আমাদের এখানে আহার করিও। ঐ দিবস রবিবার ছিল। আমি একটুকু সুস্থ হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যোগ দিতে গেলাম। সেই সময় যোগমায়া ঠাকুরাণী একটী বাটীতে করিয়া কিঞ্চিৎ দুধ ও কিছু পাউরুটী আমাকে আহার করিতে দিয়া বলিলেন, "তোমার যে রকম শরীর দুর্ব্বল এবং যে প্রকার তোমার মূর্চ্ছা-রোগ হইয়াছে, তুমি কিছু দিন গয়ায় আকাশ-গঙ্গার বাবাজীর নিকট বাস করিলে সুস্থ হইতে পার।" তিনি এই আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলিলেন। তৎপরে ক্রমে আমি ঢাকা গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সাধন গ্রহণ করি। ঐ সাধন পাওয়ার পর হইতেই আমি একপরিবারস্থ লোকের মত উহাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। যোগমায়া ঠাকুরাণীর সহিত ঐ সময় হইতে তাঁহার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম।

যোগমায়া দেবী তাঁহার বিধবা মাতা শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত যোগ দিলেন। এ সম্বন্ধে আমি যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহার বিবরণ পণ্ডিতবর শিবনাথ শাস্ত্রী

মহাশয় আমাকে এই বলিয়াছিলেন।—যখন আমরা সকলে হিন্দু সমাজ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়মানুসারে জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের প্রচলিত শাস্ত্র সকলের প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের বিগ্রহাদিপূজাকে অশুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলাম এবং ঋষিদিগের প্রণীত অতি পুরাতন নিয়ম সকল কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া যোগ দিলাম, তখন হিন্দু সমাজ হইতে পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নীদিগের নিকট বিদায় লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলাম। সেই সময় শান্তিপুরের অদ্বৈতপরিবারের শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একটী অল্পবয়স্কা বালিকাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলাম। দেখি যোগমায়া-নাম্নী এক অতি শান্তস্বভাবা কন্যাকে গোস্বামী মহাশয় বিবাহ করিয়াছেন। এই বিবাহ তৎকালীন সমাজসংস্কারের আন্দোলন এবং নিয়মানুসারে বাল্য-বিবাহ বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম। সেই অল্পবয়স্কা বালিকার সঙ্গে তাঁহার বিধবা মাতা ছিলেন; তিনি পুত্রহীনা। এই যোগমায়া ঠাকুরাণী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা; তাঁহার আর এক কনিষ্ঠা কন্যা আছে। যোগমায়া ঠাকুরাণীর প্রতি অধিকতর স্নেহ থাকাতে ইহাঁরই সঙ্গে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মপ্রচারের সহায় হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে মিলিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

যোগমায়া দেবী আমাকে এ সম্বন্ধে এই বলিয়াছেন যে, তিনি এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা বুঝিতে পারিতেন না; তাঁহাকে অনেক শিক্ষা দিয়া যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ঈশ্বর কি প্রকার? গোস্বামী মহাশয়ের প্রশ্নোত্তরে তিনি বলিলেন, ঈশ্বর গোলাকার প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়। তিনি বিশ্বাস করিতেন, শালগ্রামশিলাদির চক্রই ঈশ্বর। এই উত্তর শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় (তখন শীতের সময়) তাঁহার মস্তকে গাড়ুর জল ঢালিয়া দিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট বা নিরস্ত না হইয়া বাহিরে মাটির কলসীতে যে

জল ছিল, তাহাই তাঁহার আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গে সেই দারুণ শীতের সময় ঢালিয়া দিলেন। তিনি আশ্চর্য্য বোধ করতঃ অবাক্ হইয়া নিরুত্তর রহিলেন এবং শীতে কাঁপিতে লাগিলেন।

আবার গোস্বামী মহাশয় কিছু দিন বোধোদয় ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিলেন। এক দিবস কেশব বাবুর স্থাপিত স্ত্রীলোকদিগের স্কুলে, কেশব বাবু, গোস্বামী মহাশয় অহিংসা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। পরে হিংসা কাহাকে বলে এই প্রশ্ন করাতে ছাত্রীদের মধ্যে সকলেই নিজ নিজ উত্তর দিলেন। তৎপর কেশবচন্দ্র সেন ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হিংসা কাহাকে বলে? যোগমায়া এমনই সরল ও নির্ম্মল ছিলেন, যেন বোধ হইতে লাগিল, হিংসা কাহাকে বলে এ সংস্কারও তাঁহার অন্তরে ছিল না। তিনি উত্তর করিলেন, হিংসার বাড়ী কোথায়? সে কোথায় থাকে? এই উত্তর শুনিয়া কেশবচন্দ্র সেন ও গোস্বামী মহাশয় হিংসার যথার্থ অর্থ বুঝাইতে উদ্যত হওয়ায় সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাদিগকে হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করাতে তাহারা নিরস্ত হইলেন। অঘোর বাবু বলিলেন,—ইঁহাকে হিংসার কোন ব্যাখ্যা শুনাইও না, ইঁহার অন্তরে হিংসার সংস্কার মাত্র নাই। গোঁস্বামী মহাশয় ও অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় সেই স্কুলের শিক্ষকতাকার্য্য করিতেন। যোগমায়া দেবী তথায় পড়িতেন।

বৃত্তির মধ্যে হিংসাবৃত্তি অতীব ভয়ঙ্কর জানিয়া বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" শিক্ষা দিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে ঋষিরা যাহাকে শনি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্ম যাহাকে ডেবিল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মুসলমান ধর্ম্মে যাহাকে শয়তান বলিয়াছেন, বৌদ্ধেরা তাহাকে হিংসা বলিয়া বিনাশ করিতেছিলেন। ২৪ জন বুদ্ধের মধ্যে শেষ বুদ্ধ শাক্যসিংহ। তাঁহাদের প্রথম ২৩ জন বুদ্ধ, এই হিংসাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু বিনাশ করিতে পারেন নাই। কেবল শেষ বুদ্ধ শাক্যসিংহ, যখন

নির্ব্বাণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনই, মার (কাম) ও হিংসা, ইহাকেই তিনি মার মার করিয়া বিনাশ করিয়া "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই বাক্যের জয়-নিশান এই আর্য্যাবর্ত্তে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পশুহিংসা, নরবলি এবং যজ্ঞেতে পশুমাংস ও নরমাংস আহুতি দেওয়া প্রভৃতি অথর্ব্ববেদীয় ক্রিয়া-কলাপকে অস্বীকার করিয়া "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং, সদয়হৃদয়-দর্শিতপশুঘাতং। কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে!" এই বাক্যের সার্থকতা করিয়া চতুর্ব্বিংশ বুদ্ধ শাক্যসিংহ, দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতারের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম ২৩ জন বুদ্ধ ভগবানের ১০ অবতারের মধ্যে কোন আসন পাইতে পারেন নাই, কেবল শাক্য-সিংহই পাইয়াছিলেন। তাই বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৌদ্ধদিগের জয়নিশান উড়িতেছে। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" সাধন করিতে করিতে পৃথিবীর নরনারী সকলে আহার সম্বন্ধে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া ফল-মূল শস্যাদি দ্বারা দেবতাদিগের ভোগ দিতে লাগিল। কালী, তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা দেবীদিগের নিকট পশুহত্যা, নরবলি প্রভৃতি না হইয়া ইক্ষুদণ্ড এবং ফল প্রভৃতি বলি হইতে লাগিল। বলি অর্থ পূজার উপহার। তন্ত্রেতে মহামাংস এবং কারণযুক্ত যে যে ভোগকে মহাপ্রসাদ বলা হইত, তৎপরে তাহার স্থানে অন্ন এবং কৃষিজাত শস্যাদির ভোগ মহাপ্রসাদ নামে অভিহিত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অহিংসা পরম ধর্ম্মের ভাব আমাদের গুরু-মাতার অন্তরে নিহিত ছিল। হিংসা কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না, হিংসার বাড়ী কোথায় তাহা তিনি জানিতে চান। ফলতঃ আমি যখন তাঁহার বিষয় চিন্তা করি, শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে কাহারও নিন্দা এবং অনিষ্টচিন্তা ও হিংসাদির ভাব, কোন দিন আমার নিকট প্রকাশ হয় নাই। তিনি আমাদিগের সকলকেই সন্তানের মত দেখিতেন এবং সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন।

ব্রাহ্ম পল্লীতে থাকা কালীন আমার অধিকাংশ সময়ই গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে বসিয়া থাকিতে হইত। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নির্জ্জন উপাসনাদি কার্য্য সমাপনানন্তর আমি গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বসিতাম। এই সময়ে দেখিতাম তিনি ভক্তমালাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ মনে মনে পাঠ করিতেন। পাঠ করিবার সময় তিনি যোগাসন করিয়াই ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতেন। প্রতিদিন যাওয়া আসা থাকায় আমাদের গুরুমাতা আমাকে বিশেষরূপে চিনিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার স্বভাবে এমন লজ্জাশীলতা ও গম্ভীরতা দেখিয়াছি যে, তিনি আমার সঙ্গে কথা প্রায়শঃ বলিতেন না। কিন্তু ঐ পল্লীর অন্যান্য ব্রাহ্মিকাদিগের সহিত আমি পরিচিত হওয়াতে তাঁহারা সকলেই আমার সহিত বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় প্রথানুসারে স্বাধীনভাবে আলাপ করিতেন, বরং মহিলারা ইউরোপীয় মহিলাদিগের অনুকরণ করিয়া বুটজুতা ও মাথায় টুপী পরিয়া সমাজে গমনাগমন করিতেন। যোগমায়া ঠাকুরাণীর পরিচ্ছদ কি ব্যবহারাদি সে প্রকার ছিল না। তাঁহার মধ্যে বিশেষ কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইত। এই কারণে তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অকৃষ্ট হয়। এক দিবস সন্ধ্যার সময় আমি ভ্রমণ করিতে করিতে যোগমায়া ঠাকুরাণীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি তাঁহার সন্তানাদি সঙ্গে করিয়া তিনি বারান্দায় বসিয়াছেন ; আমি গিয়া তাঁহার নিকটে বসিলাম। বসিবামাত্র তাঁহার কন্যা শান্তিসুধাকে বলিলেন, একটী ব্রহ্মসঙ্গীত কর। সে কথাটি যে ভাবে বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই বুঝিয়াছিলাম যে আমাকে শুনাইবার জন্যই ঐ গান করিতে বলিলেন। দেখ কি আশ্চর্য্য !! ঐ পাড়ার অন্য বাড়ীতেও যাইতাম, কেবল তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রীধর বাবু, কেমন আছেন ? কি জন্য আসিয়াছেন ? কিন্তু যোগমায়া দেবীর গৃহে যাওয়া মাত্র, তিনি তাহা কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার কন্যার দ্বারা আমাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনাইলেন। এই প্রকারে তাঁহার প্রতি

আমার এক গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। আমি যখনই গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে যাইতাম, তখনই প্রায়শঃই দেখিতাম যোগমায়াদেবী গৃহকার্য্যাদি করিতেছেন। কি প্রকারে সন্তানাদি প্রতিপালন করেন, কি প্রকারে তাঁহার স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহার কার্য্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতাম। দেখিতাম তিনি অধিক সময়ই গৃহকার্য্য অতি শান্তভাবে নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিছুদিন পরে জানিলাম যে তাঁহার সন্তানদিগকে তিনি এই প্রকার প্রতিপালন করিয়াছেন যে, তাহারা অন্যান্য বালকবালিকার ন্যায় কি খাব, কি খাব বলিয়া কোলাহল করিয়া গৃহের শান্তিভঙ্গ করে না। ফলতঃ তাঁহার প্রভাবে তাঁহার গৃহ একটী শান্তির আলয় বলিয়া বোধ হইত। এই পরিবারের সঙ্গে এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে এবং মধ্যে মধ্যে যোগমায়াদেবীর গৃহে আহারাদি করাতে আমি ক্রমে জানিতে পারিলাম যে তাঁহাদের অত্যন্ত অর্থকষ্ট। সময়ে সময়ে অর্থাভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হয়। তখন মনে মনে ভাবিতাম, আমার হাতে যদি টাকা থাকিত, তবে ইহাঁদের সাহায্য করিতাম।

এক সময় মাঘোৎসব হইতেছিল। একটী ব্রাহ্ম আমার নিকট আসিয়া আমার হাতে একটী আধুলি দিয়া বলিলেন তুমি ইহার দ্বারা কিছু কিনিয়া খাইও। আমি সেই আধুলি হাতে করিয়া রাখিয়াছি, এমন সময় দেখি বালিকাদিগের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের শান্তিসুধানাম্নী কন্যা বেড়াইতেছেন। আমি ঐ আধুলি তাহার হস্তে প্রদান করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ বালিকাটী আমার নিকট আসিয়া ঐ আধুলি আমার হস্তে দিয়া বলিল; শ্রীধর বাবু! আমার সমবয়স্কা একটী বালিকার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে উপাসনা হইবে, আমার ইচ্ছা হইতেছে কিছু ফুলের মালা ও কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রী তাহাকে দিই, তুমি এই আধুলি লইয়া বাজার হইতে ইহা কিনিয়া আনিয়া দেও। তখন আমি সেই আধুলি তাহার হাত হইতে গ্রহণ করিয়া যোগমায়া দেবীর গৃহে

যাইয়া তাঁহার হাতে সেই আধুলি প্রদান করিলাম, এবং বলিলাম যে এই আধুলি আপনার কন্যার হাতে প্রদান করিয়াছিলাম। সে এই প্রকার ফুল ও খাদ্যদ্রব্যাদি কিনিয়া আনিতে বলায় জানিলাম যে আপনার কন্যা অর্থ-ব্যবহার শিক্ষা করে নাই। এই আধুলি দিয়া আপনাদের প্রয়োজন যাহা হয় তাহা কিনিয়া লউন। তিনি ঐ আধুলি গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে আমি আর তাঁহাকে কোন দ্রব্যাদি প্রদান করি নাই। একজনকে ভালবাসিয়া দ্রব্যাদি-আদানপ্রদানে যে একটী গূঢ় সম্বন্ধ জন্মে, এই ঘটনা হইতে আমার গুরুপত্নীর সঙ্গে সেই সম্বন্ধের সূত্রপাত হইল। তৎপরে ঐ পাড়ায় থাকা কালীন গোস্বামী মহাশয় প্রতিদিন চা খান জানিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহ হইতে এক কৌটা উৎকৃষ্ট চা লইয়া গিয়া যোগমায়া ঠাকুরাণীর হস্তে দিয়া বলিলাম, গোস্বামী মহাশয় প্রতিদিন চা খান, তাঁহার সেবার জন্য এই চা দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন।

এ পর্য্যন্ত যোগময়া দেবীকে তাঁহার স্বামীর নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে দেখি নাই। এক দিবস আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়াছি, দেখি যোগমায়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাঁহার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন, এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমার সেখানে থাকা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া আমি অন্যত্র চলিয়া গেলাম। আর এক দিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়াছি, দেখি যোগমায়াদেবী তাঁহার কাপড় রাখিবার বাক্স খুলিয়া কাপড় রাখিতেছেন, গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া কৌতুক করিয়া বাক্সস্থিত একখানা উৎকৃষ্ট রেশমী কাপড়ে অঙ্গুলি দিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন ঐ পট্টবস্ত্র খানা আমাকে প্রদান কর, আমি গৈরিক করিয়া পরি। ইহা দেখিয়া বেশীক্ষণ তথায় থাকা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া চলিয়া গেলাম।

এই প্রকারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে থাকা কালীন গুরু ও গুরুমাতা একত্র

বসিয়া আলাপ করিতেছেন, ইহা দুই দিন মাত্র দেখিয়াছি। ৩।৪ বৎসর মধ্যে এই দুই দিন মাত্র তাঁহাদের উভয়কে একত্র হইয়া কথা কহিতে দেখিলাম। কিন্তু ঐ পাড়াতে যত পরিবার ছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা থাকা হেতু বর্ত্তমান সভ্য সমাজের লোকদিগের ন্যায় আপন আপন স্বামীর সঙ্গে সাহেবদিগের অনুকরণ করিয়া আলাপাদি করিতেন। প্রাচীন হিন্দুসমাজের ভাব তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সেই ভাবটী কেবল গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে লক্ষিত হইত। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার স্ত্রীর সহিত এই প্রকার বিলাতি সভ্যতার অনুকরণ করিয়া ব্যবহার এবং আলাপ করিতেন না। এক ঘটনাক্রমে কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে থাকা কালীন যোগমায়াঠাকুরাণীর অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে সভ্য সমাজের বেশভূষাদির দ্বারা সাজাইয়াছিলেন। নূতন উদ্যমে যে ঘটনাতে এই প্রকার করিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুই নহে। এই হিন্দুসমাজের পরিচ্ছদাদি সংস্কার করিতে ইচ্ছা করিয়া তখন তাঁহাদের সংস্কারকদলের লোকেরা যে পরিচ্ছদকে অনুমোদন করিতেন, সেই পরিচ্ছদাদি তিনি তাঁহার স্ত্রীকে পরাইতেন। অল্প কয়েক দিন পরেই যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পরিচ্ছদের জন্য এত অর্থ ব্যয় করিয়া অর্থের অপব্যবহার করা উচিত নহে, তখন তিনি এই ভাবিয়াই, তৎপরে দেশীয় প্রথানুসারে নিজেও সামান্য পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতেন ও তাঁহার পত্নীও সেইরূপ করিতেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে থাকা কালীন যোগমায়া দেবীর সঙ্গে আমার এই পরিচয় হইয়াছিল।

আমি বিদ্যারত্ন (রামকুমার ভট্টাচার্য্য) মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার প্রচারকার্য্যের সাহায্য করিতাম। যে সময়ে আমাদের গুরুদেব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, তখন তিনিও একজন প্রচারক ছিলেন। আমি প্রচারক বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে থাকাতে তাঁহার স্ত্রী আমাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন।

মানস-সরোবরস্থ মহাত্মা পরমহংসজীর আদেশক্রমে গোস্বামী মহাশয় সাধন দিতে আরম্ভ করিলে,আমি সেই সাধনে দীক্ষিত হইবার জন্য ঢাকায় গমন করিলাম। তথায় সাধনে দীক্ষিত হইয়া যোগমায়া দেবীর গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন। সাধন পাওয়ার পর আমার অবস্থান্তর হওয়াতে আমি প্রায়শঃই বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিতাম। এজন্য সকলে আমাকে বায়ুগ্রস্ত মনে করিত, এমন কি কোন কোন গুরু ভাই, আমি উন্মাদ হইয়াছি এই প্রকার বলিত। এই উন্মত্ত অবস্থাতে যোগমায়া ঠাকুরাণী আমার অবস্থার প্রতি সহানুভূতি করিয়া স্নেহের সহিত আমাকে খাওয়াইতেন এবং সান্ত্বনা করিতেন। এই সময়ে তথাকার ব্রাহ্মদের সহিত মতভেদ হওয়াতে গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা পাতলা খাঁর গলির সিকওয়ালা বাসায় বাস করিতে লাগিলেন।

—০—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা দেবী।

৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় তদীয় পত্নী মনোরমা দেবীর বিস্তৃত জীবনচরিত মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব আমরা অতি সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিব।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে পরলোকগতা মনোরমা দেবী ঠাকুরের সাধনবলে জীবনে কিরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াছেন। এক দিন শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয় মনোরমা দেবীর সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন মনোরমা সমাধিস্থ হইয়া ২৮ ঘণ্টাকাল বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দপূর্ণ নিরাময় অবস্থায় আসনে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি জোড় হস্তে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। চক্ষু হইতে মাঝে মাঝে টস্ টস্ করিয়া অশ্রু পড়িতেছে, মুখে অপূর্ব্ব লাবণ্য খেলিতেছে, চারিদিকে আনন্দ প্রবাহ উছলিয়া উঠিয়াছে, এক আশ্চর্য্য ছটা শরীর হইতে নির্গত হইতেছে। তিনি স্থির, গম্ভীর ও অটল অচলের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সমাধিস্থ অবস্থা আমি এই প্রথম দর্শন করিলাম। যথার্থই যেন একটি দেবী দর্শন করিলাম, শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলাম। ব্রাহ্মেরা তথায় খোল করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তনাদি করিলেন। কিন্তু ঐ সঙ্গীত ও কীর্ত্তনশব্দে কিছুতেই তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মনে হইল যেন একটি মৌমাছি মধুপানে মত্ত ও বিভোর হইয়া মধুর সাগরে ডুবিয়াছে। তিনি সমাধি হইতে উঠিলে সকলের প্ররোচনায় স্বামী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যে খোল বাজাইয়া কীর্ত্তনাদি হইল, তুমি কি তাহা জানিতে পারিয়াছিলে? তিনি

বলিলেন কাণে একটু একটু প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই আনন্দের নিকটে এ সকল পশিতেই পায় না।

মনোরমা দেবীর মুখশ্রী কখন কখন ভাবে যেন পদ্ম ফুলের মত ফুটিয়া উঠিত ; মুখ যেন ভাবে ডগমগ করিতেছে, ভাবে বিহ্বল হইয়াও তিনি স্থির আছেন, সময়ে সময়ে দেখা যাইত—অরুণবর্ণ হইয়া আয়তনেও যেন বড় দেখাইত। ভগবৎসম্মিলনে ভক্তের মাধুর্য্যের কি তুলনা হয় ?

এমন সত্যপরায়ণা, পতিব্রতা, দয়াশীলা, প্রিয়ংবদা, কষ্টসহিষ্ণু, গুরুতে একান্ত নিষ্ঠাবতী, শান্তপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমতী নারী ইহ সংসারে অতীব দুর্ল্লভ। তিনি এমনই স্নেহময়ী ছিলেন যে তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই আপনার হইয়া যাইত। যাঁহারা একবার তাঁহার সংস্রবে গিয়াছেন, তাঁহারা এ জীবনে তাঁহার সদ্ব্যবহারের কথা ভুলিতে পারিবেন না। তিনি স্বামী সহ ৫।৬টি পুত্রকন্যা ও আত্মীয়স্বজন লইয়া একেবারে নিরাশ্রয় অবস্থায় নানাস্থানে কেবল-মাত্র ভগবানের দিকে তাকাইয়া গুরুর উপদেশে আকাশবৃত্তি-অবলম্বনে চলিয়া ছিলেন। কখনও কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে ম্লান বা দুঃখিত হইতে দেখা যায় নাই। এই সকলই ত ভগবদ্‌বিশ্বাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গৃহস্থাশ্রমে ইদানীং এরূপ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি সৌভাগ্যবলে সদাশয়, উদার, পূতচরিত্র, ধার্ম্মিক পতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পুত্রকন্যাগুলিও এমনই মাতৃপিতৃভক্ত, শান্ত এবং চরিত্রবান্ যে নিজেদের কষ্টের কথা মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট কখনও বলে নাই। সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্টচিত্ত, মাতা পিতাকে ইহারা কখনও কোন বিষয়ের জন্য বিরক্ত করে নাই দেখিয়াছি।

শেষ দিকে মনোরমা দেবীর গুরুদত্ত মন্ত্র আপনাআপনি সর্ব্বদা অবি-শ্রান্ত ভাবে ক্রিয়া করিত ; তিনি স্বামীর নিকটে বলিতেন, 'নাম' ভোলে কি করিয়া ? "নাম" জোর করিয়াও ভোলা যায় না। অল্প বয়সেই ইঁহার কাম-প্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। ইনি স্বামীর প্রীতির নিমিত্তই গার্হস্থ্য-

ধর্ম্ম পালন করিতেন ও সন্তান গর্ভে ধারণ করিতেন। গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "ইনি মুক্তই ছিলেন ; মুক্ত থাকিয়া কিরূপে ঘোর দারিদ্রের মধ্যে অবিচলিতচিত্তে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে পারা যায়, তাহাই দেখাইবার জন্য ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ মনুষ্য বনে জঙ্গলে কোটির মধ্যে গুটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

এক বার ঢাকায় মনোরমা দেবীর পীড়া হওয়ায় চিকিৎসক মাংসের ঝোল খাইতে বলেন। তাহাতে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে গোস্বামী প্রভুর অনুমতি লইবার জন্য মনোরঞ্জন বাবু তাঁহাকে ইহা জানাইলে প্রভু উত্তরে বলিলেন, মনোরমা যদি ইচ্ছা করেন, খাইতে পারেন। এই উত্তর পাইয়া মনোরঞ্জন বাবু মনোরমাকে বলিলেন, গোঁসাই অনুমতি দিয়াছেন। তাহা শুনিয়া মনোরমা বলিলেন, না, ইহাকে অনুমতি বলে না। আর মাংস না খাইলে মানুষ মরিয়া যায়, আমি ইহা বিশ্বাস করি না। সুতরাং তাঁহার মাংস খাওয়া হইল না।

যখন হ্যারিসন রোডের বাটীতে গোস্বামী প্রভু অবস্থিতি করিতেন, তখন মনোরমা দেবী কলিকাতা হইতে একটী দূরদেশে বাস করিতেন। ইঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে গোঁসাইজীর ঘরে নিদ্রিত মোহিনী বাবু স্বপ্ন দেখিলেন, আকাশে একটী জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত হইল, ক্রমে তাহার অভ্যন্তর হইতে মনোরমা দেবী প্রকাশিত হইলেন। ঐ রাত্রিতে শান্তিসুধা ও উমেশবাবু তাঁহার হাস্যময়ী মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। যখন অন্তিমকালে তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য আগ্রহ করা হয়, তখন তিনি বলিলেন, "আমাকে নাম করিতে দাও, ঔষধে কেহ বাঁচেও না, মরেও না।" তাঁহার শ্রাদ্ধের দিন হ্যারিসন রোডের বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন করান হইয়াছিল। ঐ দিবস গোঁসাই বলিলেন যে, যে ঘৃত খাদ্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য আনা হইহইয়াছে, উহা খারাপ, দোকানে ফিরাইয়া দাও। এরূপ বলিবার কারণ

জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "মনোরমা স্বয়ং আমাকে বলিল, ঘিটা খারাপ।" শ্রাদ্ধের দিন মনোরমা দেবী স্বয়ং সূক্ষ্ম শরীরে আসিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সকলের তৃপ্তির সহিত আহার সম্পন্ন হইলে পর তিনি প্রফুল্লচিত্তে চলিয়া যান। তিনি সূক্ষ্ম শরীরে গোঁসাইজীর ঘরের বারান্দায় আগমন করিয়া পাঠসংকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতেন, এবং স্ত্রীলোকের ঘরে প্রবেশ নিষেধ বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেন না। দেহত্যাগের পরেও তিনি কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন না। এ সকল কথা আমরা গোস্বামী প্রভুর মুখেই শুনিয়াছিলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভক্ত শ্রীধর।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা সব্‌ডিভিজনের অধীন বনগ্রামের নিকট সদরদি গ্রামে শ্রীধরের জন্ম হয়। তিনি আত্মকাহিনী এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—ইংরাজী ১৮৭০ সনে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য আসিয়া জানিলাম যে, শান্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহের সহিত দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এই সংবাদ তৎকালীন মাসিক ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাতে পাঠ করিয়া অকস্মাৎ মনের মধ্যে গোস্বামী মহাশয়কে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। তখন অনুসন্ধানে জানিলাম যে, কেশবচন্দ্র সেনের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা কয়েকজন পটলডাঙ্গার গোলদীঘীর দক্ষিণ পার্শ্বে বাস করেন। আমি ব্রাহ্মদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কোথায়? তাঁহাকে আমি দর্শন করিব। কোন ব্রাহ্ম আমাকে বলিলেন যে, তিনি পাঞ্জাব দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছেন, এক্ষণে কলিকাতায় নাই। ঐ সময় কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। তৎপরে আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্মে কি মত? তিনি আমাকে বলিলেন যে "এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করা এবং পৃথিবীর সমস্ত নরনারীদিগকে ভাই ভগ্নী জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরকে পিতাস্বরূপ জানিয়া সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সংস্থাপন করাই আমাদিগের এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মত। এই ধর্ম্মে জাতির বিচার নাই।" আমি তাঁহার নিকট এই ধর্ম্মের মতের কথা শুনিয়া এই ধর্ম্মে মন আকৃষ্ট হওয়ায় তৎকালীন নিয়মানুসারে মাঘোৎসবের মধ্যে ১০।১২ জন লোকের সহিত দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। সেই দীক্ষার

সময় কেশব চন্দ্র সেন বাঙ্গালাতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই প্রকারে সেই ব্রাহ্মদের সহিত মিশিয়া আমি এক দিবস তাঁহাদের প্রচারকদিগের সহিত আহার করিতেছিলাম; আমাদিগের আহার দেখিবার জন্য কয়েকটী স্ত্রীলোক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। একটী স্ত্রীলোকের অঞ্চল ধরিয়া একটী বালক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং সেই বালকের মাতা আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে আমারও দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া রহিল। তখন আমার পার্শ্বে যে ব্রাহ্ম আহার করিতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ঐ স্ত্রীলোকটী কে? তিনি বলিলেন উনি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী। তৎপরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ঐ বালকটী কে? তিনি বলিলেন ওটী গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র। এই তাঁহার ও আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। তৎপরে জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ১৮৮০ সনে আমি চাকরী করিবার জন্য দারজিলিংএর নিকট জলপাইগুড়ী গমন করি। তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ ছিল। সেই সমাজের উৎসব-উপলক্ষ্যে গোস্বামী মহাশয় তথায় আহুত হইয়াছিলেন।

তৎকালে আমি বেঙ্গল পুলিসের রাইটারীতে ছিলাম। ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয় জলপাইগুড়ী সাম্বাৎসরিক উৎসব-উপলক্ষ্যে ব্রাহ্ম সমাজের রীতি-অনুযায়ী উপাসনা এবং প্রকাশ্যে আর্য্যধর্ম্মের গতি ও তথাকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের যুবকদিগের নৈতিক জীবনের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে দুটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং একদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মদিগকে সঙ্গে করিয়া জলপাইগুড়ী টাউনের নিকটবর্ত্তী ত্রিস্রোতা নদীর তীরে কোন পল্লীগ্রামে করতালমৃদঙ্গসহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার প্রাণে বৈরাগ্যের এক বিশেষ অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে কয়দিন ঐ স্থানে ছিলেন, আমার সংসারের কার্য্য ভাল লাগিত না। বেলা

১০ টার সময় আহারাদি করিয়া পুলিশ কোর্টে গিয়া লেখা পড়ার কার্য্য করিতে হইত। এক দিবস আমি আফিসে গিয়াছি, আমার প্রাণে এই ভাবের উদয় হইল যে, জীবন বৃথা যাইতেছে। এই আফিসের কার্য্যাদি সমস্তই মিথ্যা। এই ভাবিতে ভাবিতে আমি আফিস হইতে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গেলাম। আসিয়া দেখি গোস্বামী মহাশয় ধ্যানস্থ হইয়া স্পন্দহীন অবস্থায় বসিয়া আছেন। বেলা অনুমান ১২ টার সময় হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তিনি এক প্রকার ধ্যানাবস্থায় ছিলেন। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল। দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, আমি যেন প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের মধ্যে কোন মহাযোগীকে দর্শন করিতেছি এবং তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি কি এক আনন্দের সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন। সংসারের অনিত্য বিষয়কোলাহল তাঁহার কর্ণে আর প্রবেশ করিতেছে না। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বাহ্য জগৎ দেখিতেছে না। হস্ত সংসারের সমস্ত কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছে। তাঁহার বিশাল চরণদ্বয় ও কটিদেশ যেন পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যদিগের নিকট ব্রহ্মনামপ্রচারব্রত হইতে অবসর লইয়া সুখাসনে আসীন রহিয়াছে। এই প্রকার তাঁহাকে দর্শন করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল এবং ব্রাহ্মগণ উপাসনার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রীতিমত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পদ্ধতি-অনুসারে উপাসনাপ্রার্থনাদি হইল। উপাসনান্তে তিনি হস্তে করতাল লইয়া বেদিতে বসিয়াই সংকীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার তৎকালীন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই প্রকারে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব সমাপন করিয়া বিশ্রাম জন্য তথাকার মুসলমান ব্রাহ্ম শ্রীযুত জালালুদ্দিন মিঞার বাটীতে গিয়া বসিলেন। ঐ জালালুদ্দিন মিঞা আমার একজন সুপরিচিত ব্রাহ্ম বন্ধু। আমি অধিকাংশ সময়ে তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া আনন্দিত হইতাম।

গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়াই আমার মনে এই ইচ্ছার উদয় হইল যে,

সমস্ত সংসারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকি। কিন্তু আমার মনের কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি আমাকে এই উপদেশ দিলেন, "সংসারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া আমার সঙ্গে যে তুমি থাকিতে চাও, এ একটী তোমার চরিত্রের দুর্ব্বলতা। তোমার অর্থোপার্জ্জন করিতে ভাল লাগে না, আত্মীয় স্বজনের সেবা ভাল লাগে না, তোমার স্ত্রী আছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে তোমার দায়িত্ব, তাহাও যে তোমার ভাল লাগে না, এও তোমার দুর্ব্বলতা। আমার সঙ্গে থাকিবার এখনও তোমার সময় হয় নাই। সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া সংসারেই থাকিতে হইবে। সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাক। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে সময়ে আমার সঙ্গে মিলিতে পারিবে।"

এ কথা তিনি আমাকে বলিলেও এ সময় ঐ উপদেশ আমার অন্তরে কিছুই ভাল লাগিল না। তিনি জলপাইগুড়ী হইতে সিলিগুড়ী ব্রাহ্ম সমাজে চলিয়া গেলেন। আমি আহারাদি করিয়া আফিসে গমন করিলাম। আফিসে যাইয়া আমার অন্তরে আবার এই ভাবের উদয় হইল যে, আমার প্রাণ চাহিতেছে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে যাইব। এই ইচ্ছা যদি পূর্ণ না করিয়া আমি অনিত্য সংসারের কাজে লিপ্ত থাকি, এইটী আমার পক্ষে বিশেষ দুর্ব্বলতা।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি আফিসের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে না বলিয়া শিলিগুড়ী চলিয়া গেলাম। তথায় গিয়া দেখি গোস্বামী মহাশয় শিলিগুড়ীস্থ ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া সমস্ত বাঙ্গালী বাবুদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে,"সংসারের সমস্তই অনিত্য, কেবল ঈশ্বর সত্য; সংসারের সমস্ত কার্য্যই মিথ্যা, ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য। পরকাল, মৃত্যুচিন্তা করা প্রতিদিনের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে একটী কর্ত্তব্য। এই উপদেশ দিতে দিতে সন্ধ্যা সমাগত হইলে সমাজে প্রদীপ জ্বালান হইল। গোস্বামী

মহাশয় বেদিতে বসিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। উপাসনা করিয়া তিনি কোন প্রকার উপদেশ না দিয়া এই প্রকার কথা বলিতে লাগিলেন, “আমি কি দেখিতেছি ? এক জ্যোতির্ম্ময় ধাম, তথায় কতকগুলি লোক যেন কি বলিতেছে ও কি করিতেছে। হে ঈশ্বর ! আমি ইহা কিছুই বুঝিতেছি না, আমাকে দয়া কর।” এই বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ “দয়াময় ঈশ্বর, দয়াময় ঈশ্বর” ভগবানের এই নামই উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। উপাসনা ভঙ্গ হইলে শিলিগুড়ীর একটী ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে গোস্বামী মহাশয় গিয়া অহারাদি করিলেন। আমিও তথায় আহার করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের সহিত এক গৃহে শয়ন করিলাম। গোস্বামী মহাশয় অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের সহিত অনেক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিতে শুনিতে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। এই নিদ্রার সময় আমি একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। সেই স্বপ্ন এই, “যেন হঠাৎ আকাশ হইতে চন্দ্রমণ্ডল আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। আমি দেখিলাম সেই জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল পড়িয়া যেন একটী পরম সুন্দর বালক হইল। সেই বালকটী আমি কোলে করিয়া লইলাম। সে আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিল। সম্বোধন করিবা মাত্র যেন আমার বক্ষঃস্থল হইতে স্তন বাহির হইল এবং সেই বালকটী দুই হাতে আমার স্তন ধরিয়া আমাকে বলিল, মা, আমার নাম ব্রহ্মবিদ্যা, আমি অনেক দিন হইতে নিরাহারে রহিয়াছি, আমায় ক্ষুধা লাগিয়াছে, আমি তোমার স্তন পান করিব।”

স্বপ্নের সেই অংশ ভঙ্গ হইয়া গেলে আমি জাগরিত হইলাম এবং এই স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। এই নিদ্রার অবস্থায় দেখি আমার অন্তর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; আমার চিত্ত হইতে ঘন ঘন এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে “হা চৈতন্য হা চৈতন্য।” একটী কৃষ্ণবর্ণ অতীব দীর্ঘ পুরুষ, মস্তকে জটা, হস্তে একটা লাঠী,

সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে যেন কি এক প্রকার হুঙ্কার শব্দ করিতেছেন। এই পুরুষ শিলিগুড়ীর সম্মুখস্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতীব গম্ভীর স্বরে আমার দিকে তাকাইয়া "ঊর্দ্ধরেতা, শীতল শোণিত" এই দুইটী শব্দ উচ্চারণ করিলেন। এই দুটী শব্দ আমি আর কখন শ্রবণ করি নাই এবং ইহার অর্থই বা কি তাহাও আমি জানি না।

এই একার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল, এবং আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন দেখি গোস্বামী মহাশয় মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে ব্রাহ্মদের সহিত কথা কহিতেছেন। আমি শয্যাতে থাকিয়াই, গোস্বামী মহাশয়ই ঐ রাত্রিতে ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ হইয়া আসিয়া ঐ দুই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস করিয়াই আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, 'গোস্বামী মহাশয়, ঊর্দ্ধরেতা ও শীতল শোণিত, এই দুই শব্দের অর্থ কি ?. গোস্বামী মহাশয় বাহির হইতে উত্তর দিলেন, এই দুই শব্দের অর্থ জানিতে যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ঊর্দ্ধরেতা 'ও শীতল শোণিত হইতে চেষ্টা কর ; তাহা হইলেই এই দুই শব্দের অর্থ জানিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, তুমি শীঘ্র মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া জলপাইগুড়ী যাও, তোমার আফিসের কর্ত্তব্য না করিলে বিশেষ অপরাধ হইতে পারে। তিনি উদ্যোগ করিয়া ঐ দিবস শীঘ্র শীঘ্র জলপাইগুড়ী না পাঠাইলে আমার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত। কারণ, আমি পুলিশের কার্য্য করি। পুলিশের কার্য্যকারকেরা জেলাস্থ ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেনডেণ্টের অনুমতি না লইয়া অন্য জেলায় গমন করিলে তাহাদের অপরাধ হয় এবং দণ্ডবিধি আইন অনুসারে তাহাতে করাদণ্ডের বিধান আছে। বিশেষতঃ যে দিবস আমি শিলিগুড়ী হইতে জলপাইগুড়ী আসিলাম, ঐ দিবস একটী খুনি মোকদ্দমার আসামী ও সাক্ষীদিগকে লইয়া জেলার জজ সাহেবের নিকট সেসন্ আদালতে উপস্থিত

হইবার ভার আমার উপর ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আমি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, ঐ কথা আমার মনে থাকিলেও কোন এক বিশেষ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শিলিগুড়ী গমন করিয়াছিলাম। সেই শক্তি গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গলাভের প্রবল ইচ্ছা। এই ইচ্ছাশক্তি আমার অন্তরে জাগরিত হইত এবং আমি দিবানিশি এই চিন্তাতেই মগ্ন হইতাম। কিসে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিরন্তর গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে থাকিতে পারি এবং আমি যে প্রতিদিন উপাসনা করিতাম, তখন কাতর হইয়া ঈশ্বরের নিকট এই বিষয় প্রার্থনা করিতাম, হে দয়াময় ঈশ্বর! তুমি আমার অন্তরের সমস্ত কথাই জানিতেছ, তোমাকে আর বাক্য দ্বারা কি বলিব, আমার অন্তরের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

আমার স্ত্রী এখন পৃথিবীতে নাই। তাঁহার নাম হরসুন্দরী। এই হরসুন্দরীর সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মানুসারে আমার বিবাহ হইয়াছিল। আমার যখন বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স ২৫ বৎসর, আমার স্ত্রীর বয়স ১২ বৎসর ছিল। একদিবস রাত্রিতে শয়নকক্ষে আমি স্ত্রীকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম যে, তুমি আমার বিমাতার সঙ্গে সর্ব্বদা ঝগড়া করিয়া থাক এবং আমার বিমাতাও সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেন। আমি যাঁহার সেবার জন্য এই সংসারে ছিলাম, তিনি আর এ সংসারে নাই, আমার বিমাতা এক্ষণে বিধবা। তুমি ঝগড়ার সময় সর্ব্বদাই মাকে এই কথা বল যে, তুমি আমার আপন শাশুড়ী নও, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে আসিলে, তুমি যখন গৃহে না থাক, তখন মা আসিয়া আমার হাতে ধরিয়া কাঁদেন এবং তোমার অনেক নিন্দা করেন ও আমাকে বলেন যে বধূমাতা আমার কথার অবাধ্য। এই হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে দিবসে তোমার সহিত আমার কথা কহিবার নিয়ম নাই, তুমিও দিবসে আমার সহিত কোন কথা কহিতে পার না; কিন্তু তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে

আমাকে অন্ন পরিবেশন কর। ধর্ম্মানুসারে স্বামীকে স্ত্রী যদি কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ন পরিবেশন করেন, তবে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, সে গৃহে শান্তি থাকিতে পারে না। যাহা হউক, আজ তোমাকে একটী কথা বলিতেছি; প্রভাত হইলে আমি আর এ গৃহে থাকিব না, চাকরীর জন্য জলপাইগুড়ী ছোট খুড়ার নিকট যাইব। এই কথা বলিয়া আমি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া জলপাইগুড়ী চলিয়া গেলাম। ১৮৮০ সনের মাঘ মাসে আমি জলপাইগুড়ী যাই।

গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমার অন্তরে চৈতন্যের ভাব উদয় হওয়ায় আমি এক দিবস আফিসে যাইয়া পুলিশের কার্য্য পরিত্যাগ করিবার জন্য পুলিশ সাহেবের নিকট আবেদন করিলাম। সাহেব পুলিশের আইন অনুসারে ৩ মাস পরে কার্য্য হইতে অবসর লইতে অনুমতি দিলেন। ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুর মহাশয়কে লিখিলাম যে, আমি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি আর গৃহে যাইব না; আপনার কন্যাকে আপনি আপনার বাড়ীতে লইয়া প্রতিপালন করিবেন। তাহার সঙ্গে আমার আর পত্নীত্বসম্বন্ধ নাই। এই পত্র লখিলে ২।৩ দিনের পর এক দিন প্রাতঃকালে দেখি আমার খুড়া মহাশয়ের বাসায় এক খানা ডুলি আসিল, সঙ্গে আমার শ্বশুর ও শ্যালক; ডুলি হইতে আমার স্ত্রী বাহির হইয়া বাসার মধ্যে আসিলেন। ঐ সময় আমার ছোট খুড়ীও এই স্থানে ছিলেন।

হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে দ্বিতীয় বিবাহ না করিয়াই জলপাইগুড়ী গিয়াছিলাম। খুড়া মহাশয় ও খুড়ী মা বলিলেন, শ্রীধর, অদ্য তোমার দ্বিতীয় বিবাহ করিতে হইবে। আমি বলিলাম আমি ব্রাহ্ম হইয়াছি, জাতি মানি না, দ্বিতীয় বিবাহও মানিনা, আমি মুসলমানের সহিত একত্র আহার করিয়াছি; আমি দ্বিতীয় বিবাহ করিব না। এই কথা শুনিয়া সকলে আমাকে হাসিয়া বলিলেন, তোমার বিবাহ করিতেই হইবে। যাঁহাদিগকে ভক্তি করি,

তাঁহারাও বলিলেন। তদনুসারে আমি দ্বিতীয় বিবাহ করিলাম। ইহাতে ব্রাহ্মরা আমাকে পরিত্যাগ করিল এবং আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের লিষ্ট্ হইতে আমার নাম কাটিয়া দিল।

আমি পুলিশের কার্য্য ইস্তাফা দিয়া গোস্বামী মহাশয়কে পত্র লিখিলাম যে, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব। তদুত্তরে তিনি বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় দ্বারা আমাকে এক পত্র লেখাইলেন যে, এক্ষণে কার্য্য পরিত্যাগ করিও না, সময় হইলে আমার সঙ্গে মিশিতে পারিবে।

ক্রমে জলপাইগুড়ী ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বাৎসরিক উৎসব আসিয়া উপস্থিত হইলে সেই উপলক্ষ্যে, ব্রাহ্মরা গোস্বামী মহাশয়কে আসিতে পত্র লিখিলেন; তিনিও আসিলেন এবং উৎসবান্তে দারজিলিং গমন করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত ডাইরী এই :—

১৮০৪ শক, ১০ই শ্রাবণ, সোমবার, ৩টার ট্রেনে শিয়ালদহে উঠিয়া রাত্রি ৩॥ টার সময় সোদপুর উপস্থিত হইলাম। পথে বড় মানসিক কষ্ট পাইয়াছি, মনুষ্যের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা জনসমাজকে স্বাস্থ্যহীন করিতেছে। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ ॥"

দারজিলিং হইতে পুনরায় জলপাইগুড়ী আসিলেন। দারজিলিং প্রাচীন পৌরাণিক দুর্জ্জয়লিঙ্গ স্থানের নিকট তিনি এক বৌদ্ধ মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঐ পুরুষ তাঁহার নিকট প্রথমতঃ পাঞ্চভৌতিক দেহে প্রকাশিত হইয়া তৎপরে এক জ্যোতির্ম্ময় রূপ তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোস্বামী মহাশয় বলিতেন যেন একটী লণ্ঠনের মধ্যে বাতি রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি ধর্ম্মোপদেশ যাচ্ঞা করিলেন। তদুত্তরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তোমার কি সদ্গুরু মিলিয়াছে? তিনি বলিলেন, "সদ্গুরুর অনুসন্ধানে আমি ভারতবর্ষের প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিশিয়াছি, আমার মনের

মত গুরু কোন স্থানে মিলিল না। যে কয়েক জন গুরুর সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে, তাঁহারা এক জনও আমার মনের মত হন নাই। আমি সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানের জন্যই ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের এই উচ্চ শৃঙ্গে আসিয়াছি। অদ্য আপনাকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইতেছে। আপনাকে আমি সদ্‌গুরু-রূপে বরণ করিতেছি। আপনি আমাকে যোগ সম্বন্ধে শেষ উপদেশ প্রদান করুন।” তাহাতে ঐ লামা গুরু বলিলেন, তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর। অচির কাল মধ্যে তোমার গুরু মিলিবে। আমি তোমার গুরু নহি, কিন্তু তোমার সদ্‌গুরু মিলিবে; সদ্‌গুরু পাইবার পক্ষে আমি তোমার সাহায্য করিব। এই সকল কথা তিনি আমার নিকট আসিয়া ব্যক্ত করিলেন এবং আমাকে দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের এক নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া লইয়া পরমেশ্বরের একটি বিশেষ নাম শুনাইয়া বলিলেন, তুমি এই নামটি সর্ব্বদা জপ করিও এবং গভীর রাত্রিতে যখন সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ হইবে, তখন পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন, এইটি চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে উপাসনা প্রার্থনানুসারে ধ্যান করিও। ঐ দিবস আমাকে এই উপদেশ দিয়া তিনি জালালুদ্দিন মিঞার বাসায় বসিয়া আছেন, এমন সময় কলিকাতা হইতে তাঁহার নামে পত্র আসিল। ঐ পত্রে তাঁহার পত্নী যোগমায়া ঠাকুরাণীর পীড়া সম্বন্ধে লেখা আছে যে, বাতরোগে তাঁহার সর্ব্বশরীর ফুলিয়া গিয়াছে, তিনি আর চলিতে পারিতেছেন না। গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে বলিলেন, কয়েকদিন তোমাদের মধ্যে আমার থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার স্ত্রীর এইরূপ পীড়ার সংবাদ পাইয়াছি, বোধ হয়, তিনি আর বাঁচিতেছেন না। চিকিৎসার জন্য ও শুশ্রূষার জন্য কলিকাতায় আমাদের বাসায় আর কোন লোক নাই। আমি কলিকাতা চলিলাম। এই কথা বলিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে পাঞ্জাব দেশ হইতে আগত এক ফকিরের [illegible] আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নাম কম্বলী সা,

তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত বাল্যকালে খেলা করিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স ১০৫ বৎসর। ঐ ফকীর প্রথমতঃ আমাকে দেখিয়াই হাসিতে লাগিলেন এবং আমাকে হিন্দিতে বলিলেন, তোমার স্ত্রীর গর্ভ হইতে এক মৃত কন্যা বাহির হইয়া গর্ভস্রাব হইয়াছিল। সম্প্রতি তোমার স্ত্রী গর্ভবতী, এই গর্ভকে কোন পরী আসিয়া আবরণ করিয়াছে। সেই পরী তোমার স্ত্রী ও গর্ভস্থ সন্তানকে লইয়া যাইবে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমাকে কিছু বক্‌রীর মাংস, মহিষের ঘৃত এবং লোবাং (ধূনার মত) আনিয়া দিলে আমি এক ঔষধ দিয়া তোমার স্ত্রীকে ও সন্তানকে রক্ষা করিতে পারি। ঐ ফকিরকে দর্শন করিয়া আমার অন্তরে সংসারত্যাগের ইচ্ছাই প্রবল হইয়াছিল। স্ত্রী ও সন্তানকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল না। আমি তাঁহাকে কাতরভাবে বলিলাম, স্ত্রী পুত্র দিয়া আমি কি করিব? আপনার হাতে যে তস্‌বী (মালা) আছে এবং যে মালা আপনি সর্ব্বদা জপ করিতেছেন, ঐ মালা আমাকে প্রদান করুন; আমি পরমেশ্বরের নাম এই প্রকারে জপ করিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রী পুত্র থাকিলে সর্ব্বদা জপ করিতে পারিব না। এই কথা শ্রবণ করিয়া কম্বলী সা ফকীর মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, অদ্য নিশীথকালে যখন আমার নিকট কেহ থাকিবে না তখন আসিও। আমি নিশীথে আগমন করিলে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া জলপাইগুড়ীর নিকটস্থ ত্রিস্রোতা নদীর তীরে লইয়া গেলেন এবং একটি স্থানে আমাকে বসাইলেন এবং আমাকে বলিলেন, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি কর, আকাশের নক্ষত্রদিগকে দর্শন কর। এই বলিয়া তিনি আমাকে মুসলমান ফকীরদিগের প্রথানুসারে দীক্ষা দিয়া দারজিলিং চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার অনতিবিলম্বেই বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আমাকে নিকটে ডাকিয়া এই দুইটি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন। (১) যতকাল পৃথিবীতে থাকিবে, বেতন গ্রহণ করিয়া

কাহারও চাকুরী করিতে পারিবে না। (২) অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারিবে না। এই দুই প্রতিজ্ঞা আমার করা হইলে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে স্থানে ঐ ফকীর আমাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার মৃতদেহ ভস্ম করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে আমি কলিকাতায় আসিলাম এবং শুনিতে পাইলাম গোস্বামী মহাশয় গয়া হইতে কোন মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চলিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিকট কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। সেই বাড়ীর দ্বারদেশে গিয়া আমি উপস্থিত হইলাম। দেখি একটি যুবা পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে বলিলাম তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন, আমার নাম যোগজীবন। আমি বলিলাম, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন? তিনি বলিলেন, তিনি আমার পিতা হন। তিনি এই বাড়ীর উপরে এক ঘরে আছেন। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি গিয়া তোমার পিতাকে বল যে জলপাইগুড়ি হইতে শ্রীধর বাবু আসিয়াছেন। অল্পক্ষণ পরেই ঐ বালকটি আসিয়া আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গেল। আমি গোস্বামী মহাশয়ের ঘরে গিয়া দেখি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, শ্রীধর বাবু! আপনার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। জীবনের অনেক ঘটনার মধ্য দিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, বেশ হইয়াছে, এখন দুজনে ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, তিনি উপাসনা ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। উপাসনা শেষ হইলে আমি চক্ষু খুলিয়া দেখি গৃহের মধ্যে একটি শ্যামাঙ্গী স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। আমি তাঁহার দিকে তাকাইলে পরিচয় না থাকাতে তিনি লজ্জিত হইয়া বাহির হইতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া চক্ষু খুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, লজ্জা করিও না। ইনি শ্রীধর বাবু,

ইনি আমাদের আপন লোক, ইহাঁর নিকট কোন লজ্জা নাই। তৎপরে তিনি গমন করিলেন না। ইত্যবসরে গোস্বামী মহাশয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া ঐ গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আমার সম্মুখে ঐ শ্যামাঙ্গী স্ত্রীলোকটিই দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক দৃষ্টি করিয়া হঠাৎ আমার অন্তরে যেন কি ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমার ক্রন্দন সম্বরণ হইলে গোস্বামী মহাশয় পুনরায় আসনে আসিয়া বসিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটি উপর হইতে নীচে চলিয়া গেলেন। ভাবগতিকে বুঝিলাম ইনি গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী। তৎপর গোস্বামী মহাশয় আমাকে পাউরুটি ও গরম চা খাওয়াইলেন। ইহা খাইয়া আমি শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসায় চলিয়া গেলাম। কারণ, তিনি আমাকে জলপাইগুড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা আনিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীকে আমি মা বলিতাম।

—o—

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত দ্বারভাঙ্গাতে এক সময়ে শ্রীধর, পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় ও আমি ছিলাম। তখন আমাদের চারিজনের খুব প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল। আমরা পরস্পর আলাপ করিয়া খুব তৃপ্তি লাভ করিতাম। সেই কথা স্মরণ করিয়া শ্রীধর, পণ্ডিত মহাশয়কে, মহেন্দ্র বাবুকে ও আমাকে স্থানে স্থানে মাঝে মাঝে বলিতেন, দাদা ! আমরা সেই চারিজন। শ্রীধর ঢাকাতে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীধরের প্রবল বৈরাগ্য ছিল। তাঁহার পরিধানের জন্য মাত্র একটী কম্বলের আল্‌খেল্লা, বহির্ব্বাস ও লেঙ্গট ছিল। শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি সকল ঋতুতেই উহাই ব্যবহার করিতেন। শ্রীধর বিলাসিতা ভাল বাসিতেন না,

কাহারও দুঃখ দেখিলে কাতর হইতেন। নিজের নিকটে কিছু দিবার মত না থাকিলে, অন্যের নিকটে এমন কাতর ও ব্যাকুল হইয়া তাহা চাহিয়া লইয়া সেই দুঃখী ব্যক্তিকে তাহা দিয়া দিতেন, দেখিলে মনে হইত যেন সে কষ্ট তাঁহারই হইয়াছে। একবার দ্বারভাঙ্গা অবস্থিতিকালে আমার নিকটে চারিটী মোটা জিন কাপড়ের ভাল জামা ছিল; ঐ গুলি তিনি আমার নিকটে ক্রমে ক্রমে চাহিয়া লইলেন। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া তাহা না দিয়া পারিলাম না। তিনি তাহা লইয়া এক একটী কাঙ্গালীকে দিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার সে ভাব দেখিলেও আনন্দ হইত। শ্রীধরের অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতি ছিল। এক সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া বিপিনবিহারী রায় মহাশয় আমাদিগকে অনুরোধ করিলে আমরা বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকটে যাই; তখন শ্রীধরও আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকেও সঙ্গে লওয়া হইল। উক্ত বিপিন বাবুর হাঁপানীকাসির পীড়া ছিল। ব্রহ্মচারী মহাশয় অনেক উৎকট রোগগ্রস্ত রোগীকে ভাল করিয়াছেন, তাহা জানিয়াই তাঁহার তথায় যাওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তিনিও একজন গুরুভাই। তিনি এক খান নৌকা করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্য ভাল ভাল মিষ্টান্ন ও উৎকৃষ্ট কয়েকটী আম খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। যথাসময়ে আমরা ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ হইতে তাঁহার ঐ সকল সামগ্রী লইয়া নৌকারোহণে বারদী যাত্রা করিলাম। পথে কুতুল্লার বাজারে নৌকা রাখিয়া তিনি এবং আমি আমাদের আহারীয় সামগ্রী খরিদ করিতে উপরে গেলাম। মাঝি একজন সঙ্গে গেল, অন্য একজন ও শ্রীধর নৌকায় রহিলেন। তখন বেলা প্রায় অবসন্ন হইয়াছে। এদিকে তথাকার কাঙ্গালিরা নৌকার ছাদে আসিয়া শ্রীধরের নিকটে কিছু খাইতে চাহিল। তিনি আর কিছু তাহাদিগকে দিতে না পাইয়া বারদীর ব্রাহ্মচারীর জন্য বিপিন বাবু যে সকল সামগ্রী আনিয়াছিলেন, তাহাই ঐ কাঙ্গালীদিগকে দিয়া ফেলিলেন। বিপিন বাবু

নৌকায় আসিবার সময় ঐ সকল সামগ্রী কাঙ্গালীদের হস্তে দেখিতে পাইয়া বিরক্ত হইয়া নৌকায় আসিয়া তাহা শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীধর বলিলেন, হাঁ, দিয়াছি, তার দোষ কি? তিনি শ্রীধরকে তিরস্কারকথা বলিলেন। তখন কাঙ্গালিদের নিকট হইতে আমার কথা মতে কিছু পয়সা তাহাদিগকে দিয়া কয়েকটী আম ফেরত পাইলেন। তাহাই লইয়া আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। আমি নৌকাতে রান্না করিলাম। বিপিন বাবুকে বলিলাম, আপনি একটী প্রদীপ ধরান, ততক্ষণ আমি নৌকার ছাপ্পরের উপরে বসিয়া একটুকু বিশ্রাম করি। তিনি তাহাই করিতে গেলেন। প্রদীপের সলিতার কাপড় নাই, এক পুটুলিতে শ্রীধরের নিকটে ছেঁড়া নেকড়া ছিল, তিনি তাঁহার নিকটে তাহাই একটুকু চাহিলেন, শ্রীধর তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি তদবস্থায় তাঁহার পুঁটুলি হইতে লইলেন, এইজন্য দুইজনে সেই নৌকার মধ্যে বিষম কলহ ও অবশেষে মারামারি উপস্থিত করিলেন। আমি ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া অনেক কষ্টে কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে থামাইয়া দিলাম। শ্রীধরের ঐ এক মাত্র সম্বল ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি। এই কলহের মাধুর্য্য এই যে, বিপিন বাবু জমিদার, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীধর নিষ্কিঞ্চন। তথাপি শ্রীধরের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমরা আহার করিলাম; কিন্তু অনেক বলাতেও শ্রীধর আর আহার করিলেন না। বলিলেন, আমার জ্বর হইয়াছে, বড় শীত করে, আমাকে আগুন জ্বালিয়া দেও। পরে তাহাই করা গেল। আমরা বারদী পৌঁছিলাম। শ্রীধর তথা হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার আর কোনই খোজ খবর পাইলাম না। গত রাত্রির বিবরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে সব বলায়, তিনি বলিলেন, আমি পূর্ব্বেই এসমস্ত জানিতে পারিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, যদি আমরা এখানে থাকিতে শ্রীধরকে না পাই, তবে আপনি তাঁহাকে কোন উপায়ে ঢাকা পাঠাইয়া দিবেন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি শ্রীধরকে পাঠাইয়া দিব। বিপিন বাবুর পীড়ার অবস্থার কথা

তাঁহাকে বলায় তিনি মুখে কিছুই না বলিয়া কয়েকটী লবঙ্গ হস্তে লইয়া এক একটী লবঙ্গ কিছুক্ষণ হাতে চট্‌কাইয়া মুখে ফেলিয়া দিয়া, তাহাই পুনঃ ফুৎকার করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। আমি তাহা দেখিয়া বিপিন বাবুকে বলিলাম, আর দেখ কি? উহাই কুড়াইয়া লও, ঐ তোমার ঔষধ। পরে আমার কথায় তিনি তাহাই করিলেন। উহাই সেবন করিয়া তিনি ভাল হইলেন এবং সেই রাত্রিতে ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে দর্শন দিয়া অনেক উপদেশ দিলেন। তাহা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। আমরা সমস্ত দিন শ্রীধরের অপেক্ষায় তথায় থাকিয়া যখন তাঁহাকে পাইলাম না, তখন আমরা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট বিদায় হইয়া পুনঃ শ্রীধরকে পাঠাইয়া দিবার কথা তাঁহাকে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। কয়েকদিন পরে তিনি শ্রীধরকে ঢাকা পাঠাইয়া ছিলেন।

এক সময় শ্রীধর মেদিনীপুরের প্যারীলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে একখান লুই কাপড় চাহিয়া লইয়াছিলেন। সে বস্ত্রখান নাকি বার টাকায় খরিদ হইয়াছিল শুনিলাম। তাহা একজন শ্রীধরের নিকটে চাহিলেন, তিনি অমনি তাহা তাঁহাকে দিয়া দিলেন। শ্রীধরের কাহারও নিকটে চাহিতেও আট-কাইত না এবং উহা অপরকে দিতেও আটকাইত না। আমরা গোস্বামী মহা-শয়ের সঙ্গে যখন যে স্থানে থাকিতাম, শ্রীধর কখন কোথায় যাইতেন, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। কোথায় তিনি গেলেন এবং কতদিন থাকিবেন, তাহাও কেহ বলিতে পারিতনা। শ্রীধরের কোনই ভ্রূক্ষেপ নাই, কি খাইব, কোথায় থাকিব, এ সমস্ত চিন্তা শ্রীধরের মনে কখনই হইত না। তিনি একেবারে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় যথা তথা ভ্রমণ করিতেন। ঢাকা থাকিতে যোগজীবনের মাতা ঠাকুরাণী তাঁহার আহারের জন্য অন্নাদি রাখিয়া দিতেন; প্রাতে পুনঃ রান্নার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাখিয়া পরে তাহা অপরকে দিয়া দিতেন। এইরূপ এক দিন নয়, কতদিন প্রত্যহ এইরূপ ঘটিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। তাঁহার

এইরূপ ব্যবহারে তাঁহারা কেহই অসন্তুষ্ট হইতেন না। সর্ব্বদা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও সকল আব্দারই অম্লানচিত্তে সহ্য করিতেন।

গোস্বামী মহাশয় বলিতেন, শ্রীধরের বড় সাত্ত্বিক গলা। তাহার তালমান বা রাগরাগিণী বোধ কিছুই নাই; কিন্তু ভাবাবেশে যখন একতারা বাজাইয়া গান ধরে, তখন একতারা ও তাহার গানে এমনই লয় হয় যে, মনে হয় যেন শতশত ভ্রমর গুন্ গুন্ রব করিতেছে। গয়া আকাশগঙ্গাপাহাড়ের রঘুবরদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধরের গান শুনিয়া বলিতেন, "শ্রীধর বাবা, তোম তো ভজনানন্দী হ্যায়, তোমারা ভজন শুন্‌নেসে হামারা চিত্ত ভগবান্‌কো চরণারবিন্দে যানে মাংতা।"

আমরা গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণ ও অবস্থিতি করিয়া অবশেষে কলিকাতা হ্যারিসন রোডের বাসায় কিছু দিন থাকিয়া তাঁহার সহিত ৺পুরীধামে যাত্রা করিলাম ইহা উক্ত হইয়াছে। এখানে গোস্বামী প্রভু দেহ ত্যাগ করিলে আমরা তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিয়া সেই সমাধিস্থানেই বাস করিতে লাগিলাম।

আমি ঘটনাসূত্রে তখন কলিকাতা যাইয়া ১৯নং রাজার লেনে মহেন্দ্রনাথ মিত্র ও মোহনীমোহন রায় মহাশয়দের সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিলাম। তাঁহারা চন্দ্রকুমার বাকচি মহাশয়ের বাসায় আহার করিতেন। আমি তখন নিজেই রান্না করিয়া ঐ বাসায় আহারাদি করিতাম। কিছু দিন পরে একদিন শুনিলাম শ্রীধর ভায়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এখানে শান্তিসুধাদের বাসায় আসিয়াছেন এবং আমাকে একবার যাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য মোহিনী বাবুকে বলিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাদেবী তখন ৪নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, বাদুড়বাগানের বাসায় থাকিতেন। তথায় যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত কষ্টানুভব করিলাম। তখন পরামর্শ করিয়া মোহিনী বাবু ভাল ডাক্তার আনাইয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। ডাক্তার

মহাশয়েরা তাঁহাকে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ইহাঁর অপারেশন্ করিতে হইবে। বক্ষঃস্থলে ডান দিকে একটি ফোড়া হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। যোগজীবন তখন ঐ ব'সাতে ছিলেন। আমি ডাক্তারদিগকে বলিলাম; অপারেশন্ ভিন্ন শুধু ঔষধ দ্বারা এ পীড়া আরোগ্য হইবার কি কোন উপায় নাই? তাঁহারা বলিলেন, না, আমাদের মতে অপারেশন্ ব্যতীত ইহার অপর চিকিৎসা নাই। পুনঃ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অপারেশন করিতে জীবনের ত কোন আশঙ্কা নাই? একজন আমাকে বলিলেন, সে কি কথা! কে এমন সাহস করিয়া বলিবে? তবে অভিজ্ঞতার দ্বারা এই বলিতে পারি যে, এরূপ ক্ষেত্রে অপারেসনে শতকরা ৯৫ জন মারা যায়। আর একজন উঠিয়া বলিলেন, মহাশয়, ৯৯ জনই ধরিয়া রাখুন। আমি বলিলাম, তবে ত একরূপ মৃত্যু জানিয়াই অপারেশন করিতে যাওয়া। আচ্ছা, আমি এক কথা আপনাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি; একবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দেখাইলে কেমন হয়? ইহাতে তাঁহারা বলিলেন, সে ত ভালই, সেও একটা মত, বেশ ত, একবার তাহাই দেখুন; এই বলিয়া তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।

পরামর্শ করিতে ৩।৪ দিন অতীত হইল। তখন আর বিলম্ব করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া আমি সেই দিন মোহিনী রায় ও সামন্তদের মধ্যে আরও দুইজন গুরুভাই সঙ্গে লইয়া বিডনষ্ট্রীটে ডাক্তার ডি এন্ রায় মহাশয়ের বাসায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হইলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার একটী গুরুভাই পীড়িত হইয়া পুরী হইতে এখানে আসিয়াছেন। এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ তাঁহাকে দেখিয়া অপারেসন করিতে চান, তাহা করিলে যে ভাল হইবে, এমন আশা দেন না, বরং মৃত্যুরই সম্ভাবনা আশঙ্কা করেন। এমত স্থলে তোমাকে দেখানই আমাদের সকলের পরামর্শ; তাই তোমার নিকট আসিয়াছি। তিনিও আমার মত দরিদ্র, ভিজিটের প্রত্যাশা নাই, এখন তুমি যাইতে পারিবে কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি যখন

আসিয়াছেন, তখন ভিজিটের কথা কেন বলেন? রোগটা কি? তাঁহারা কি অপারেশন করিতে চান? আমি বলিলাম, বুকে একটা ফোড়া হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি যাব, কিন্তু কাল গেলে হয় না? এখন রাত্রি হইয়াছে, দিনের বেলায় পরীক্ষা করিতে হইবে, রাত্রিতে গেলে তেমন সুবিধা হইবে না। আমি বলিলাম, তা তুমি কাল গেলেও হয়। পরদিন বেলা ১০টার সময় তথায় যাইয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন এবং আমাকে নির্জ্জনে গুটীকত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যাহা জানিতাম তাহা বলিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, ৪।৫ দিনের মধ্যেই ইহাঁর বুকের ফুলা ভাল হইয়া যাইবে, এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে চলা ফেরা করিতে পারিবেন। যে ঔষধ লিখিয়া দিলাম, তাহা একটা তুলার তুলিদ্বারা ফুলাস্থানে দিনে ৩।৪ বার প্রলেপ দিবেন। আর অন্য ঔষধ যাহা দিলাম, তাহা খাইতে দিবেন এবং দুধ, রুটী, সেওয়া ফল, বেদানা, মনক্কা, কিশমিশ প্রভৃতি খাইতে দিবেন।

তিনি চলিয়া গেলেন,তৎপর ঔষধাদি আনিয়া ব্যবস্থামত ব্যবহার করিলাম। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই দেখিতে পাইলাম। ৫ দিনের মধ্যেই ফুলা আর নাই। বক্ষঃস্থল পূর্ব্ববৎ সমান হইয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু আরও ২।৩ দিন আসিয়া রোগীকে দেখিয়া গিয়াছেন। আমি লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া রোজ ১০, ১৷০ বা কোন দিন এক টাকার ঐ সকল ফল আনিয়া দিতাম। দুই সপ্তাহের মধ্যে বাস্তবিকই ডাক্তার বাবু যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহাই দেখিলাম। তখন শ্রীধর লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া নিজের ইচ্ছামত ফরমাইশ দিয়া সেই সকল বস্তু আহার করিতে লাগিলেন। শরীর ক্রমেই অতি সুন্দর হইয়া উঠিতে লাগিল। বর্ণ অতি উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হইল। কখন শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুর বাড়ী, কখন চারুবাবুদের বাড়ী, কখন উমেশ বাবুর বাড়ী, কখন মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দের বাড়ী যাইয়া ঐ সকল বস্তু

আহার করিতেন এবং আমার নিকটেও বাসায় মাঝে মাঝে আসিতেন। শ্রীধরকে ভাল দেখিয়া যোগজীবন শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। যোগজীবন আমাকে বলিলেন, শ্রীধর আর একটু ভাল হইলে তাঁহাকে লইয়া আপনি পুরী যাইবেন। কয়েক দিন পর একদিন আমার নিকটে শ্রীধর আসিয়া বলিলেন, দাদা, আমার এখন পুরী যাইবার জন্য প্রাণ বড় টানিতেছে, আমি এখন পুরী যাইব। আপনাদের চেষ্টাযত্ন ও কৃপাতে আমার শরীর ভাল হইয়াছে। আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ভাই, এমন একটা সঙ্কটপীড়া হইতে ভাল হইয়াছ, একবার ডাক্তারকে না বলিয়া যাওয়া ঠিক নহে। তিনি যদি আরও কিছু দিন থাকিতে বলেন? যদি যাইতে বলেন, তখন যাইতে কোন আপত্তি নাই, না বলিয়া যাওয়া আমার মতে উচিত নহে। তখন শ্রীধর আমাকে বলিলেন, আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তিনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব। আমি বলিলাম সেই ভাল, একবার তাঁহাব নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যাহা বলেন, তোমাকে যাইয়া তাহা বলিব। এই কথার পর শ্রীধর চলিয়া গেলেন। আমি ডাক্তারের নিকট গেলাম। শ্রীধরের পুরী যাইবার ইচ্ছা তাঁহাকে বলিলাম; যদি তাঁহার পুরী যাইয়া তথা হইতে অবস্থা জানাইয়া ঔষধ লইলে চলে, তবে যাইতে পারেন কিনা? তিনি বলিলেন, শ্রীধর বাবু ত এখন চলিতে হাটিতে পারেন, একবার তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিলে হয় না? আমি বলিলাম, আচ্ছা, তবে তাহাই হইবে। কল্য আহারের পরে বৈকালে তাঁহাকে লইয়া এখানে আসিব। এই কথা তাঁহাকে বলিয়া আমি তথা হইতে শ্রীধরের নিকট গেলাম। তথায় যাইয়া দেখি, শ্রীধর শান্তিদের উপরের ঘরে কয়েকটী গুরুভ্রাতার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। তথায় তখন শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র বসু ও শরচ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রভৃতি ছিলেন। আমি ডাক্তারের কথা শ্রীধরকে বলিলাম। শুনিয়া শ্রীধর বলিলেন, তবে আমি কল্য আহারের পরে আপনার

নিকট যাইব। তথা হইতে একসঙ্গে ডাক্তারবাবুর নিকটে যাওয়া যাইবে। তখন রাত্রি প্রায় ৮টা ৮৷টা হইবে।

পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া সন্ধ্যাতর্পণাদি করিয়া আমি যোগেন্দ্র সামন্তদের বাসায় চা খাইতে গেলাম ; আমি মাত্র চা খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় শ্রীযুক্ত মাখনলাল গাঙ্গুলী একখান গাড়ী করিয়া তথায় আসিয়া আমাকে বলিলেন, শ্রীধর ত কল্য রাত্রে দেহ রাখিয়াছেন। আমি এ কথা শুনিয়া একবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। ব্যাপার খানা কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মাখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কল্য রাত্রি ৮৷৯ টার সময় ভাল দেখিয়া আসিলাম, আমার সঙ্গে অদ্য আহারের পরে ডাক্তারের নিকট যাইবার কথা, হঠাৎ এরূপ হইল কেন? মাখন বলিলেন, অধিক রাত্রে, আমি তখন সেই ঘরে ঘুমাইয়াছি, শ্রীধর আমাকে বলিলেন, ভাই, আমার বড় শীত করিতেছে, আমাকে এই খানে একটু আগুন জ্বালাইয়া দে'ও, উপরে জগবন্ধু বাবুর নিকট হইতে কিছু আফিং আনিয়া দেও, তাঁহাকে এবং মহেন্দ্র বাবুকে একবার আমাকে আসিয়া দেখিতে বল। আমি তাঁহার কথামতে উপরে যাইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীধরের কথা বলিলাম ও আফিং আনিয়া দিলাম। জগবন্ধু বাবু নীচে আসিয়া শ্রীধরকে দেখিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তোমার ত মাঝে মাঝে এরূপ হইয়া থাকে, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। মহেন্দ্র বাবু আসিলেন না, তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীধর ঐ আফিং খাইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, ভাই! আমার শীত নিবারণ হইতেছে না। আমার গায়ে লেপ কম্বল দিয়া দেও, এবং আর একটুক আফিং আনিয়া দেও। দেখ, আমি বাঁচিব না, তাঁহাদিগকে আসিয়া একবার আমার নিকট ভগবানের নাম করিতে বল। তখন উপরে গিয়া পুনঃ শ্রীধরের কথা তাঁহাদিগকে বলিলাম, ও আফিং আনিয়া দিলাম ; সে বারে কেহই আসিলেন না। তখন রাত্রি প্রায়

শেষ হইয়া আসিয়াছে। শ্রীধর আফিং খাইলেন, কিছুক্ষণ পরে বসিয়া প্রাণায়াম করিতে লাগিলেন, এবং জড়িত জিহ্বায় অস্পষ্টস্বরে ভগবানের নাম করিতেছেন, শুনিয়া আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। প্রাতে উঠিয়া দেখি, তিনি সাষ্টাঙ্গ দিয়া পড়িয়া আছেন। শরীর কতক বিছানায়, কতক মেজের মধ্যে রহিয়াছে। পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে মেজেতে খড় পাতিয়া তাহার উপর বিছানা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, যেন গুরুদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, শরীর ধরিয়া নাড়িলাম, কোনই সাড়াশব্দ পাইলাম না; কিন্তু শরীর গরম বোধ হইল। এই অবস্থার পরে আপনাকে খবর দিতে আসিয়াছি। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ভাই! কাল রাত্রিতে একবার খবর দিলে না কেন? তিনি বলিলেন, আমি একা কি করি! উহাঁরা কেহই আসিলেন না, রোগীকে একা ফেলিয়া আসি কি করিয়া? তাই আপনাকে সংবাদ দিতে পারি নাই। আমি দেখিলাম, আমার চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম সকলই ত বিফল হইল, এখন সৎকারের কি করা যাইবে সেই ভাবনা হইল। তখন তথায় যোগেন সামন্ত প্রভৃতিকে তাহা বলিয়া দেবেন্দ্র সামন্তদের বাসায় গেলাম। মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়ও সেই স্থানে ছিলেন। সঙ্গে যে গাড়ী ছিল তাহা লইয়াই যাওয়া হইল। মহেন্দ্র বাবু মাখনের নিকটে শ্রীধরের অবস্থার কথা শুনিয়া অতিশয় ম্লান ও দুঃখিত হইয়া আমাদের গাড়ীতেই আসিলেন। তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি অতি ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। আমি গাড়ীতেই রহিলাম, মাখন তাঁহাদের বাসার উপরে গেল। সৎকারের কথা তাঁহাদিগকে বলাতে তাঁহারা সকলেই বলিলেন, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আমরা যাইতেছি। সামন্ত মহাশয়দিগকে সকল সংবাদ দিয়া আমরা শাস্তিদের বাসায় আসিলাম। ইতিমধ্যে তথাকার গুরুভাইভগ্নীগণ সকলেই এ সংবাদ পাইয়া দুঃখিত

হইলেন। মোহিনী বাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, দাদা! কাছারির পর সকলে একত্র হইয়া সৎকার করিতে যাইব। আজ একটুক সকালে আসিতে চেষ্টা করিব। তখন শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেকে আসিলেন, ঐ কথাই স্থির হইল। যথাসময়ে সকলেই উপস্থিত হইলেন, তখন ফুল মালা প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত করতঃ তিলক পরিধান করাইয়া বিমানে উঠাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সে সময় দেখিলাম শ্রীধরের মুখের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। শ্মশানঘাটে যাইয়া গঙ্গাজলে স্নান করিবার পূর্ব্বে শরীর গরম বোধ হওয়ায় আমার মনে সন্দেহ হইল। তখন তথাকার ডাক্তারকে সংবাদ দিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিতে বলায়, তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি উহাঁর পা ধরিয়া ঝাঁকি দেন দেখি। আমি তাহাই করিলাম। পা ধরিয়া ঝাঁকি দেওয়ায় আপাদমস্তক নড়িয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন, এখন আর কোনই সন্দেহ নাই, আপনারা সৎকার করিতে পারেন। পূর্ব্বেই ঘৃত, গুগ্গুল, ধুনা, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি আনা হইয়াছিল। চিতা সজ্জিত হইলে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া চিতার উপরে রক্ষা করা হইল। চিতার চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া আমিই মুখাগ্নি করিলাম। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিলাম। আমরা কয়েক জন হাওড়ার পুলের ঘাটে স্নান করিলাম। তথায় শ্রীধরের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করিলাম। ইহার মধ্যে শ্রীযুত হরগোবিন্দ ও যোগীন সামন্ত মহাশয়গণ কিছু জলযোগের মত লুচি, পুরী, মিষ্টান্ন আনয়ন করিয়াছিলেন এবং আমাদের পরিধানের জন্য এক এক খানা শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিলেন। আমরা স্নানান্তে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া সকলেই জলযোগ করিলাম। পরে স্ব স্ব বাসায় চলিয়া গেলাম।

বাসায় আসিয়া শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু নিদ্রা হইল না। প্রাণে একটা চিন্তা হইল, এত দিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমরা এক সঙ্গে ছিলাম ; এখন শ্রীধরের জন্য কি করা যাইতে পারে। অমনি তখনি মনে হইল, আমার ত নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তবে একবার গুরুভাইদিগকে জানাইয়া অন্ততঃ পোনেরটী টাকা হইলে, পুরী, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে, ও যোগজীবনের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে পাঁচটী করিয়া টাকা পাঠাইতে পারিলে যেন মনে একটু শান্তি হয় ; এই ইচ্ছা হইল। প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় আসিয়া মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে আমার মনের কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, বেশত, তা লিখুন ; আমি বলিলাম, আমি কার্ড দেই, তুমি লিখ। তখন তিনি বলিলেন, তবে আপনি ড্রাফ্‌ট করিয়া দিন। অমি তাহা লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। তিনি বলিলেন বেশ হইয়াছে। "শ্রীধর ভায়ার দেহ রাথায় আমি ইচ্ছা করি, আপনারা যে যাহা অনুগ্রহ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক দিবেন, তাহা পুরী, গেণ্ডারিয়া ও শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার কল্যাণার্থে পাঠাইয়া দিব। উহা শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট তাঁহার বাসার ঠিকানায় পাঠাইবেন।' এই ভাবের চিঠি লেখা হইল। আমি কার্য্যানুরোধে পুরী চলিলাম। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া গেলাম, যদি টাকা আসে, তবে আপনারা তিন স্থানে উহা পাঠাইয়া দিবেন। ৭।৮ দিন পরেই মোহিনী বাবুর পত্র ও মনিঅর্ডার পাইলাম। তাহাতে লেখা ছিল, আপনার কথামতে আমরা শ্রীবৃন্দাবনে যোগজীবনের নিকটে পঞ্চাশ টাকা ও ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বুড় ঠাকুরাণীর নিকটে ২৫৲ পাঁচিশ টাকা, শ্রীধরের ভ্রাতা বিহারী বাবুর নিকটে ১০৲ দশটাকা ও আপনার নিকট ৬০।৬৫৲ টাকা (ঠিক স্মরণ নাই) পাঠাইলাম। আরও প্রয়োজন হইলে লিখিবেন, পাঠাইয়া দিব। আপনি ওখানকার কার্য্য শেষ করিয়া শীঘ্র এখানে আসিবেন। এখানে একটী মহোৎসব করিবার আমাদের ইচ্ছা আছে ; তা আপনি না আসিলে হইবে না ; আপনি

অবশ্য আসিবেন। মোহিনীবাবুর পত্র পাইয়া ঠাকুরের দয়া মনে করিয়া আমার কান্না পাইল। মনে করিলাম, আমি পোনেরটী টাকা পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাতে ঠাকুর এ কি দেখাইলেন? নিঃস্বার্থ কার্য্যে ঠাকুরের এইরূপ দয়া। শ্রীধর ভক্ত, তাঁহার কার্য্যে আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। এখানকার মহোৎসব যথাসময়ে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইল। স্বামী ভূতানন্দ বলিলেন, আমার ওখানে কয়েকটী সাধু, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী ও পরমহংস আছেন, শ্রীধরের কল্যাণার্থ মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাও। আমি বলিলাম, যে আজ্ঞা, কয় টাকা লাগিবে? তিনি বলিলেন, পোনের টাকাতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছা মত ভোগ দিয়া মহাপ্রসাদ তাঁহার তথায় পাঠান হইল; সেই স্থানেই তাঁহারা সেবা করিলেন। পুরীর কার্য্য সমাধা করিয়া মোহিনীবাবুর পত্রানুসারে কলিকাতা আসিলাম। সেখানে স্বামী ভূতানন্দের আদেশে সাধুসেবার জন্য যে পোনের টাকা ধার হইয়াছিল, তাহা তথা হইতে পুরী পাঠাইয়া দিলাম। তখন মোহিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহোৎসব যে করিতে চাও, কত টাকা আছে? তিনি বলিলেন, ৪০।৫০ টাকা হইবে। তাঁহার ইচ্ছার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, ইহাতে মহোৎসব কি করিয়া হয়! গুরুভাই গুরুভগ্নী সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতে চাও এবং মুকুন্দ ঘোষের কীর্ত্তন দিতে চাও, এ টাকাতে কি করিয়া নির্ব্বাহ হইবে? মোহিনী বাবু বলিলেন, নিমন্ত্রিত গুরুভাইভগিনীরাও কি কিছু না দিবেন? আমি বলিলাম সে ভরসায় কাজ করা ঠিক্ নয়। কোথায় মহোৎসব করিতে চাও? তিনি বলিলেন শান্তিদের বাড়ীতে। শ্রীধরেরও এই বাসাতেই মৃত্যু হয়; সুতরাং মোহিনী বাবুরও সেই খানেই মহোৎসব করিবার ইচ্ছা।

এখন দিন স্থির করিয়া মহোৎসবের উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে। দিন স্থির হইল, স্থানে স্থানে নিমন্ত্রণ করিবার ভার মোহিনী বাবু নিজেই গ্রহণ করিলেন। আমাকে বলিলেন, দাদা! আপনাকে মহোৎসবের সমস্ত ভার

গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। আমরা কেউ আফিসে, কেউ স্কুলে থাকিব, সুতরাং কাজ করিবার সময় কখন পাইব? আমি বলিলাম, ভাই, কাজ করিতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই; তবে টাকার অনটন বা অভাব হইলে কে তাহা চালাইবেন? বাজার দেনা হইলে তাহাই বা কে দিবেন? আমার বিবেচনায় জগবন্ধু বাবু অথবা অপর কেহ, যাঁহারা টাকার কাজ দরকার মত চালাইতে পারিবেন, এমন লোকের প্রতি ভার থাকা ভাল। আমার পরিশ্রম দ্বারা যতটা হয় তাহা করিতে আমি রাজী আছি। পরদিন গঙ্গাস্নানে যাইয়া যোগেন প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে তথায় লইয়া গেলেন। আমি তথায় গেলে যোগেন সামন্ত মহাশয় আমাকে বলিলেন, দাদা! আপনি ভাল রকম আয়োজন করিয়া কার্য্য করুন, টাকার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমরা দায়ী থাকিলাম। যাহা দেনা হইবে তাহা তথায় যাইয়া শোধ করিয়া দিয়া আসিব। তখন আমি সাহস পাইয়া উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। যথাসময়ে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইল। নিমন্ত্রিত লোক সকল, গুরুভাইভগ্নী সকলেই আগমন করিলেন। ফকীর পূজারি রান্নার কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। যথাসময়ে শ্রীযুত মুকুন্দ ঘোষের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল সে দিন কীর্ত্তন ঠাকুরের ও ভক্তগণের কৃপায় এমন জমাট হইয়াছিল যে, অনেকের মুখে শুনিতে পাইলাম, ঠাকুরের অভাবে কলিকাতাতে এমন মধুর, মনমাতোয়ারা কীর্ত্তন আর শুনি নাই। ধন্য ভক্ত শ্রীধর! ঠাকুর তোমার কার্য্যের সহায় হইয়া অঘটন ঘটাইয়া অসম্ভব সম্ভব করিয়া আমাদের চোখের সাম্‌নে তাহা উজ্জ্বলরূপে দেখাইলেন।

গুরুভাইভগিনীরা অনেকেই টাকা দিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলে কীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দিত হইয়া আহার করিয়া যে যার স্থানে চলিয়া গেলেন। সামন্ত মহাশয়দিগকে আর কিছু দিতে হইল না; সমস্ত ঠাকুরের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে ও সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়া গেল। শান্তি আমাকে বলিল, কাকা বাবু!

এত সামগ্রী উদ্বৃত্ত হইয়াছে যে, আমাদিগকে আর পোনের দিন কিছু কিনিতে হইবে না। আমি বলিলাম, মা, তাই ত চাই, তোমার কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলাম। এ স্থানের সমস্ত গোল চুকাইয়া আমি বাসায় যাইতে মাখনের হুকায় তামাক লাগাইয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তামাক টানিতে টানিতে চলিয়া গেলাম। যৎকিঞ্চিৎ পরে যাহা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, সে পয়সা কাঙ্গালিদিগকে দিয়া গেলাম।



শ্রীমান যোগজীবন গোস্বামী

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী।

১২৭৬ সন, ২৮শে অগ্রহায়ণ, সোমবার রাত্রিশেষে সূর্য্যোদয়ের কিছু-পূর্ব্বে ঢাকা পাতলা খাঁর গলি বিশ্বম্ভর সাহার ভাড়াটিয়া বাটীতে যোগজীবনের জন্ম হয়। সেই সময় ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। আমার স্ত্রী যোগজীবন ভূমিষ্ঠ হইবার সময় ধাত্রীর কার্য্য করেন, এবং সূতিকা গৃহে থাকিয়া ইঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করেন। আমরা গোস্বামী মহাশয়ের সন্তানগণকে শিশুকাল হইতেই কোলে লইয়া লালন পালন করিয়াছি। তখন ঢাকাতে গোস্বামিপরিবার ও আমরা একত্র থাকিতাম।

যোগজীবন ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। ইঁহার শারীরিক গঠন অনেকটা ঠাকুরের ন্যায় ছিল। ঠাকুর আদর করিয়া শুধু নয়, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতেই তাঁহার নাম যোগজীবন রাখিয়াছিলেন। স্মৃতিতে আছে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সন্তানও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া থাকেন। ইঁহার বাল্যাবধি সৎসঙ্গ ও সৎশিক্ষাপ্রভাবে অন্তর্নিহিত পৈতৃক ধর্ম্মভাব অল্প বয়সেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

একজন তপস্বিনী স্ত্রীলোক ইঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এ ত দেবতা, ইহ সংসারের লোক নহে; ব্রাহ্ম আনন্দ নন্দী মহাশয়ের স্ত্রী বলিতেন, গোঁসাই তাঁহার এই ছেলেমেয়ে লইয়া পাহাড়ে ছাড়িয়া দিন্। সংসারের বিষয় এই ছেলেমেয়ে বড় বুঝিতেন না। ঠাকুর মাঝে মাঝে যোগজীবন গোঁসাইকে 'তুই এ বিষয়ে কি বুঝিস্' বলিয়া সংশোধন করিতেন।

ঠাকুরের নিকটে বসিয়া মাঝে মাঝে ইনি ইঁহার ভজন সাধন ও দর্শন সম্বন্ধে গল্প করিতেন। পুরীতে সমুদ্র স্নানে যাইতে যাইতে একদিন শ্রীবৃন্দাবনের রাস্তা ঘাট প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন ও তথায় ময়ূরের কেকারব

হইতেছে, ইহা অতি সুস্পষ্ট ভাবে শুনিয়াছিলেন। স্বপ্নে ঋষি সভায় দ্বাদশবর্ষীয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, এ সকল গল্প করিতেন।

অসংখ্য ঋষি ও মুনি, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। যোগজীবনকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, বর লও। যোগজীবন বলিলেন, আমি ত্রিশ লক্ষ কোটী টাকা চাই। অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান। যোগজীবন এই প্রার্থনা হেতু ঠাকুরের নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, সাধনভজন, চিত্তের উদারতা, সর্ব্বজীবে প্রীতি, অর্থাদিতে নির্লিপ্ততা, দয়া, সাধুসজ্জনে অপরিসীম ভক্তি, ইত্যাদি বহুগুণে ইনি ভূষিত ছিলেন। এইরূপ একাধারে বহুগুণ মনুষ্যমধ্যে অতি বিরল। ঠাকুরের অনেক গুণ ইহাঁতে বর্ত্তমান ছিল। ইহাঁর চিত্তের ঔদাসীন্য দেখিলে মনে হইত, কলির কাঠিন্য ও মলিনতা যেন পদদলিত করিয়া ভগবানের নাম গান করিতে করিতে ইনি উড়িয়া যাইবেন।

ঠাকুর সমগ্র ভার ইহাঁর উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীমন্দিরে দয়া করিয়া যোগজীবনকে বলিয়াছিলেন যে, 'তুই কিছু ভাবিস্ না, মনে সন্তোষ রাখিলে যা ইচ্ছা করিবি তাই হবে।' ইহা শুনিয়া যোগজীবন ভাবে গদ গদ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি লইলেন।

আমি এক সময়ে অনুরুদ্ধ হইয়া যোগজীবনের সঙ্গে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালিয়া গ্রাম, বনগাও, মাদারিপুর ও বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া গ্রাম প্রভৃতি স্থানে গমন করি। তত্তৎ স্থানে যোগজীবনের নিকটে গুরুভ্রাতাগণ যাহাঁরা যাহা প্রশ্ন ও আলোচনা করিয়াছেন, তিনি তাহার এমন যুক্তিযুক্ত সুন্দর উত্তর ও সিদ্ধান্তবাক্য বলিতেন যে, আমি অবাক হইয়া তাহা শুনিতাম। সময়ে সময়ে আমার ভ্রম হইত যে এ সকল কথা যোগজীবন বলিতেছেন, কি, ঠাকুর বলিতেছেন? রাত্রি প্রায় ১০।১১টা পর্য্যন্ত, কোন কোন দিন এতদপেক্ষাও অধিক সময় পর্য্যন্ত প্রায়

১০।১২ দিন এই ভাবে বানরীপাড়ায় আলোচনা চলিয়াছিল, ইহার বিরাম ছিল না। তথায় সে সময়ে এমন জমাট বাঁধিয়াছিল যে, বিদায় লইবার সময়ে সকলেই কাঁদিয়া অধীর হইলেন, তথায় তাঁহারা এমনই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সে কয়েক দিন যেন তথায় উৎসবানন্দে মাতিয়া সকলেই বিভোর হইয়াছিলেন। তথায় উৎসবে প্রত্যহ প্রায় তুই শত আড়াই শত লোক ভোজন করিতেন। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয় একা এই কয়েক দিন রান্না প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ভোগ লাগাইতেন ও সকলকে পরিবেশন করিয়া পরে তিনি আহার করিতেন। আমরা দেখিয়াছিলাম, ইহাতে তাঁহার কিছু মাত্র ক্লান্তি বা কোন প্রকার অবসন্নতা ও নিরুৎসাহতা ছিল না। তিনি যেন কি এক প্রমত্ত উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত ভাবে কার্য্য করিতেন।

কোথাও কিছু রান্নার উপকরণ নাই, সকলেই সৎপ্রসঙ্গে ও গানবাদ্যে প্রমত্ত; দেখিতে দেখিতে নানা স্থান হইতে নৌকাযোগে রাশি রাশি খাদ্য-সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন অমনি তাহা প্রস্তুত হইয়া রন্ধন আরম্ভ ইহল। ঠাকুরের ভোগ দিয়া উপস্থিত সকলের আহার করিতে বেলা প্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িত। তথাকার ভাল ভাল ডাব নারিকেল এত আসিত যে, তাহা খাইয়া নিঃশেষ করা অসাধ্য হইয়াছিল। ঠাকুরের ভোগ এমন উপাদেয় হইত যে, তাহার প্রসাদ পাইয়া সকলেই পরমা তৃপ্তি লাভ করিতেন; একদিনও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

আমরা তথা হইতে আসিবার কালে অনেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। সে স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে; এখন যেন তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।

যোগজীবন ঠাকুরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া সময়ে সময়ে সেবার নিমিত্ত কিছু কিছু ঋণ করিতেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, তোমার যে বিষয় আছে তাহা বিক্রয় করিলে যত টাকা শোধ হইতে পারে, তত টাকা ঋণ করিতে পার।

ঠাকুর শেষ কালে ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে শামল্‌সার গল্প পাঠ করিয়া যোগজীবনকে শুনাইয়াছিলেন। শামাল্‌সা সধুদের সেবার জন্য পুনঃ পুনঃ ঋণ করেন ও বিপন্ন হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যোগজীবন মনে করিতেন, ঠাকুর তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই ভবিষ্যতে ব্যবহারের নিমিত্ত উহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যোগজীবন পুনঃ পুনঃ ঋণ করিয়া সাধুসেবা করিতেন এবং বিপন্নও হইতেন। ঠাকুর একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, যোগজীবনই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক।

১৩১২ সনের ১৮ই আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ঢাকার নিকটবর্ত্তী খালে, চট্টগ্রামের সুলুক নৌকাতে যোগজীবনের দেহত্যাগ হয়। তখন যোগজীবনের বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর হইয়াছিল।

গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনীত যোগজীবনের মাতাঠাকুরাণীর অস্থি ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে নূতন মন্দির প্রস্তুত করাইয়া সেই মন্দিরে যোগজীবনের দ্বারা শারদীয়া জন্মাষ্টমীপূজার দিন সমাধিস্থ করেন। তদবধি তথায় প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে উৎসবাদি কার্য্য হইয়া আসিতেছে। এই সময় তথায় অনেক ভক্তমণ্ডলী আগমন করতঃ সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন, এবং আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

তৎপরে গোস্বামী মহাশয় তথায় নামব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তথায় পূজা আরতি ভোগ প্রভৃতি কার্য্য হইত, এবং উহা এখনও হয়। তাহা দেখিয়া একদিন স্কুল ডিপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয়, (ইনিও পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ছিলেন) গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, এ মন্দিরে কি যোগজীবনের মাতাঠাকুরাণীর ভোগ, পূজা ও আরতি হয়? ইহা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "তা কেন! এই মন্দিরে নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারই ভোগ, পূজা ও আরতি হইয়া থাকে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিত মহাশয়ের জন্মস্থান বিক্রমপুর রসুনিয়াগ্রাম, শ্রীনগর, জেলা ঢাকা। ১৭৭৬ শকে, ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম অম্বিকা দেবী। তিনি মধ্যপাড়া স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা নরম্যাল স্কুলে তিন বৎসর পাঠান্তে উপাধি প্রাপ্ত হন। পাণ্ডদিয়াগ্রামে, জগৎলক্ষ্মী দেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের সময় স্ত্রীর বয়স ১২ বৎসর ছিল।

অতঃপর পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাণিকদহ স্কুলে অধ্যাপনা করেন। তথাকার জমিদার বিপিন বাবু ঐ স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। এই স্থানে তিনি ১৩ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। মাণিকদহ হইতেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। প্রসিদ্ধি আছে, জমিদার বিপিন বাবু, ইহাঁরই প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১২৯৩ সনে, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী গৃহে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সাধন প্রাপ্ত হয়েন। পরে বিপিন বাবুও গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সাধনপ্রাপ্তির পর জমীদার বাবুর জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল।

দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি মাণিকদহ হইতে কলিকাতা উৎসবে আসিতেন। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"প্রথম বৎসর মাঘোৎসবে ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে গুরুজি বলিলেন, ভগবান্, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, কেননা একজন লোক সামনে থাকিলে পাপকার্য্য করিতে

ভীত হই, কিন্তু তুমি সর্ব্বত্র আছ, অথচ আমি পাপ কার্য্য করিয়া থাকি।” এই বলিয়া গোস্বামী মহাশয় খুব কাঁদিলেন।

“তৎপর বৎসর, কলিকাতা যাইয়া দেখি, গোঁসাই গৈরিক পরিয়াছেন। গয়া হইতে দীক্ষা নিয়া আসিয়াছেন, মূর্ত্তি খুব গম্ভীর, একদৃষ্টে বৃক্ষ পানে তাকাইয়া আছেন। একদৃষ্টে তাকাইয়াই রহিয়াছেন। সেইবারই ব্রাহ্মসমাজের ১১ই মাঘোৎসবে বেদিতে উঠিয়াই বলিলেন, “আজ আর আমি প্রণালীবদ্ধ উপাসনা করিতে পারিব না। আমার ব্রহ্মদর্শন হইল, সম্মুখে যে কি দেখিতেছি, বলিতে পারি না। আজ হইতে আমার নাম, ব্রহ্মদাস হইল।” “গত বৎসরের বাক্য সকল ও এই বৎসরের কথা আলোচনা করিয়া আমার মনে হইল, ইনি যথার্থই বল্‌ছেন; ইহাঁর নিকটেই দীক্ষা নিতে হয়। সেই বৎসরের পর বৎসর ১২৯৮ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা নিলাম; দীক্ষা নিয়া প্রায় দুই মাস কাল সঙ্গে রহিলাম। তৎপরে বাড়ী গেলাম, বাড়ী হইতে মাণিকদহ গিয়া ৬ মাস কার্য্য করিয়া কায ছাড়িয়া দিলাম। দীক্ষার পর কিছু অবিশ্বাস আসিল, পরের বৎসর হইতেই কিছু ভাল অবস্থা সুরু হইল। কার্য্য ছাড়িয়া ঢাকা আসিয়া তৎপরে বাড়ী গেলাম। বাড়ী হইতে আসিয়া পুনরায় ব্রাহ্মসমাজে গোঁসাইর সঙ্গে ছিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম কলিকাতা, তারপর চুচুড়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তৎপর বর্দ্ধমান উৎসবে গেলাম। বর্দ্ধমান হইতে বাঁকিপুর, বাঁকিপুর হইতে গয়া; পুন বাঁকিপুর হইয়া দ্বারভাঙ্গা গেলাম।

চুচুড়ার মহর্ষি বলিলেন, “তোমরা ঢাকা হইতে এতদূর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ, এখন কাঁটাল গাছ আমার পরলোকের সঙ্গী; উপনিষদ্ উচ্চারণ করিয়া চক্ষের জলে অভিষিক্ত হইয়া যান। ঠাকুর নমস্কার করতঃ পদধূলি লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বর্দ্ধমানে শ্রীধরের জর হয়, গয়াতে থাকাকালীন, আকাশ গঙ্গার পাহাড়ে

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতির দীক্ষা হয়। তখন আমাদের আকাশগঙ্গাতেই থাকা হইত। দ্বারভাঙ্গা গেলে ৫।৭ জনের দীক্ষা হয়।

পণ্ডিত মহাশয় আরওব লিয়াছেন ;—"ঠাকুর যখন ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে মৌনী, তখন আমি তাঁহার আদেশ মতে ভিক্ষা করিতে মাণিকদহ গেলাম। তথায় গ্রামের পূর্ব্বাংশে কুটীর করিয়া রহিলাম। সেস্থানে প্রায় দশ মাস ছিলাম। তথা হইতে আমি ঢাকা গেলাম। তথা হইতে ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলাম। অভয় বাবুদের বাড়ী ২।৩ দিন থাকিয়া ঠাকুর রাখাল বাবুর বাড়ীতে গেলেন। বোলপুর হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় আসিয়া ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহার সহিত ঠাকুর আমাকে বোলপুর পাঠাইলেন। বোলপুরে ভজনকুটীর করিয়া ভিক্ষা করিয়া রহিলাম; মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আসিতাম। শরীর কাতর হওয়ায় ঠাকুরের নিকট হারিশন রোডের বাড়ীতে আসিলাম। তথা হইতে ঠাকুর পুরী চলিলেন, তাঁহার সহিত পুরী আসিলাম। ঠাকুর পুরীতে দেহ রাখিলেন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের চক্ষে ছানি পড়ায়, তাহা কাটাইতে তিনি আমাকে ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দে মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা গমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত কালী বাক্‌চি মহাশয়কে দেখান হয়। তিনি আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলেন। তখন আমরা পুনঃ পুরী চলিয়া আসিলাম। তখন অগ্রহায়ণ মাস। তাঁহার শরীর বহুমূত্র রোগে পূর্ব্ব হইতেই পীড়িত ছিল। কলিকাতা হইতে পুরী আসিয়া কিছুকাল পরে পণ্ডিত মহাশয়ের কার্ব্বঙ্কল রোগ হয়, এবং ১৩১৮ সনের ফাল্গুনী পূর্ণিমা দোল যাত্রা দিন, প্রাতে ৮টার সময় তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

৺ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রতি পণ্ডিত মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি এতই প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁহার সহিত

কথোপকথনের সময় আমি তাঁহার মধ্যে গুরুদেবের প্রভাব লক্ষ্য করিতাম। সেই সাধনকুটীরে তাঁহারই পাশে কুশাসনে বসিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, সে শ্রেণীর আনন্দ ইহ জগতে আর লাভ করিতে পারিব না। এত শীঘ্র তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন তাহা ভাবি নাই, তাই তাঁহার কাছে যতক্ষণ বসা উচিত ছিল তাহা বসি নাই। তাঁহার নিকট হইতে যে সকল কথা শুনা উচিত ছিল তাহা শুনি নাই এবং তাঁহার সেবা করিতে পারি নাই এ সকল মর্ম্মান্তিক দুঃখ রহিয়া গেল। ধর্ম্মবন্ধুর বিয়োগদুঃখ কোন আত্মীয়বিয়োগের দুঃখ অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহা দিন দিন বুঝিতেছি। "প্রেমকো অঙ্কুর আওত যাওত ভেল," চক্ষের জলে ভিজিয়া মৃদু মৃদু হাতখানি নাড়িয়া মহাবিষ্ণুজ্যোতি মহাশয় এই গান আমাকে শুনাইয়াছিলেন। সেই আমার তাঁহার শেষ গানশ্রবণ। যখন পুনরায় সেই গান শুনিতে প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল, তাহার দুই একদিন পরে সংবাদ পাইলাম তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া পলাইয়াছেন। আবার পণ্ডিত দাদা যখন চক্ষুর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিলেন, তখন মনে হইয়াছিল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং তাঁহার নিকট কত কথা শুনিব, কিন্তু তিনি হঠাৎ ৺ পুরীধামে চলিয়া গেলেন। তাহার পরে মনে যখন আশা করিতেছিলাম যে আমি একটু স্বাস্থ্যলাভ করিলে তাঁহার চরণতলে বসিয়া শ্রীগুরুদেবসম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিব এবং তাঁহার নিজেরও অনেক কথা জানিয়া লইব, তখন তাঁহার পীড়ার সংবাদ এবং বলিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তিরোধানের সংবাদ পাইলাম। কোন আশাই মিটিল না।

৺ পুরীধামে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়াই আমি এখানে বসিয়া আছি, এই সমাধিস্থলে থাকিয়া কোন প্রকারে দেহপাত করিব ইহাই বাসনা।" তখন আমার মনে হইল শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার অনুগতগণের মধ্যে অনেকে এই ভাবেই শেষদিনের প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। যাঁহাকে দর্শনের জন্য জন্মগ্রহণ, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া জীবনপাত করাই জীবনের চরিতার্থতা জ্ঞান করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত দাদা নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। পণ্ডিত দাদা গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন।

ইনি যখন পূর্ব্ববঙ্গের কোনো প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর স্বগ্রামে একটী মধ্য ইংরাজী ও মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন, তখন উক্ত জমীদার মহাশয় অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের লোক ছিলেন। যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চারিটীর একত্র সংযোগে মনুষ্যচরিত্র কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে, উক্ত জমিদার তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। যেরূপ দেবতা তাহার বাহনও তদনুরূপ হয়, কাজেই জমিদার মহা-শয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচর সহচরগণের অধিকাংশই তাঁহার অনুকরণ করিয়াছিল। জমীদার বাড়ীতে সুরার স্রোত প্রবাহিত হইত, এবং রাস্তার লোকেরাও সে সুধারসে বঞ্চিত হইত না, পরিচিতগণের কথা আর কি বলিব ?এইরূপ জমিদারের করায়ত্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া পণ্ডিত দাদা সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের লোকগণের সঙ্গে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার সৎস্বভাব ও নীতিপরায়ণতা এই দলের নিকট উপহাসের বিষয় হইয়াছিল ; কিন্তু অচিরকালমধ্যেই তাঁহার চরিত্রের বিমল জ্যোতিতে জমিদার বাড়ীর সমুদয় পাপমলিনতা বিদূরিত হইয়া গেল।

একদিন জমীদার বাড়ীতে পণ্ডিত দাদার আহারের নিমন্ত্রণ হইল। তখনও তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হন নাই। জমিদার বাবুর এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও ইয়ারদের জন্য বড় বড় পীড়ি, বড় বড় থালা এবং কর্ম্মচারিগণের নিমিত্ত খুব ছোট ছোট পীড়ি ও ছোট ছোট থালা দেওয়া হইয়াছিল ; কেননা ইহাই বাড়ীর সনাতন রীতি ছিল। পণ্ডিত দাদাকেও কর্ম্মচারিগণের মধ্যেই

পরিগণিত করা হইল। তাঁহাকে এক খানা ছোট পীড়ি দেখাইয়া দিয়া বসিতে অনুজ্ঞা করা হইল। তিনি দক্ষিণপদদ্বারা সজোরে পীড়ি খানা সরাইয়া রাখিয়া আপন খড়মের উপর বসিয়া আহার করিলেন। ব্যাপারটী সকলেরই নেত্রগোচর হইল, জমীদার বাবুর চক্ষের উপরেই এ ঘটনা ঘটিল। এ যাবৎ-কাল এরূপ কার্য্য কেহ কখনো করিতে সাহস করিবেন দূরের কথা, উপস্থিত ব্যক্তিরা কখনও এরূপ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে ২০৲ টাকা বেতনের একজন স্কুল পণ্ডিত এ হেন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারকে তাঁহার চক্ষুর উপর এইরূপ অবজ্ঞা করিতে পারে; তাঁহার কার্য্যের প্রতি এইরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিতে পারে। সকলেই আশঙ্কা করিল যে এইরূপ আচরণের জন্য পণ্ডিতকে অবিলম্বে অত্যন্ত লাঞ্ছনা পাইতে হইবে। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, সে সময় সে অঞ্চলের পুলিশ কর্ম্মচারীদেরও এরূপ সাহস ছিল না যে, সেই জমিদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করে। প্রবাদ ছিল যে তাঁহার প্রতাপে বাঘ মহিষ এক ঘাটে জল খায়; কিন্তু পণ্ডিত দাদার এই অবজ্ঞার ফল যাহা ফলিল তাহা সকলেরই কল্পনার আগোচর ছিল। একটী সামান্য প্রদীপ যেমন গাঢ় অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ বিন্দু মাত্র সত্যের তেজ প্রগাঢ় অসত্যকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। মনুষ্যত্ব এমনই বস্তু, উহা মুহূর্ত্তে হীনত্বকে পরাস্ত করে। পণ্ডিত দাদা অভিমান বা অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া এ কার্য্য করেন নাই; তিনি একটী বদ্ধমূল হীনতাকে পদদলিত করিয়া মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বার্থপর চাটুকার অনুগতগণ এরূপ কার্য্য করিতে পারে না। পণ্ডিত দাদার এই কার্য্য জমিদার মহাশয়ের হৃদয়-গগনে বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসিয়া উঠিল, সেই শুভক্ষণে দেবতা তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে যে ধর্ম্মের প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন, জমিদার বাবুর সমস্ত জীবনে তাহা আর নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই সাহস ও তেজ দেখিয়া পণ্ডিত দাদার প্রতি জমিদারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ক্রমে ক্রমে ইহার পরিণাম ফল এই হইল

যে, মদের আড্ডায় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, জমিদার পবিত্রচরিত্র ও আদর্শ প্রজারঞ্জন হইলেন। প্রায় ৩০ বৎসর কাল তাঁহার দয়া, তাঁহার দান, তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও পরদুঃখকাতরতা দেবতার প্রসাদের ন্যায় অজস্রধারে পুণ্যবৃষ্টি করিয়াছে। উক্ত জমিদার মহাশয়ের জীবনের অধিক কথা বলা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, তাই এ স্থলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি পণ্ডিত দাদার কথা বলিতেছি, অতি সংক্ষেপেই বলিব।

পণ্ডিত দাদা যেমন বুদ্ধিমান, যেমন চরিত্রবান, তেমনই ধর্ম্মার্থী ছিলেন। তিনি তার্কিক, জ্ঞানী ও ধ্যানী, তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ও তেজস্বী ছিলেন। বহুকাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত প্রথানুসারে উপাসনা প্রার্থনা করিয়া তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শনের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই সময় শ্রীশ্রীগুরুদেব গয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এইরূপ একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম গুরু গ্রহণ করিলেন ইহা আমার নিকট যেন বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। আমি যতদূর জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, পণ্ডিত দাদাই শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রথম শিষ্য।

জমিদার বাড়ীর যে স্কুলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পণ্ডিত দাদার সময়ে সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ছাত্রগণ কেবল বিদ্যাশিক্ষায় নহে, নীতি ও ধর্ম্মেও উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের অর্থদ্বারা সেখানে "শ্যামাকান্ত বৃত্তি", 'শ্যামাকান্ত মেডেল' পণ্ডিত দাদার নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার একখানি অয়েলপেণ্টিং রাখা হইয়াছিল। তিনি যখন ধর্ম্মসাধনের জন্য চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ অশ্রুবর্ষণ করিলেন, জমিদার পরিবার আত্মীয়বিয়োগ দুঃখে দুঃখিত হইলেন, বিভিন্ন গ্রামের হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম বৈষ্ণব সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সে প্রদেশে

তিনি যেরূপ সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, কোন গ্রাম্য স্কুল পণ্ডিতের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া জানি না।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে আমরা একবার উক্ত জমিদার মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলাম। পণ্ডিত দাদা সঙ্গে ছিলেন। ২।৩ মাইল দূরে নৌকা রাখিয়া পদব্রজে জমিদার বাড়ী যাইতে হইয়াছিল। রাস্তায় কত লোক পণ্ডিত মহাশয়কে ভক্তি প্রদর্শন করিল, কত লোক তাঁহার নাম শুনিয়া ছুটিয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চলিল। জমিদার বাড়ীতে আমরা যে কয়দিন ছিলাম প্রতি দিনই দূর হইতে লোকেরা "পণ্ডিত মহাশয়" কে দেখিতে আসিত, এই দর্শকদলের মধ্যে নব্য শিক্ষিত লোক এবং বৈরাগী বৈষ্ণব সকলেই ছিল। দেখিলাম জমিদার পরিবারে তাঁহার সম্ভ্রমের পরিসীমা নাই, তাঁহার তুষ্টির জন্য তাঁহারা কি না করিতে পারেন? কিন্তু পণ্ডিত দাদা কখনো তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য কি উপঢৌকন গ্রহণ করেন নাই। আমার মনে হয় একবার জমিদার-গৃহিণী তাঁহাদের স্মরণচিহ্নস্বরূপ পণ্ডিত দাদাকে একটী মূল্যবান্ উপহার দিয়াছিলেন, তিনি গ্রহণ করিয়া উহা ফিরাইয়া দিলেন। স্বার্থহীনেরা প্রকৃত সম্মানের পাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুদেব পণ্ডিতদাদাকে সর্ব্বদা সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আমাদিগকে শিক্ষাদান করাই বোধ হয় তাঁহার এইরূপ আচরণের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আমাদের দ্বারা সে উপদেশ সার্থক হয় নাই, আমরা তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা দেখাইতে পারি নাই। তিনি যে কত বড় মান্য ব্যক্তি, কিরূপ চরিত্রবান্ লোক, কিরূপ নিষ্ঠাবান্ সাধক, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমরা সকলে সর্ব্বদা মনে রাখি নাই। লোকেরা বলে "দাঁত থাকিতে দাঁতের বেদনা বুঝা যায় না" আমরাও তাহা বুঝি নাই, এরূপ আরও কত জনার জন্য আমরা কতবার পস্তাইব কে জানে?

১৮ বৎসর পূর্ব্বে (তখন আমরা ভবানীপুর পদ্ম পুকুরে ভগবতী বাবুর

বাটীতে থাকি) একদিন কোন একটী লোকের বিদ্বেষবুদ্ধিতে বিরক্ত হইয়া আমি পণ্ডিত দাদার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলাম। পণ্ডিতদাদা বলিলেন, "দেখ ভাই, সকলেই অনন্ত প্রেম পুণ্যের অধিকারী, রাস্তায় অল্প দিনের জন্যই যাহা কিছু গোলযোগ, সে আর কয় দিন? এই কয়টা দিন কেহ হিংসা করিবে, কেহ বিদ্বেষ করিবে, কেহ স্বার্থপর হইবে বা যশোলিপ্সু হইবে, কিন্তু পরিণামে ত সকলেই পবিত্র হইবে, রাস্তায় আর সে কত দিন থাকিবে?" তাঁহার কথায় আমার সমস্ত বিরক্তি চলিয়া গেল। আমি একটী সত্যকে নূতন করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম। পণ্ডিত দাদা এই ভাবেই লোককে গ্রহণ করিতেন। আমি বহু বহু বার তাঁহার কার্য্যকলাপের মধ্যে এই ভাব দেখিয়াছি। তিনি কাহাকেও "হীন" মনে করিতেন না। তিনি শেষ জীবনে যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমর্থন করিতেন, তখন কোন ব্যক্তিকে হীন জ্ঞান করেন নাই, একটা সামাজিক রীতিরক্ষার জন্য কাহারও সহিত একত্র ভোজন না করা, আর কোন ব্যক্তিকে হীন জ্ঞান করা এক কথা নয়।

এতক্ষণ যাহা লিখিলাম তাহাতে পণ্ডিত দাদার কর্ম্মজীবনের যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল মাত্র, সে যৎকিঞ্চিৎ তাঁহার কর্ম্মকাণ্ডের শতাংশের একাংশও নহে। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা আজও আমি কিছুই লিখিতে পারিলাম না।

সাধনগ্রহণের পরেও কিছুকাল পরে তাঁহার জ্ঞানাভিমান ছিল। যাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি নহেন, যাঁহারা জ্ঞানের আলোকে কোন তত্ত্ব দেখিতে সক্ষম নহেন, তিনি তাঁহাদিগকে একটু হীন ভাবিতেন, এমন কি মনে হয় যে একটু দয়ার পাত্র মনে করিতেন, কিন্তু একদিনকার এক ঘটনায় তাঁহার জ্ঞানাভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। সে ঘটনাটী তিনি আমাকে বলিয়াছেন। এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন তিনি কয়েক জন গুরু ভ্রাতার সহিত শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় স্বর্গ হইতে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ আসিল এবং তিনি যাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি জ্ঞানহীন মনে করিতেন

তাঁহাদের মুখে সেই জ্যোতি পড়িয়া অপূর্ব্ব দীপ্তিতে তাঁহাদের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, আর পণ্ডিত দাদা এবং তিনি আর যাঁহাদিগকে জ্ঞানী মনে করিতেন তাঁহারা অন্ধকারে পড়িয়া রহিলেন, সেই দিব্য জ্যোতিঃ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিল না, তখন তিনি বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং বুঝিলেন জ্ঞানাভিমানী কিরূপ কৃপার পাত্র।

আজ মনে পড়িতেছে পণ্ডিত দাদা সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কিরূপ ভাবে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুসরণ করিতেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব কয়েক বার তাঁহাকে বিভিন্ন স্থানে তপস্যার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যেখানে তিনি পণ্ডিত ছিলেন, সেখানকার সকল লোকে তাঁহাকে সম্মান করিত। যে স্থানের জমিদার তাঁহারই দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন, সেখানে তাঁহার সম্মানের পরিসীমা ছিল না। সেই স্থানে গ্রামের এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে এবং এক একদিন এক এক গৃহস্থের ভবন হইতে ভিক্ষা মাগিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবকর্ত্তৃক তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন। যখন পণ্ডিত দাদা এই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তখন একদিন ভিক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্ত জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। এই ভাবে তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া জমিদার মহাশয় ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইলেন, কেন না তিনি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন সে ধর্ম্মের মতে ধর্ম্মলাভের জন্য এরূপ আচরণ অপ্রয়োজনীয়; অধিকন্তু ইহা কুসংস্কার মাত্র। জানি না কিরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া তিনি পণ্ডিত দাদাকে কতকগুলি কটু কথা বলিলেন। পণ্ডিত দাদা নীরবে ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বোলপুরের নিকটে একটা প্রকাণ্ড বিজন মাঠ আছে, মাঠের নামটী আমার মনে নাই। উক্ত মাঠের মধ্যস্থানে একটী কুটীর করিয়া তপস্যা করিতে শ্রীশ্রীগুরুদেব পণ্ডিত দাদাকে আদেশ করিলেন; বোলপুরের উকিল ভক্তি-

ভাজন হরিদাস বসু মহাশয় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। উক্ত কুটীর হইতে মানুষের বসতি বহুদূরে ছিল, কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া প্রাণান্ত চীৎকার করিলেও কোথাও হইতে লোকের সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সেরূপ স্থানে দিবারাত্রি একাকী বাস করা খুবই সাহসের কাজ, যে ব্যক্তি প্রাণের মমতা রাখে, সে সেরূপ স্থানে রাত্রিবাস করিতে সাহস করে না। পণ্ডিত দাদা গুরুর আজ্ঞায় নিশ্চিন্ত মনে সেই থানেই আসন করিলেন। দিবসে কখন একবার লোকালয়ে আসিয়া ভিক্ষা করিয়া যাইতেন। রাত্রিতে সেই বিজন মাঠে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। কিছুদিন পরে নানাশ্রেণীর অনেক লোক দিবসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, কিন্তু রাত্রিতে তিনি কাহাকেও সেখানে থাকিতে দিতেন না। সে দেশের লোকের তাঁহার প্রতি এরূপ ভক্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি যে তাঁহার গুরুর আদেশে এইরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া তাহারা বলিত যে এরূপ মহাপুরুষের আবার গুরু কে?

আমি শুনিয়াছি পণ্ডিত দাদাকে দেখিয়া বোলপুরের অনেকে আমাদের গুরুভাই হইয়াছেন। যাঁহাকে দেখিয়া লোকেরা তাঁহার গুরুকে ভক্তি করে, তিনিই গুরুর প্রকৃত শিষ্য।

———o———

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

(১)

৺মোহিনীমোহন রায়।

মোহিনীমোহন রায় মহাশয় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রণবাগপুর গ্রামে একটী বৈষ্ণব কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৺ শ্যামসুন্দর বিগ্রহ এই বংশের বাস্তুদেবতা। তিনি এক বার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতা একটী বিষ্ণুভক্ত পুত্রের কামনা করিয়াছিলেন; তার পর তাঁহার জন্ম হয়। এই কথাটী তিনি এরূপ বিনীত ভাবে ও আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শুনিলে মোহিত হইতে হয়। তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না থাকিলেও তিনি একজন শিক্ষিত বিজ্ঞলোক ছিলেন। তিনি উপযুক্ত বয়সে আদালতে আমলার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যখন গোস্বামী প্রভু তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন সেই সময় মোহিনী বাবু তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হন। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, তাঁহার সঙ্গলাভে তিনি পরমা প্রীতি অনুভব করিতেন। গোস্বামী প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে তৎসঙ্গবিরহে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সর্ব্বদা হা হুতাসে দিবারজনী অতিবাহিত করিতেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'প্রাণে আর কিছুতেই সন্তোষ ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম না; সর্ব্বদা যেন প্রাণ শূন্য বোধ হইত ও হু হু করিত।'

এক দিন রাত্রিতে গোস্বামী প্রভুর নিকটে বসিয়া তিনি সাধন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্বপ্নাবেশ হইল। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন

আফিসে টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া কাজ করিতেছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন একটী লোক একটী টাকার তোড়া আনিয়া তাঁহাকে দিবার জন্য অনুমতি প্রতীক্ষায় আছে। কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি মনে করিতেছিলেন টাকা দিতে চায় ত দিক। এমন সময় তাঁহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। তখন তিনি গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধন করিতে বসিয়া এ কি দেখিলাম? এই প্রশ্নটী করিয়াই তাঁহার জীবনের একটী ঘটনা বলিলেন। তাহা এই, "আমি সাধন প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ সঙ্কল্প করিলাম যে, আর উৎকোচ গ্রহণ করিব না। একদিন একটী লোক তাঁহার মোকদ্দমায় জয়লাভ হওয়ায় আমাকে দুটী টাকা দিতে চাহিলেন। আমি তাহা দেখিয়া সদম্ভে চাপরাসীকে বলিলাম লোকটাকে পুলিসে দাও। তাহা শুনিয়া সে বেচারা ভয়ে পলায়ন করিল।"

এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে স্বপ্নের কথা বলিলে, ইহাতে তোমার প্রকৃত অবস্থাই ভগবান তোমাকে দেখাইলেন। তুমি অভিমান করিয়া তাহাকে ধমক দিয়া পুলিসে দিতে চাহিয়াছিলে, কিন্তু এক তোড়া টাকা হইলে লইতে পার, ইহাই প্রকাশ হইল। লোভ ও অভিমান এখনও আছে, তাহা যায় নাই, তাহাই স্বপ্নের অর্থ।" মোহিনী বাবু রাত্রিতে গোস্বামী প্রভুর পদসেবা করিতেন, তাহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি একদিন গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"অন্য নাম দিলেন, অথচ গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ নাম ভাল লাগে কেন?" গোঁসাই বলিলেন, "ঐ নামে সবই আছে।"

বোলপুরে শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব করিয়া থাকেন। একবার মোহিনী বাবু সেই উৎসবে গিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন! একদিন বলিলেন, গৌরাঙ্গনাম সুমধুর বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ মোহিনী বাবু নাম গানে যেরূপ গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেন, এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে অল্প লোককেই দেখিয়াছি। শ্রীভগ-

বানের লীলাশ্রবণে অনেকেই মোহিত হইয়া থকেন, কিন্তু কেবল নামশ্রবণে অল্প লোককেই আনন্দানুভব করিতে দেখা যায়। মোহিনী বাবুর ভক্তির এই একটী বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি নাম শ্রবণ মাত্রই আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। তিনি দেখিতে অতিসুপুরুষ ছিলেন। গলদেশে তুলসীমালা ও সুন্দর নাসিকাতে বটপত্র তিলক তাঁহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত। তিনি যখন নামানন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহার মুখশ্রী আনন্দে ঢল ঢল করিত। কখন কখন আনন্দে এরূপ অধীর হইতেন যে, কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ক্রমাগত ডিগবাজী খাইতে থাকিতেন।

শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত তিনি পুরীর সমাধি-আশ্রমে আগমন করেন। এই স্থানেই অবস্থিতিকালে তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। অন্তকালে বলিলেন, "গুরুস্থানে প্রাণ যাইবে, ইহার অপেক্ষা আর অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে?" দুর্গাপ্রসন্নকে বলিলেন, 'অপরূপ শ্রীগুরুরূপ' গান কর। এই গান শ্রবণ করিতে করিতে প্রয়াণ করিলেন, মুখ আনন্দে পদ্ম ফুলের মত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।" এরূপ ভক্তের আগমনে পৃথিবী পবিত্র হয়।

(২)

৺মুক্তকেশী দেবী।

পূজনীয়া মুক্তকেশী দেবী, গোস্বামী মহাশয়ের শ্বশ্রূঠাকুরাণী, নিবাস নদিয়া জেলার অন্তঃপাতী শিকারপুর দহকুলগ্রাম। গোস্বামী মহাশয়ের মাতুলালয় এই গ্রামে। জ্যেষ্ঠা কন্যা যোগমায়া দেবী; কনিষ্ঠা নবকুমারী দেবী, ইনি এখনও স্বামী সহ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন-বাক্‌চি। নিবাস শিকারপুর।

শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী তাঁহার জেষ্ঠাকন্যা যোগমায়াকে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত এই প্রতিশ্রুতিতে বিবাহ দেন যে আজীবন তিনি তাঁহার ভরণ পোষণ করিবেন।

যোগমায়া দেবীর বিবাহের ৪।৫ বৎসর পরে ইনি কন্যাকে লইয়া কলিকাতার গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় যান। যখন কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতাশ্রম হয়, তখন ইনি সেই আশ্রমের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সুদক্ষা গৃহকর্ত্রী, চিরদিনই ন্যায়ের পক্ষপাতিনী ছিলেন; অন্যায় কখনও দেখিতে বা সহ্য করিতে পারিতেন না। গোস্বামী মহাশয় সময়ে সময়ে এ কথা আমাদিগকে বলিতেন, আমরাও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাঁর প্রখর বুদ্ধি সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। এই সংসারের শোক তাপের মধ্যে সকল হারাইয়া অটল অচল ভাবে ছিলেন। ইহা সামান্য ধৈর্য্যের পরিচয় নহে। ইনি একজন সাধিকা ছিলেন। একদিন একটী গুরুভাইকে সাধনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "যাহার ভিতরে মাণিক জ্বলিবে, সেই কুণ্ডলিনীর আড়াই প্যাঁচ বুঝিতে পারিবে।"

ইনি প্রথমা কন্যা যোগমায়া দেবীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দ্বারভাঙ্গায় গোস্বামী মহাশয়ের পীড়া আরোগ্যের পরে আমরা তাঁহার পরিবারগণকে লইয়া কলিকাতা যাবার সময় বৈদ্যনাথে শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ বাকৃচি মহাশয়ের বাসায় গমন করি। তিনি তথায় সস্ত্রীক ছেলে মেয়ে ও জামাতা লইয়া বাস করিতেন। নিজে পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্য করিতেন। তাঁহার বাসায় তখন প্রায় সকলেই পীড়িত ছিলেন। বুড়া ঠাকুরাণীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা নবকুমারী দেবী তাঁহাকে তথায় কিছুদিন থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। যোগমায়া দেবী মাকে সেই ক্লেশের সময় তথায় থাকিতে অনেক বলেন, গোস্বামী মহাশয় ও আমারও তাঁহাকে তথায় থাকিবার জন্য অনেক বলি; কিন্তু তিনি কিছুতেই থাকিতে সম্মত হইলেন না। তিনি এই কথা বলিলেন,—আমি

যোগমায়াকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। যোগমায়া দেবী যেখানে তিনিও সেই খানে থাকিতেন। কদাচ বাধ্য হইয়া কখনও পৃথক থাকিতেন তাহাও অল্পদিন; তাঁহাকে ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে পারিতেন না!

ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতিস্থানে এক সময়ে আমরা কয়েকটী লোক গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে থাকিতাম। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বুড়াঠাকুরাণী ও স্বর্গীয়া যোগমায়া ঠাকুরাণী রন্ধন করিয়া আমাদিগকে আহার করাইতেন। দুগ্ধ যাহা ক্রয় করিতেন তাহা সামান্য হইলেও আমাদিগকে এক এক হাতা না দিয়া উহা তাঁহারা আহার করিতেন না।

বুড়া ঠাকুরাণী একজন বিশেষ দক্ষ গৃহিণী ও পাচিকা ছিলেন। তাঁহার হাতেরই কিগুণ যে তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার পাকের বিশেষত্ব এই যে, তিনি অন্য মেয়েদের মত কতগুলি তেল, ঘি, বা মসলা ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিতেন, কতগুলি তেল, ঘি, মসলা দিলেই যে রান্না ভালহয় তাহা নহে, বরং ঐরূপ করিলেই অপব্যয় হয়; উহা গুরুপক্ক ও অস্বাস্থ্যকর হয়, ঐরূপ আহার কখনও সাত্ত্বিক আহার হইতে পারে না। তাঁহার হাতের নিরামিষ রান্না যাহা খাইয়াছি তাহার আস্বাদন এ জীবনে আর ভুলিব না। মুগের ডাল না ধুইয়া রান্না করিতেন, তাহাই বা কি আস্বাদন হইত! তিনি যোগজীবনের মাতাঠাকুরাণীকে শিক্ষা দিয়া তত্তুল্য করিয়া ছিলেন। দুই দিন, এক দিন নয়, তাঁহারা দয়া করিয়া কয়েক বৎসর যত্নপূর্ব্বক আমাদের সেবা করিয়াছেন। ইনি অতিবৃদ্ধা হইয়াছিলেন।

বাতের পীড়ায় কাতর হইয়া কখন ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে, কখন পুরী সমাধি-আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন। বুড়া ঠাকুরাণী কতকগুলি প্রবাদ-বাক্য বলিতেন। "সূচ হয়ে এল ফাল হয়ে বেরুল।" "যার ধন তার নয় নেপো মারে দই।" "পরের ধনে পোদ্দারি।" ইত্যাদি। ইনি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে দেহত্যাগ করেন এবং এই স্থানেই তাঁহার দেহ সৎকার করা

হইয়াছে। ইনি শ্বশ্রূ হইলেও গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মা যশোদা যেরূপ কৃষ্ণকে ব্যাৎসল্যের চক্ষে দেখিতেন, ইনিও সেইরূপ বাৎসল্যভাবে গোস্বামী প্রভুর সেবা করিতেন। ইনি প্রায়ই নানাবিধ অলৌকিক দর্শন করিতেন।

(৩)

৺বিধুভূষণ ঘোষ।

১। ঢাকার সন্নিকট মাতাইল গ্রামে বিধুভূষণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ঢাকায় মোক্তারী করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিধু তাঁহার একমাত্র পুত্র। ইংরাজী বি, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। বিধু অত্যন্ত সাহাসী এবং তেজস্বী ছিলেন। তিনি যে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সম্পন্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তবে ভুল ভ্রান্তি ছিল না তাহা নহে। স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে স্বীয় কর্ত্তব্যে প্রতিপালন করিয়া সুখী করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য যত্ন করেন নাই এমন নহে কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া নানাকারণে ঋণজালে জড়িত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গোরা সৈনিকরা প্রাণিহত্যা করিত। তাহার বিরুদ্ধে নিষ্কামভাবে অদম্য উৎসাহে প্রতিবাদ ও বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার ও আয়োজন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পুরীধামে বানরবধনিবারণের দৃষ্টান্ত তাঁহাকে অনুপ্রাণিত ও উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয়ের সেবা শুশ্রূষা ও আজ্ঞাপ্রতিপালনে এরূপ একনিষ্ঠ লোক খুব অল্পই দেখিয়াছি। গেণ্ডারিয়া আশ্রমে শেষ ধুলটের সময় সমস্ত ভার স্কন্ধে লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সকল দিক ঠিক রাখিয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সমুদায় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এমনটী শিষ্যদের মধ্যে আর দৃষ্ট হয় না। যেমনটী গেল তেমনটী আর দেখিলাম না। ইনি গেণ্ডারিয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার শরীরে অসাধারণ বল ছিল। প্রসিদ্ধ মল্ল শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বাঘের সহিত

লড়াই করিতেন তিনি ইহাঁর সাকরেত ছিলেন। হ্যারিসন রোডের বাসায় ইনিই অধিকাংশ দিন সায়ংকালে 'জয় জয় শ্রীচৈতন্য' ইত্যাদি গান করিতেন। ইহাঁর বাহির দেখিতে রুক্ষ শুষ্ক হইলেও ভিনরে গোঁসাইর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। গোস্বামী প্রভুর তিরোধানের পর ইনি তাঁহার দুঃসহ বিরহে ব্যাকুল হইয়া শেষ পর্য্যন্ত উদাসীন বেশে কাটাইয়াছেন; আর কখনও কোন উৎসবাদিতে যোগদান করেন নাই।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

৺অশ্বিনীকুমার দত্ত।

পূর্ব্ববঙ্গের অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় দেশবিখ্যাত স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কোন ভাগ্যবান্ চরিতাখ্যায়ক তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় জীবন পবিত্র করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। যাঁহারা কর্ম্মময় জীবনে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে নির্ভীক কর্ম্মবীর বলিয়া অবগত আছেন। আমরা তাঁহার সহিত অতিনিগূঢ় ভাবে সম্পর্কিত। অশ্বিনী বাবু গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রভূত আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সেই স্থির ধীর গম্ভীর পুরুষকে আমরা সংকীর্ত্তনে উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে দেখিয়াছি, শ্রীভগবানের নামশ্রবণে অশ্রুসিক্ত হইতে দেখিয়াছি। গোস্বামী প্রভুর প্রদত্ত সাধনবীজ তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে কিরূপ অঙ্কুরিত, মহাবৃক্ষরূপে সংবর্দ্ধিত ও ভক্তিপুষ্প ও প্রেমফলে পরিশোভিত হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম। তদীয় হৃদয়ের 'ভক্তিযোগ'-রূপ ভক্তিকুসুম বিকসিত হইয়া সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিতেছে। অমরা পাঠকদিগকে সেই পুষ্পনির্যাস কিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি ঃ—

"ইনি বন্ধু ইনি বন্ধু নহেন, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তি এইরূপ গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু উদারপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের পৃথিবীস্থ সকলেই কুটুম্ব। কি মধুর উপদেশ! পৃথিবীর সকলকে বন্ধু ভাবিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বিধি পালনের জন্য সংসারে দাসত্ব বা কর্ত্তৃত্ব করিতে হইবে। বাহিরে যাহাকে শত্রু বলি তাঁহাকেও বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে, কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে দুর্নীতির শাসনের জন্য তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিব। বাহিরে যাহাকে বন্ধু বলি

তিনিও সেরূপ কোন অন্যায়াচরণ করিলে তাঁহারও অবশ্য প্রতিকূলাচরণ করিব। আমাদিগের শত্রু—পাপ ও দুর্নীতি।

"পবিত্র প্রেম যত অধিক পরিচালনা করিতে থাকিবেন ততই প্রেমের বৃদ্ধি হইবে। প্রেমের বৃদ্ধি হইলেই প্রাণ মধুময় হয়, ভিতরে প্রাণ মধুময় হইলেই কুৎসিত বস্তুও সুন্দর হইতে থাকে। একটী সামান্য বৃক্ষ প্রেমিক যে চক্ষে দেখেন, আমরা সে চক্ষে দেখিতে পারি না। তাঁহার নিকটে নীরস পদার্থ সরস হইয়া দাঁড়ায়। আমাদিগের নিকটে সরস পদার্থও নীরস বলিয়া পরিগণিত হয়। যত তোমার প্রাণে প্রেম বৃদ্ধি পাইবে, তত অপর লোক তোমাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইবে এবং তুমিও তত অপরের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ভগবানের এই নিয়ম। যতই প্রাণে মধু সঞ্চয় হয়, ততই মানুষ মধুলোভী হয়; সুতরাং চারিদিকে মধু অন্বেষণ করিতে থাকে; পৃথিবীতে মধুগর্ভ কুসুমের অন্ত নাই, যে পদার্থের দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই পদার্থেই কিছু না কিছু মধু নিহিত আছে। প্রেমিক ভ্রমর সকল পদার্থ হইতেই মধু আহরণ করেন। নিতান্ত পাপী যে জীব, তাহার প্রাণের ভিতরেও ভগবান্ মধু ঢালিয়া রাখিয়াছেন। যে অন্বেষণ করে সেই পায়।

"অনেকে বলেন, 'গৃহস্থ জিতেন্দ্রিয় হইলে সংসার চলিবে কিরূপে? তাঁহারা মনে করেন গৃহস্থ হইবার জন্যই অজিতেন্দ্রিয় হওয়া প্রয়োজন। হায়! যে দেশে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধিকর্ত্তা, সেই দেশে আজ এই কুৎসিত ভ্রম রাজত্ব করিতেছে! ইহা অপেক্ষা আর কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে? আর্য্য ঋষিগণের বিধি এই ঃ—'জিতেন্দ্রিয় হইয়া তবে বিবাহ করিও, গৃহস্থ হইও।' পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, পরে গার্হস্থ্যাশ্রম। শৈশবের পরেই ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন পবিত্র হইয়া গেলে গার্হস্থ্য। ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভগবান্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বর্ণন করিতে করিতে বলিতেছেন—'এইরূপে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হইয়া তীব্র তপস্যার দ্বারা কর্ম্মের থলিটি

(বিষয় বাসনা) সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ নির্ম্মল জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মতেজ অগ্নির ন্যায় যখন জ্বলিতে থাকিবে তখন যিনি গৃহস্থ হইতে ইচ্ছুক, তিনি অনিন্দিতা আপনার সদৃশী ভার্য্যা বিবাহ করিবেন।

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতং।
কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।

মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। ১৭৫।১৬

'যুবাবয়সেই ধর্ম্মশীল হইবে, জীবন অনিত্য, কে জানে আজ কাহার মৃত্যু হইবে ?' মৃত্যু বালককে ত্যাগ করে না। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ কি বলিয়াছিলেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

ভাগবত। ৭।৬।১

বাল্যবয়সেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবে, জীবন কদিনের জন্য ? মনুষ্যজন্মই দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিতান্তই অধ্রুব। এ পৃথিবীতে যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই বাল্যজীবনেই ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাল্যাবস্থায় ভক্তি উপার্জ্জন না করিলে পরে যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইতে হয়, সুতরাং কোন বালক যেন ভক্তিসাধন বৃদ্ধ বয়সে করিব বলিয়া অপেক্ষা করিয়া না থাকেন।

"পুণ্যপথের সহযাত্রী ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও তাঁহাদিগের বিষয়ে চিন্তা পাপদমনের বিশেষ সহায়। যাঁহারা বাল্যাবস্থা হইতে ধার্ম্মিক পিতামাতাকর্ত্তৃক সৎপথে চালিত, তাঁহারা পরম সৌভাগ্যশালী। যাঁহারা সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তাঁহাদিগের মধ্যে যে কেহ ধর্ম্মবন্ধুর সহবাস ভোগ করিয়াছেন তিনিই জানেন,—সেই বন্ধু-মিলন তাঁহার জীবনের কত উপকার সাধন করিয়াছে। ধর্ম্মবন্ধু বলিতে কেহ

কেবল এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধু বুঝিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইতে পারে। পবিত্র ভাবে যাঁহাদিগকে ভালবাসা যায়, তাঁহারা পাপ পথে অগ্রসর হইবার বিশেষ অন্তরায়। এই বাক্যের যাথার্থ্য বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি কোন পাপ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে যদি তাহার হৃদয়ের বন্ধুকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পার, সে কখনই সে পাপ করিতে পারিবে না। যে দিবস হইতে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিবস হইতে সেই বন্ধুর সংসর্গে যে তাহার পাপলালসা ক্রমেই কমিতে থাকিবে ইহা ধ্রুব সত্য। ইহার তিনটি কারণ আছে ঃ—

১। কাহারও চরিত্রে মুগ্ধ না হইলে তাহার সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় না। মুগ্ধ হওয়া শ্রদ্ধাসাপেক্ষ। যাহার চরিত্র আমার চরিত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিষ্পাপ মনে করি, কিম্বা যাহার চরিত্রে কোন বিশেষ মধুর পবিত্র ভাব না দেখি তাহার প্রতি আমার কখনও শ্রদ্ধা হইতে পারে না এবং সে আমাকে ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ করিতে পারে না। মুগ্ধ হইলেই অনুকরণ করিবার ইচ্ছা হয়। অনুকরণ করিতে গেলেই পুণ্য ও পবিত্রতায় দিন দিন উন্নত হওয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। যতই বন্ধুর গুণ মধুরতর বোধ হইবে, ততই নিজের দোষ অধিকতর ঘৃণিত হইবে; সুতরাং তাহা ত্যাগ করিয়া বন্ধুর গুণ আয়ত্ত করিতে প্রবল ইচ্ছা হইবে।

২। ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে সর্ব্বদা সদালোচনা হইয়া থাকে; অসদালোচনা হইতে পারে না। সর্ব্বদা সদালোচনা যে কত উপকারী তাহা সকলেই জানেন।

৩। পরস্পরের সাধুচিন্তা ও সদ্‌ভাবের বিনিময়ে পরস্পরের হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয়, এবং আমার প্রাণের বন্ধু যাহা ঘৃণা করে তাহা আমি কি করিয়া

করিব ? তাহা করিলে কি সে আমাকে ভাল বাসিবে ? এইরূপ চিন্তার উদয় হয়। এতদ্ভিন্ন হৃদয় খুলিয়া কিছুই গোপন না করিয়া যত নিজের পাপের বিষয় নিজের বন্ধুদিগকে বলা হয়, ততই সেই পাপ দমন করিতে তাহাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায়। যে স্থলে একাকী দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলাম, সেই স্থলে বন্ধুগণের প্রাণের বল যোগ করিলে কি পরিমাণ শক্তির বৃদ্ধি পায় এবং পাপপরাজয় কত দূর সহজ হইয়া আইসে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

"যে কোন দেশের প্রাচীন আখ্যায়িকায় অসংযত ও সংযতচরিত্র লোকের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহা হইতে বড়ই সুন্দর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। একটি অসংযতচিত্তের লোক অবগত ছিল যে, একটী দ্বীপের স্ত্রীলোকেরা পুরুষকে কলে কৌশলে ও ছলে ভুলাইয়া নিজের অধীন করত ভেড়া বানাইয়া রাখে। বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে এমন লোক ছিল না যে মোহিত না হইত ; তাহারা বংশীধ্বনির দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া অবশেষে একবারে সর্ব্বনাশ করিত। কোন অসংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ সেই দ্বীপের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন ; জাহাজের নাবিকগণ সেই বংশী শুনিতে না পায় এজন্য অধ্যক্ষ তাহাদের কাণে মোম ঢালিয়া দিলেন, আর স্বয়ং আকৃষ্ট হইয়া সেই দ্বীপে উপস্থিত না হন, এই জন্য আপনাকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে মাস্তুলের সহিত বাঁধিলেন। যাই বংশীধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর সাধ্য কি তিনি আপনাকে রক্ষণ করেন। বংশীস্বরে অস্থির হইয়া পড়িলেন, কত প্রকারে দ্বীপে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ভাগ্যে আপনাকে রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল, তাঁহার লাঞ্ছনার অবধি রহিল না, যৎপরোনাস্তি কষ্টে কোন রূপে প্রাণ বাঁচাইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। আর একটি সংযতচিত্তের লোক ঐ দ্বীপের নিকট দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইবে জানিয়া পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে রক্ষা করিবার উপায় স্থির করত একটি মধুরকণ্ঠ মনোহর সুগায়ক

লোককে সঙ্গে নিয়াছিলেন। তিনি গায়ককে বলিয়াছিলেন, যখন আমরা ঐ দ্বীপের নিকটে যাইব তখন তুমি গান ধরিবে; দেখি তাহাদিগের বংশীধ্বনি আমাদিগকে কিরূপে প্রলুব্ধ করিতে পারে? ঐ গায়কের সুমধুর কণ্ঠের গানে পাষাণ গলিয়া যাইত, নদীর জলে উজান বহিত, যেখানে তিনি গান ধরিতেন সে স্থলে পশু পক্ষী নীরব হইয়া তাঁহার গানে প্রাণটি ঢালিয়া দিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিত। যেই তাঁহারা দেখিলেন সেই দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন অমনি সেই সুগায়ককে গান করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি স্বীয় মধুরকণ্ঠে গান ধরিলেন, সকলের প্রাণে আনন্দপ্রবাহ বেগে বহিতে লাগিল, জাহাজের নাবিকগণ গানের তালে তালে আনন্দে মাতিয়া দাঁড় ফেলিয়া চলিলেন। ঐ দ্বীপের স্ত্রীলোকদিগের বংশীধ্বনি যখন তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন সেই গায়কের কোকিলকণ্ঠের তুলনায় তাহা ভেকের ধ্বনির ন্যায় কর্কশ ও ও বিরস বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা আনন্দে বুক ফুলাইয়া চলিয়া গেলেন, তখন ঐ দ্বীপের স্ত্রীলোকদিগের মোহিনী শক্তি পরাস্ত হইয়া গেল।

"যে প্রলোভনে অসংযতচিত্ত ব্যক্তির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, সেই প্রলোভন সংযত ব্যক্তির নিকটে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল—এক মাত্র সেই সুকণ্ঠ গায়কের মনোহর সঙ্গীতই তাহার কারণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এইরূপ ভক্তিপূর্ণ মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করে, তাহার নিকটে কামাদির আকর্ষণ নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর আপনার উপরে নির্ভর রাখিয়া নানা উপায় অবলম্বন করিয়া যিনি পাপদলনে অগ্রসর হন, তিনি ঐ অসংযত ব্যক্তির মত যাতনা ভোগ করেন।

ক্ক নিরোধো বিমূঢ়স্য যো নির্ব্বন্ধং করোতি বৈ।
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্ব্বদাসাবকৃত্রিমঃ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা।

'যে মূর্খ ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য ভগবানের উপরে নির্ভর না করিয়া নিজে তেজ দেখাইতে যায়, তাহার ইন্দ্রিয় দমন হয় কই? আর যে জ্ঞানী আত্মাকে লইয়া আনন্দক্রীড়া করেন তাঁহাতে সর্ব্বদা অকৃত্রিম ইন্দ্রিয়নিরোধ দেখা যায়।'

"ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তদিগের সহিত যিনি প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, যিনি দিবারাত্র তাঁহার এবং ভক্তদিগের সহিত প্রেমালাপে মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহার বাড়ীর সাতক্রোশের মধ্যেও কাম আসিতে সাহস পায় না। হাফেজ যে আদিরসে ডুবিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে কি কেহ অপবিত্র আদিরস উপস্থিত করিতে পারিত? যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে ভগবানের বংশীধ্বনি শুনিয়া মহাপ্রেমে মজিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে কি কখন পাপের বংশীধ্বনি আকৃষ্ট করিতে পারে? যাঁহার স্বয়ং প্রেমস্বরূপকে লইয়া নৃত্য, গীত, লীলা, কৌতুক, তিনি ত রসের সাগরে ডুবিতেছেন, ভাসিতেছেন, সন্তরণ করিতেছেন, রসের বিকার আর তাঁহাকে স্পর্শ করিবে কিরূপে? যিনি নির্ম্মল অমৃতরস আস্বাদন করিতেছেন, তিনি আর মরীচিকা দেখিয়া ভুলিবেন কেন?

"অনেকে ভগবানের নাম করিতে পেচকবদন হইয়া বসেন, যেন ভগবান্ তাঁহাদিগকে ফাঁসির হুকুম শুনাইবেন। হায়, কি মূর্খ! তাঁহার ন্যায় কৌতুকী লীলারসামোদী কে? আমোদের ভাণ্ডার তিনি। তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিব না ত কাহাকে লইয়া করিব? তাঁহার অপেক্ষা ত কিছুই মিষ্টতর নাই, তাঁহার সহবাসসুখের সঙ্গে কি বাহিরের পৃথিবীর কোন সুখ তুলনীয়? সেই সুখের যে কণিকামাত্র সম্ভোগ করিতে পারিয়াছে, সে অবশ্যই বলিবে, 'বিষয়সুখে মন তৃপ্তি কি মানে? তব চরণামৃতপানপিপাসিত, নাহি চাহি ধন জন মানে; মধুকর ত্যজি মধু চায় কি সে জলপানে?' যে সুরাপায়ী সে এক বার এই সুখের বাতাস পাইলে অমনি সুরাপান ত্যাগ করিবে, যে লম্পট সে

একবার এই সুখের ছায়ামাত্র উপভোগ করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অপবিত্র ভাব চিরদিনের তরে দূর হইয়া যাইবে। এমন সুখের, আনন্দের বিষয় ত আর কিছুই নাই, হইতে পারে না। এই জন্যই কোন সুরাপায়ী রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নিকটে যাতায়াত আরম্ভ করিলে যদি কেহ বলিতেন 'ওযে মদ খায়!' তিনি উত্তরে বলিতেন, 'আহা খাক্ না, খাক্ না, কদিন খাবে।' অর্থাৎ তাহার সম্মুখে যে সুরা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই সুরার রস পাইলে আর কদিন ঐ সুরা পান করিবে? ঐ সুরা অবশ্য ত্যাগ করিবে।

"নারদ যখন তাঁহার মাতার মৃত্যুর পরে ভগবদন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন, নানা স্থান অতিক্রম করিয়া একদিবস এক অরণ্যের মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে তাঁহার ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ ভগবানের রূপ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অমনি অন্তর্ধান হইল। ভগবান্ তখন তাঁহাকে বলিলেন,—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্নমাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোহহং কুযোগিনাম্॥

ভাগবত।১।৬।২২

'হায়, এ জন্মে তুমি আমাকে দেখিবার যোগ্য হও নাই, যাহারা কামাদিকে দগ্ধ করে নাই সেই কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পায় না।' তবে যে একবার বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিলেন, তাহার কারণ—

সকৃদ্‌যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেহনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥

ভাগবত।১।৬।২৩

'এই যে একবার দেখা দিলাম, এ কেবল তোমার আমার প্রতি কাম জন্মাইবার জন্য। আমার প্রতি যে সাধুর কাম জন্মিয়াছে, সে ধীরে ধীরে

তাহার হৃদয়ের যত বাসনা সমস্ত বিসর্জ্জন দেয়।' তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইলে আর কি কোন কামনা থাকিতে পারে ? তাঁহার রূপের ছায়া যেখানে পড়ে, সে স্থল অতি মনোহর হইয়া দাঁড়ায়। চিরমনোমোহন তিনি, তাঁহার জন্য সাধুগণ সমস্ত ভুলিয়া পাগল হইয়া যান। আমাদিগের কাম সেই সৌন্দর্য্যের অনাদি নির্ঝরের দিকে ধাবিত হউক, কখন যেন পিশাচের ক্রীড়াভূমি তাহার লক্ষ্যস্থল না হয়।

"যাহারা বলশালী, অপকারের প্রতিবাদ করিতে সমর্থ না হয়, তাহাদিগের তীব্র অসূয়া জন্মিয়া থাকে ; কারুণ্যের দ্বারা তাহা নিবৃত্তি হয়। যে শত্রু ভগবদ্দত্ত বলের এইরূপ অপব্যবহার করিল সে নিতান্তই কৃপা পাত্র ; এই চিন্তা করিলে অসূয়া চলিয়া যায়। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, তবে অন্যায়ের, কি অসত্যের, কি অপবিত্রতার কেহ প্রতিবাদ করিবেন না। প্রতিকার না করিতে পারিলেও, প্রতিবাদ করিতে হইবে। যেখানে অন্যায় কি অসত্য কি অপবিত্রতার লেশ মাত্র দেখিতে পাইবেন, সেইখানে তারস্বরে তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিবেন, যাহাতে তাহা বিলুপ্ত হয় তজ্জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিবেন। অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া লইবেন। সাবধান এইটুকু, যেন কোন প্রকারে আপনার মনে বিকারের উদয় না হয়। প্রশান্ত ভাবে তরবারি লইয়া পাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন সেইভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুরোধে ভগবদ্বিধির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু মনের ভিতরে ক্রোধের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হয় সে অসুরের প্রজা, অসুরমর্দ্দিনীর প্রজা নহে, সে ভগবদ্‌বিরোধী।

"কোন সাধু বলিয়াছেন ঃ—যখনি তুমি তোমার পার্শ্বে কোনরূপ

অপবিত্রতা দেখ এবং তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না কর, তখনি তুমি বিশ্বাসঘাতক দাঁড়াও। যে ব্যক্তি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হয়, সে ভগবানের নিকটে বিশ্বাসঘাতক ; তাহার মনুষ্যত্বই নাই। মহাভারতে কশ্যপ প্রহ্লাদকে বলিতেছেন—

'বিদ্ধো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মেণ সভ্যং যত্রোপপদ্যতে।
ন চাস্য শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্বাংসস্তত্র সভাসদঃ॥
অর্দ্ধং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃ পাদো ভবতি কর্ত্তৃষু।
পাদশ্চৈব সভাসৎসু যে ন নিন্দন্তি নিন্দিতম্॥
অনেনা ভবতি শ্রেষ্ঠো মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে॥'

মহাভারত। সভাপর্ব্ব। ৬৮। ৭৭-৭৯।

অধর্ম্মকর্ত্তৃক শেলবিদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম সমাজের নিকটে প্রতিকারের প্রার্থনায় উপস্থিত হন ; সমাজস্থ লোকমণ্ডলী জানিয়াও যদি সেই শেল উদ্ধার করিতে সচেষ্ট না হন, তাহা হইলে সেই পাপের অর্দ্ধেক সমাজের নেতা যিনি তিনি ভোগ করিবেন, চতুর্থাংশ সমাজের যাঁহারা সেই নিন্দিত বিষয়ের নিন্দা না করেন তাঁহাদিগের ভাগে পড়িবেক, অপর চতুর্থাংশ যে পাপ করিয়াছিল তাহার স্কন্ধে বর্ত্তিবে। পাপকারী ষোলোআনা পাপ করিয়া মাত্র চতুর্থাংশের জন্য দায়ী হইল। যখন নিন্দার্হের নিন্দা করা হইবে অর্থাৎ পাপকারীকে উপযুক্ত শাসনের চেষ্টা হইবে, তখন শ্রেষ্ঠ নিস্পাপ হইবেন, সমাজস্থ লোকমণ্ডলীও মুক্ত হইবে ; সমস্ত পাপ ষোল আনা পাপকারীর স্কন্ধে পতিত হইবে। সমাজের পাপ দূর করিবার জন্য আমরা যে এতদূর দায়ী তাহা কি আমাদের জ্ঞান আছে ?"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

লালজী।

গোস্বামী মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগের পর যখন শান্তিপুর গমন করেন, সেই সময় তথায় লালজী তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন। বাড়ী তাঁহার শান্তিপুর ছিল। ছোট বেলা হইতেই আউল, বাউল, দরবেশ ও সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ে যাতায়াত করিতেন।

লেখা পড়া সামান্য বাঙ্গালা ও ইংরেজী শান্তিপুরেই হইয়াছিল, লালজী বালক ও সামান্য লেখা পড়া জানিলেও জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আশ্চর্য্য মীমাংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধেরাও চমৎকৃত হইতেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু যোগৈশ্বর্য্য অল্প বয়সেই তাঁহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যখন গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে ৺শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, ৺শ্যামাকান্ত বাবু কিছু দিন পরে তথায় গমন করেন। সেই সময়ে লালজী ঢাকা আশ্রমে থাকাকালীন আমাদের অজ্ঞাতে কয়েকবার অহিফেন সেবন করেন, তাঁহাকে লইয়া তখন আমাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। সমস্তরাত্রি যাহাতে তাঁহার ঘুম না হয়, তজ্জন্য পাচারি করতঃ জাগিতে হইত। অমি গোস্বামী মহাশয়কে এ বিষয় শ্রীবৃন্দাবনে লিখিয়া জ্ঞাত করায় তিনি তাঁহাকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে লিখেন। তৎপর এক দিন প্রাণনাশক কোন বিষ আমাদের অজ্ঞাতে সেবন করিয়া ইচ্ছাকৃত মৃত্যুকে আহ্বান করেন। তখন ১৭।১৮ বৎসর তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল। 'লালজীর অপঘাতমৃত্যু হইল' একথা বলায় গোঁসাই বলিলেন, দেহপাত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে দেহ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

লালজী স্বহস্তে লিখিয়া ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক যে প্রবন্ধ বরিশাল গাভানিবাসী শ্রীবাণীকণ্ঠ ঘোষ মহাশয়কে দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ—

"প্রদর্শনী শেষ কবিতা।"

যাঁহার ক্ষণকালের জন্যও গভীরতার বিশ্রাম নাই, যিনি অবিশ্রান্ত জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আছেন, যাঁহার নিকট নিখিল গুপ্তরহস্য প্রকাশিত, যিনি কর্ম্ম-কৌশলের সমস্ত কৌশলযুক্ত জ্ঞান জানিয়াছেন, যিনি জগতাতীত রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, যাঁহার আত্যন্তিক শান্তচিত্ত নিয়ত প্রেমামৃত ভোগ করিতেছে, যিনি যাবতীয় বাসনা ত্যাগ করিয়া মায়াতীত হইয়াছেন, যাঁহার সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি জগতের দুঃখভার বহন করিবারই জন্য, সেই লোকভাস্কর সান্দ্রানন্দ পরম পুরুষ বুদ্ধ রাহুলকে বলিতেছেন ঃ—

বুদ্ধবচন।

"বৎস রাহুল, বহু পদার্থকে জ্ঞাত হওয়া যায়, নক্ষত্রের গতি জানা যাইতে পারে, সুশৃঙ্খলাজ্ঞান লাভ হইতে পারে, অনেক বিষয়ে সুদক্ষ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু গোপনীয় পদার্থকে কে জানিতে পারে বা কে জানিতে চায়? সুচিকিৎসক বনের মধ্য হইতে অতিশয় গোপনীয় ঔষধের বৃক্ষ আবিষ্কার করিতে পারেন, জ্যোতির্বিদ্‌গণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলমধ্যস্থ আনক গুপ্তরত্ন আবিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু নিত্যগুপ্ত পদার্থকে কে জানিতে চায়? যেখানে সমুদায় পদার্থের সুমিলন হইলেও এক পদার্থের স্থিতি, যেখানে সংখ্যা নাই, পরিমাণ নাই, নির্দ্দেশ নাই, অসত্য নাই, ভাবাভাব নাই, সেই একমাত্র নিত্যগুপ্ত পদার্থ। বাহ্য জগৎ ও প্রকাশিত পদার্থের জ্ঞান সকলেই লাভ করিতে চায়, কিন্তু যে নিত্য পদার্থের জ্ঞানলাভ দ্বারা সমুদায় জ্ঞানলাভ হয়, সেই জ্ঞানলাভের প্রয়াসী অল্প লোকেই। আমি নির্ব্বাণপথে অগ্রসর হইতেছি, শীঘ্রই দেহত্যাগ করিব, তাই নিত্যপদার্থলাভের উপায় বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

উচ্চ সত্যজ্ঞান।

সর্ব্বপ্রথমে উচ্চসত্যজ্ঞান লাভ করা। যে জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ বোধিসত্ত্ব লাভ হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে জ্ঞানে অধোমুখী সংসারবন্ধন ছিন্ন

হইয়া যায়। সংসারক্ষেত্রে তাকাইয়া দেখ কিছুই থাকে না। এক কালে জন্ম, কাল আবার যৌবন আনয়ন করে; অবশেষে বৃদ্ধকাল আসিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করায়। তবে এ সংসারে সুখ কোথায়? ইহা গভীর ধারণা হইলে মানবহৃদয়ে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন সিংহের ন্যায় সংসারের সুখ তুচ্ছ করিয়া দুঃখনিবৃত্তির জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

বুদ্ধবচন।

বৎস রাহুল, আমার যখন আত্যন্তিক দুঃখনিবারণের ইচ্ছা হইল, তখন দেখি জরামরণাদি জাতিগত পার্থক্যের ফল। জাতিগত পার্থক্য উৎপত্তির ফল। উৎপত্তি উপাদানসম্ভূত। উপাদান তৃষ্ণা হইতে। তৃষ্ণা বেদনা হইতে। বেদনা স্পর্শপ্রত্যয়ের ফল। স্পর্শ ষড়ায়তন হইতে। ষড়ায়তন নামরূপ হইতে। নামরূপ বিজ্ঞানের ফল। বিজ্ঞান সংস্কারজ। সংস্কার অবিদ্যাসম্ভূত। এই অবিদ্যা বিনাশ করিলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়।

ব্রহ্মচক্র।

আমি যখন দুর্দ্দান্ত মারকে পরাজয় করিলাম, আমার যখন অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন আমার নিকট সমুজ্জ্বল জ্যোতির্দ্বারা ব্রহ্মচক্র প্রকাশিত হইল। ব্রহ্মচক্রের বর্ণনা করি শ্রবণ কর। ব্রহ্মচক্র একই মাত্র, অনন্ত সংখ্যা মিলিত হইলেও ব্রহ্মচক্র সংখ্যাতীত। আত্যন্তিক ঘন অবকাশশূন্যগতি-প্রযুক্ত ব্রহ্মচক্র নিশ্চল শান্ত। অসাম্প্রদায়িক ব্রহ্মচক্রে সমুদায় সম্প্রদায়ের মিলন। সমুদায় পদার্থের মিলন প্রযুক্ত ব্রহ্মচক্রে একই পদার্থের স্থিতি। সমুদায় অগণ্য অবসরশূন্য ভাবের মিলনপ্রযুক্ত ব্রহ্মচক্র সত্য। ব্রহ্মচক্রকে মানব জানিয়াও জানিতে পারে না। ব্রহ্মচক্রে নাই এমন কিছুই নাই, তাই ব্রহ্মচক্র অনন্ত। এই ব্রহ্মচক্র প্রকাশিত হইলে সুমঙ্গল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বুদ্ধবচন।

বৎস রাহুল, সুগভীর আত্যন্তিক প্রেমের দ্বারা আমি মধ্যপথ দিয়া গিয়া ব্রহ্মচক্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মচক্রের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান।

দুইটী বিষয়ের জ্ঞানলাভ কর। বিনীত হইয়া প্রকৃতির বিষয় জ্ঞানলাভ করিবার জন্য শুদ্ধ নিয়মে নীতিপরায়ণ হইয়া থাকিয়া বিকৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তখন প্রকৃতস্থ ও স্বাধীন হইতে পারিবে। এই প্রকৃতিতত্ত্বদ্বারা প্রকৃতিকে ব্রহ্মচক্রের সহিত ভিন্ন জানিতে পারিবে। এই ভিন্ন জ্ঞানের নাম দ্বৈত জ্ঞান।

এই প্রকৃতিতত্ত্বের প্রধান বিষয় আত্মতত্ত্ব। সংযমী হইলে এই আত্মতত্ত্ব জানা যায়। আত্মতত্ত্ব দ্বারা নিজের স্বাধীন সত্তা বাহির হইয়া আসে। ইহা দ্বারাই মানবগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। তোমার স্বাধীন সত্তার শেষ সীমা জ্যোতির্ম্ময় একটী বিন্দু। এই বিন্দু এক, এই বিন্দু নিরাশ্রয়। এই বিন্দু মন ও বুদ্ধির অগোচর। দ্বৈতজ্ঞানের শেষ সীমা বিন্দুলাভ। নিয়ত বিন্দু-ধারণের দ্বারা প্রকৃতির সমস্ত জ্ঞানই লাভ হয়। দ্বৈতজ্ঞানলাভের শেষ সীমায় অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হয়। প্রকৃতিরাজ্যের অতীত তোমার বোধিসত্ত্বে স্থিত একই চৈতন্য পুরুষ। ইহাই অদ্বৈত জ্ঞান। বোধ—যদ্দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের বোধ হইতেছে। তাহা যে আদি মূল বোধ হইতে হইয়াছে, তাহা এক এবং অদ্বয়। এই দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্মচক্র প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধবচন।

দ্বৈতজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতির সুশৃঙ্খলা নিয়ম জানা যায়। অদ্বৈত জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মচক্র জানিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু এই দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান করিতে হইলে তিনটী রত্ন লাভ করিও।

তিনটী রত্ন।

বৎস রাহুল, তিনটী রত্নের কথা বলি ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য কথা বলি শ্রবণ কর। তিনটী রত্ন সঙ্ঘ, ধর্ম্ম, বুদ্ধ। বিশুদ্ধভাবে সৎসঙ্গ করিতে হইবে। যাজনের দ্বারা ধর্ম্মলাভ করিতে হইবে। আনুগত্যের দ্বারা উচ্চ সত্য লাভ করিয়া সম্বুদ্ধ হইতে হইবে। বুদ্ধরত্নের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনটী রত্নদ্বারা তিনটী বিষয়, তিনটী অবস্থা ও তিনটী জ্ঞান লাভ হয় এবং তিনটী বিষয় দুর হয়। শরীরে পিতৃধন রক্ষিত হয়, এই একটী বিষয়। মনে শান্তি ও আত্মায় সত্যলাভ হয়, অপর দুইটী বিষয়। ভূতশুদ্ধি দ্বারা বায়ু স্থির হইলে শরীরে পিতৃধন রক্ষিত হয়। সৎ বিশ্বাস, সৎ স্মৃতি, সৎ ধ্যান, সৎ ধারণা দ্বারা মনে একাগ্রতা হয় এবং তদ্দ্বারা মনে শান্তি হয়। শান্ত মন আত্মস্থ হইলে সত্যলাভ করিতে পারে। কর্ম্মকৌশল জানিয়া এবং প্রকৃতির সুশৃঙ্খলাকর্ম্ম করিয়া সাধারণ নিয়ম দ্বারা সহজে প্রকৃতিস্থ হওয়া যায়, এই একটী অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, বিষয়ে স্থিতি করিয়া সুকোমল প্রেম ভোগ করা। এই অবস্থায় তৃষ্ণা বিনাশ হইতে থাকে, তখন সকল পদার্থই মহিমান্বিত দেখিতে পাইবে। তৃতীয় অবস্থার চরমসীমা নির্ব্বাণ অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞান দ্বারা সুখদুঃখ যাইবে, পাপ ও পুণ্য যাইবে, অশান্তি বিদুরিত হইয়া আত্যন্তিক সুখ হইবে এবং সমাধিস্থ থাকিতে পারিবে। তোমার জাতীয় জ্ঞান, বংশীয় সংস্কার, তোমার কালগত জ্ঞান বিদুরিত হইয়া যাইবে। অজাতীয় চিন্তা দ্বারা জাতিজ্ঞান যাইবে, যোগিবংশে আত্মসমর্পণ দ্বারা বংশীয় সংস্কার যাইবে। নিত্যপদার্থ উপলব্ধি দ্বারা কালগত জ্ঞান যাইবে। এই জ্ঞান যাইলে তোমার একটী প্রথম জ্ঞান হইল। দ্বিতীয় জ্ঞানে তোমার নিকট ব্রহ্মচক্র প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় জ্ঞানে তুমি ব্রহ্মচক্রে প্রবেশ করিবে। এখন যাইবে কি ? আধিভৌতিক তাপ, আধিদৈবিক তাপ এবং

আধ্যাত্মিক তাপ। তিনটী রত্ন হইলে যে তিনটী বিষয়, অবস্থা ও জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বলিয়া যে তিনটী দূর হয়, তাহাও বলিলাম।

বুদ্ধবচন।

বৎস রাহুল, আমি তোমাকে সংক্ষেপে অনেক কথা কহিলাম এবং সমস্ত উপায় বলিলাম। এক্ষণে তুমি এইগুলি শিক্ষা কর এবং দৃঢ় করিয়া ধারণ করিয়া রাখ। আর কয়েকটী নীতি বলি শুন। কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইও না এবং অন্যের শয্যায় শয়ন করিও না, এবং অন্যের সঙ্গে বেশী মিশিও না এবং অন্যের বস্ত্র পরিধান করিও না। এইগুলি সামান্য কথা হইলেও লোককে ইহা শিক্ষা দিও।

সুগভীর যোগারূঢ় বুদ্ধ আবার রাহুলকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—বৎস, আমি ব্রহ্মচক্রে স্থিতি করিয়া যে উদার ধর্ম্মচক্র গঠন করিয়াছি, সেই ধর্ম্মচক্র তিন রত্ন শোভিত। এই তিনটী রত্ন রক্ষা করিতে হইলে চারিটী বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চারিটী নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার বিষয় উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। খণ্ড পদার্থ হইতে এক প্রকার সৌন্দর্য্য বিকাশ হয়, তাহাতে অনেক সময় মন মুগ্ধ হইয়া যায়। তুমি এই মোহ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্ঘরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিবে; কারণ দিবাভাগের পদ্মফুল যেমন রজনীতে শুকায়, তেমনি সেই সৌন্দর্য্য সাময়িক। আসঙ্গলিপ্সা পরিত্যাগ করিবে। যখন অন্যের সঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখন হৃদয়কে ধর্ম্মযাজনে প্রবৃত্ত না করিলে আলস্যপীড়া জন্মিবে, সুতরাং তাহাই করিবে। সর্ব্বপ্রকার মৈথুনভোগ পরিত্যাগ করিবে। মৈথুনভোগেচ্ছা হইলে হৃদয়ে একাগ্রতা আনিতে চেষ্টা করিবে। একাগ্রতা ধর্ম্মরত্নের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ; নতুবা হৃদয় বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে। লোভ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধরত্নের আনুগত্য দ্বারা উক্ত রত্ন রক্ষা করিবে। কপটতা, কল্পনাপ্রসূ অসার ধর্ম্মানুরাগ, জেদ, প্রমত্তা পরিত্যাগ করিলে হৃদয়ে সরলতা, পবিত্রতা, মৃদুতা এবং

বিনয় আসিবে। এই চারিটী নীতি গ্রহণ করিবে। এই চারিটী নীতিবিহীন ব্যক্তিকে তুমি মূঢ় বলিয়া জানিও। কপটতা পরিত্যাগ করিবার জন্য নিজের হৃদয়কে অন্বেষণ কর। অসার ধর্ম্ম যদি ত্যাগ করিতে চাও, তবে সত্য পালন কর। সত্য পালন করিতে এবং সত্যরক্ষা যদি চাও, নিজকে অনুক্ষণ নিয়মিত করিয়া রাখ। সত্যে দৃঢ় হইলে জেদ যাইবে। শিক্ষিত হইলে প্রমত্ততা যাইবে। তিনটী রত্ন রক্ষা করিবার উপায় বলিলাম। পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত চারিটী নীতি পালন করিয়া আলস্য, সংশয়, নিরুৎসাহ এবং অত্যন্ত উৎসাহ, এই চারিটী রোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। তুমি উক্ত রোগগ্রস্থ ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

সমস্ত উজ্জ্বলরসে তৃপ্ত, অতিশয় শান্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভগবান্ বুদ্ধকে রাহুল প্রণাম করিলেন। বুদ্ধ মৃদু মধুরস্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সুখী হও, বিনয়ী হও।"

সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাণীবাবু বলিয়াছেন যে এই লেখা তাঁহার সমক্ষে গোঁসাইয়ের নিকট পড়িয়া শোনান হয়। তাহাতে তিনি বলিলেন, ঘটনা সত্য, অর্থাৎ বুদ্ধদেব রাহুলকে এই সব বলিয়াছিলেন। তাহা লালজী কিরূপে জানিল জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'সে ক্ষমতা লালের ছিল।'

লালজীর নিম্নলিখিত উক্তি পাঠককে উপহার দিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করি :—

"অর্দ্ধেক হইল, আর সব রইল।
আর তো পারি না, কিছুই জানি না।
মনোযোগ দিয়া, তাধিয়া তাধিয়া।
হরিনাম সার, কর একবার।
দুঃখ নাহি রবে, তাহাতে বাঁচিবে।

খুস খুস গলা, বোল হরিবোলা।
দিনু উপহার, সযতনে ধর।
সফল জীবন, করহ এখন।
শুন মম বাণী, ওহে ঠাকুরাণী।
পাগলামি ক'রে, দিনু মুই সেরে।

আমার নাম লালবিহারী বসু, বাড়ী শান্তিপুর, হাটখোলা গোস্বামী পাড়া, পিতার নাম রামগোপাল বসু।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

উপদেশ।

(১)

এই যে শোভা দেখিতেছ,—চন্দ্রের আলোক, পুষ্পের সৌরভ, এ সকল তাঁহারই। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁহার শোভা দর্শন কর। পুষ্পের সৌরভে, পতিপ্রাণা সতীর অন্তরের পবিত্রতায়, বালকের হাস্যবদনের মধ্যে তাঁহাকেই দর্শন কর।

জীবনে এমন কোন কার্য্য করিও না যাহা ধর্ম্ম বলিয়া করিতে না পার। কোথাও যাও, সকল স্থানে তোমার প্রভু বর্ত্তমান, সমস্ত জগৎ, সমস্ত কার্য্য তাঁহার; এইরূপ ধর্ম্মকে বিস্তৃত কর। সত্যকথনমাত্র ধর্ম্ম নয়। তোমার যে কার্য্য তাহাই তুমি পরমেশ্বরের কার্য্য বলিয়া সম্পাদন কর। তুমি ভৃত্য হও, ছাত্র হও, চিকিৎসক হও, আর যাহাই হও, তোমার সকল কার্য্যই ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া কর।

তোমার অভিমান—তোমার বিদ্যার অভিমান, তোমার ধর্ম্মের অভিমান, লোকসমাজে তোমার প্রতিপত্তির অভিমান তোমার দৃষ্টিকে রোধ করিতেছে। তুমি মনে করিতেছ, তুমি সাধনভজনদ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিবে, উপাসনা দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিবে এবং এই পুণ্যবলে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিবে। হে মানব! এরূপ ভ্রমান্ধ হইও না। যদি তোমার মনে বিন্দুমাত্রও অভিমান থাকে, তোমার সহস্র তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন নিষ্ফল হইবে। সেজন্য হে মানব! দেখ তোমার মনে কোথাও অহঙ্কার আছে কি না। যদি থাকে তদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান পাইবে না। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার শরণাপন্ন হও। স্ত্রী, পুরুষ, অজ্ঞান, বিদ্বান্ সকলের হৃদয়েই ইনি বর্ত্তমান। যত দিন প্রকাশিত না

হন, ততদিন সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যার অন্বেষণ কর। পুস্তক পাঠে, গুরুর নিকটে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যার জন্য লালায়িত হও।

যিনি দোষ বলেন, প্রথমতঃ তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার করিতে হইবে। পরে মন একটু প্রশস্ত হইলে তাঁহাকে মুখে কৃতজ্ঞতা দিবে, ধন্যবাদ দিবে এবং মন আরও প্রশস্ত হইলে সেই দোষবক্তা বন্ধুকে—সেই গুরুকে প্রণাম করিবে, তাঁহার পদচুম্বন করিবে। তখন আমরা যথার্থ বন্ধুতার মধুরতা সম্ভোগ করিতে পারিব।' আমরা যেন দোষবক্তা বন্ধুকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিয়া নিজ জীবনের পাপ কলঙ্ক অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারি।

আমরা যেন সর্ব্বপ্রকারের ইচ্ছা শাসন করিয়া একমাত্র ধর্ম্মের জন্যই সাধনাতে প্রবৃত্ত হই। এজন্য অন্যে প্রশংসা করিবে কিনা, লোকের নিকট প্রশংসা পাইব কিনা এ দিকে যেন আমাদের ভাবনা না থাকে। তাহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা আমাদের দুষ্ট অশ্ব মনকে শাসন করিয়া যেন সাধনায় নিযুক্ত হই।

চতুর্দ্দিকে প্রলোভন বিভীষিকা, ইহার মধ্যে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে; এ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কঠোর সাধনসাপেক্ষ, ধর্ম্ম উপার্জ্জন বা ধর্ম্মরক্ষা সহজ কথা নয়। এজন্য আমাদিগকে অন্তরের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কামনা ও বাসনা বর্জ্জন করিতে হইবে। কামনা বাসনা থাকিলে অমরত্বলাভ হইবে না।

লক্ষ্মণ সীতার পদ দর্শন করিয়াছিলেন, মেঘনাদকে পরাজয় করিবার জন্য। আমরাও সেই ব্রত গ্রহণ করিব। স্ত্রীজাতির চরণ-যুগল দর্শন করিব আমাদের প্রধান রিপুকে জয় করিবার জন্য। আমরা তাঁহাদের মুখ দর্শন করিব না। আমরা তদ্রূপ জিতেন্দ্রিয় হই নাই যে, তাঁহাদের মুখচ্ছবিতে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিব। স্ত্রীজাতির মুখে ঈশ্বরের মাতৃভাব;

সেই মাতৃভাবকে পূজা করিতে হইলে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতে হইবে।

আমি দেখিয়াছি যে দিন দিনান্তে অন্ততঃ একবার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া একটী প্রণাম করিতে পারি, সে দিন আমার ভাল যায়। তিনি শব্দ নন, অক্ষর নন, পুস্তকের ভাষা নন, তিনি মানুষের মনের ভাব নন, তিনি প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ দেবতা; তাঁহাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া আরাধনা করিতে পারিলে হৃদয় মন পবিত্র হয়।

কেবল হরিনামই একমাত্র উপায়; কলিতে তদ্‌ভিন্ন অন্য উপায় নাই। প্রকৃতরূপে প্রত্যেকের নিকট এই সাধন শ্রেষ্ঠ সাধন। কারণ, ইহার মধ্যে হৃদয়ের প্রার্থনীয় সকলই মিলিবে। নামের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চসাধন নাম আর ঈশ্বরদর্শন একীভূত হওয়া। নাম করিবামাত্র ঈশ্বর সমক্ষে। তখন শব্দের অর্থ সমগ্রস্বরূপসম্পন্ন ঈশ্বরের সত্তা

আমরা কি ভগবান্‌কে ডাকিতে পারি? তিনি নিজে আমাদিগকে ডাকেন। মা সন্তানকে নিজে ডাকিয়া কোলে লন। সন্তান যখন খেলায় মত্ত থাকে, তখন সে নিজে কখনও মার কাছে যায় না। মা ডাকিয়া বলেন এস বাছা খাও, বলিয়া আহার দেন, আদর করেন। ভগবান্‌ও আমাদের লইয়া তাই করেন। আমাদিগকে তিনি নিজেই ডাকিয়া লন; আমাদের কি সাধ্য যে তাঁর কাছে যাই।

আমার দেবতা কোথায়? সমাজে, কি মাঠে, কি ঘাটে, না প্রাণের মধ্যে? প্রাণের মধ্যে ডাকিলে যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সে বিশ্বাস কি আছে? যদি এ বিশ্বাস স্থির না থাকে, তবে সে নিষ্ঠাভক্তি কি? যখন বিবেক বিচ্ছিন্ন হয়, জ্ঞানও বিফল হয়, তখন যদি তাঁকে ডাকিতে পারি তবেই তো প্রকৃত বিশ্বাস।

সংসারের শক্তি ছায়াবাজী, সমস্তই স্বপ্নের ন্যায়; স্বপ্নে যেমন ব্যাঘ্রাদি-

দর্শন হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের কোন শক্তি নাই, সংসারের শক্তিও সেইরূপ রজ্জুকে সর্পজ্ঞান—সকলই ধোকার টাটি। একবার যদি বোধ হয়, এ সব কিছু নয়—কেবল একবার যদি প্রকৃত বোধ হয়, তবে সেই চরাচরের রাজারই জয় হয়। এইরূপে একবার যদি হৃদয়ে তাঁহাকে বসাইতে পারি তবেই সংসারে জয়, তখন সংসারই ধর্ম্ম।

নীচকুলে জন্মিয়াও যদি ধর্ম্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলেই চিত্তের অহঙ্কার বিনষ্ট হয়, সেই নিরহংকার চিত্তেই ভক্তির উদয় হয়, ধনমানাদির অহঙ্কার-সত্ত্বে কখনও ভক্তি আসিতে পারে না।

যে নাম গ্রহণে জীবন ধন্য হয়, সে নাম যদি ধরিতে পারি, তবে তাঁহার প্রতি ভালবাসা হয়; একবার যদি ভালবাসা হয়, সকলই তাঁর চরণে দিতে চাই। মনে করি ইন্দ্রিয়লালসা কিছুতেই যায় না; কিন্তু যখনই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার সেবা করি, তখন আর ইন্দ্রিয়গণ অন্য দিকে যাইতে চাহে না।

যিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তিনি বলেন 'প্রভু, তোমার জয় হউক, আমি ম'রে যাই।' যে ব্যক্তি প্রভুকে চায় সে আর আপনার অস্তিত্ব রাখিতে চায় না, প্রভুকেই রাখিতে চায়। তাহার কিছুই থাকে না, 'কর্ত্তা আমি, জ্ঞানী আমি' সকল যায়—কেবল 'দাস আমি' বর্ত্তমান থাকে।

আমার প্রভু সামান্য বস্তু নয় যে, কথায় প্রকাশ করিব। তাঁকে সত্যই দেখা যায়;—এমন আর কোন বস্তু নাই। সেই রূপ কেন, তাহার সহস্র কণিকার কণিকাও যদি প্রাণে প্রবেশ করে, আর কি সাধ্য আছে—মানুষের শক্তি নাই যে তাঁহাকে ভূলিতে পারে,—এমন শক্তি মানুষের নাই। আমার চক্ষু, কর্ণ সমস্তই যদি তাঁহাকে না ভালবাসে, সে ধর্ম্ম কি? আমি কি রিপু দমন করিতে পারি? তুই এক দিন পারি, পরে আমাকে চূর্ণ করে; কিন্তু প্রভুর কাযে ইহারা বন্ধু।

ধর্ম্ম যতদিন না লাভ হয়, তত দিন কেবল মত, সঙ্কীর্ণতা, দলাদলি ; কিন্তু শেষে এ সব কিছু থাকে না ; সব দল এক ক'রে দেখা যায়, নানাপ্রকার ফুল এক মালায় গাঁথা, প্রভুর গলায় দেখিতে কেমন সুন্দর ! একবার যদি প্রভুকে ভাল বাসিতে পারি, তবেই কৃতার্থ।

সৎসঙ্গ কাহাকে বলে ? যে স্থানে গেলে ধর্ম্মভাব উদয় হয়, অধর্ম্মভাব বিদূরিত হইয়া যায় এবং যে স্থানে কোন প্রকার দলাদলি, সম্প্রদায় নাই সেই সৎসঙ্গ। যে স্থান সৎসঙ্গ, সে স্থান সর্ব্বদা সৎকথা, সদালাপ, সদানন্দে পরিপূর্ণ। কেহ হাসিতেছেন, কেহ আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এই সঙ্গই সৎসঙ্গ। যে স্থানে এ সমস্ত ভাব নাই, সেই সঙ্গ সৎসঙ্গ নয়। যে ব্যক্তি সৎ তাঁহার নিকট সকলে সমান। তাঁহার আপন পর বিবেচনায় আদরের কমবেশ নাই। সংসারের লোক যাহাকে অতি নারকী বলিয়া ঘৃণা করে, সৎ ব্যক্তি তাহাকেও অতি সমাদর করেন ; কারণ, তিনি তাঁহার প্রভুকে তাহার মধ্যে দেখিতে পাইয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট কোন প্রকার দালাদলির ভাব আসিতে পারে না।

গোস্বামী মহাশয় মাঝে মাঝে শিষ্যকর্ত্তৃক গুরুর চৈতন্যোদয় সম্বন্ধে এই গল্পটী আমাদের নিকট বলিতেন।

গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার অবস্থাও ভাল ছিল। এক দেশের রাজা তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সমীপে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করেন ও তাঁহার সেবার জন্য যথেষ্ট যত্নপূর্ব্বক প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী প্রত্যহ প্রেরণ করেন এবং বাসস্থানের উত্তমরূপে সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। কখন কখন সস্ত্রীক কন্যাসহ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণামাদি করিয়া থাকেন। এইরূপে উদাসীন সাধু পরমযত্নে আপ্যায়িত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে দ্রব্যগুণে সাধুর মনেরও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল।

রাজা রাণী সাধুর অলৌকিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ ও সন্তোষ লাভ করিয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট সেই বাসনা ব্যক্ত করেন এবং বলেন আপনি যদি দেশে দেশে ভ্রমণ না করিয়া আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাহা হইলে এখানে অবস্থিতি করিয়া স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগ-চিত্তে সাধন ভজন করিতে পারিবেন, কোন বিঘ্ন হইবে না। বিশেষতঃ আমার একটী মাত্র কন্যা, পুত্র সন্তান নাই, সমস্ত সম্পত্তিই আপনার হইবে, ইচ্ছানুসারে তাহা যথেষ্ট ব্যয় করিতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া তখন সাধু কোন উত্তর দিলেন না। রাজা রাণী চলিয়া গেলেন। তৎপর প্রত্যহ রাজা রাণী কন্যাসহ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করেন ও নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী সেবার জন্য দিয়া থাকেন। এই ভাবে কিছুদিন যাতায়াত করাতে এবং পরম সুন্দরী রাজকন্যাটীকে সন্দর্শন করিয়া সাধুর কন্যারত্নলাভের ইচ্ছা বলবতী হইল। শেষে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পরমানন্দে অট্টালিকায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইল।

গোরক্ষনাথ ইহা অবগত হইয়া গুরুর উদ্দেশে সেই স্থানে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া যথাযথ সমস্ত অবস্থা শ্রুত হইলেন, কিন্তু দ্বারবান্ প্রভৃতি বাধা দেওয়ায় গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া সেই অট্টালিকার প্রাচীরের পরবর্ত্তী সন্নিহিত রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'গোরখা আয়া, গোরখা আয়া' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মীননাথ অট্টালিকায় পর্যাঙ্কে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেই শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি নীচে আসিয়া দ্বারবান্কে বলিলেন, ঐ যে লোকটী 'গোরখা আয়া হ্যায়' বলিয়া চীৎকার করিতেছে উহাকে এখানে লইয়া আইস। এই কথা শুনিয়া দ্বারবান্ তাঁহাকে উহার নিকট লইয়া আসিল। গোরখনাথ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, মহারাজ, এ সব কি দেখিতেছেন? আপনি পুনর্ব্বার

সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন। আপনি এই সব মিথ্যা দুনিয়াদারী গণ্ডগোল এই মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করিয়া চলুন। আর বিলম্ব করিবেন না। তখন গোরখনাথের কথায় মীননাথের কাঙ্গালের হারাধন প্রাপ্তির ন্যায় চৈতন্য হইল। তিনি অমনি গোরখনাথের সঙ্গে চলিলেন, আর পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।

গোস্বামী মহাশয় এই গল্প শুনাইয়া বলিলেন, সাধুদের এ অবস্থা হইতেও পতন হয়। কিন্তু নিরাপদ ভূমি, অর্থাৎ অভয়পদ পাইতে হইলে একেবারে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়, আমার বলিতে তাহাঁর কিছুই থাকিবে না, ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন আসক্তি বা বাসনা কামনা ও সুখেচ্ছা থাকিবে না। যাঁহার এরূপ অবস্থা হয় তাঁহারই অভয়পদ লাভ হয়, পতনের সম্ভাবনা আর থাকেনা।

একটী স্বপ্ন।

আমি একটি প্রকাণ্ড নদীতীরে বসিয়া আছি। লক্ষ লক্ষ লোক নৌকায় পার হইতেছে। আমাকে কেহই ডাকিতেছে না। হঠাৎ একজন আমাকে ডাকিয়া নৌকায় উঠাইল। নৌকাযোগে পরপারে উপস্থিত হইয়া কতিপয় পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে একটি বাগানে লইয়া গেলেন। বাগানে বিবিধ সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ আছে। তথাকার প্রাচীরে লতায় একটি অপূর্ব্ব পুষ্প দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ক্রমে আমি অচেতন হইলাম। তখন ঐ পুষ্পসকল পরমা সুন্দরী স্ত্রীর বেশ ধারণ করিয়া আমাকে বলিলেন, "হে ভদ্র, তোমার হৃদয়নাথকে অন্বেষণ কর।"

আমি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ উদ্যানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে একটি কুকুর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "আতিথ্য-স্বরূপ এই ফল ভক্ষণ কর।" আমি ফলটি ভক্ষণ করিবামাত্র কুকুরটি চলিয়া গেল। একটি জটাধারী ঋষি আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বৎস, আমার

হস্ত ধারণ কর।" আমি তাঁহার হস্তধারণ করিবামাত্র উভয়ে আকাশপথে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহ অতিক্রম করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ধামে উপস্থিত হইলাম। সেস্থানের উজ্জ্বল জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া গেল। ক্রমে যাইতে যাইতে একস্থানে গিয়া দেখিলাম কয়েকজন মহর্ষি উজ্জল তারার ন্যায় যোগসাধনে বসিয়া আছেন। আমার পথপ্রদর্শক মহর্ষি আমার হস্তত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে উপবেশন করিলেন। ঐ সাধুমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কস্ত্বং' আমি উত্তর করিলাম, "অস্তি পৃথিব্যাং ভাগীরথীতীরে শান্তিপুরনামা কশ্চিৎ জনপদঃ। তত্র শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যনামা প্রসিদ্ধসিদ্ধপুরুষোঽভূৎ। তস্যকুলে জাতো বিজয়কৃষ্ণগোস্বামিনামা অকিঞ্চনোঽহং ভবতাং সমীপমাগতঃ। ভগবদ্দর্শনলালসয়া মণঃপ্রাণাঃ বিদীর্য্যন্তে। হে সত্তম, ময়ি প্রসীদ।" আমার কথা শ্রবণ করিয়া কৃপালু সাধু বলিলেন, "বৎস, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ উপাবিশ"। আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। সাধুগণ সমস্বরে 'ওঁ নমস্তে সতে তে সর্ব্ব-লোকাশ্রয়ায়' স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব পাঠ করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভগবানের প্রকাশ হইল। সে শোভা দেখিয়া আমি অচেতন হইলাম। চেতন পাইয়া দেখিলাম আমি পৃথিবীর সেইউদ্যানে রহিয়াছি। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িতে লাগিলাম। হায়! কেন আমি প্রভুকে দেখিয়া অচেতন হইলাম। হে প্রাণ! তুমি কেন সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলে; তখন আমাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বৎস, স্থির হও প্রভূর চরণ ধ্যান কর। আশা পূর্ণ হইবে। প্রভু তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন।" ইহার পর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নীলকণ্ঠের গানে অনেক উপকার হইয়াছে। নাস্তিক বিশ্বাসী হইয়াছে। শান্তিপুরে আমি একদিন স্নানে যাইতেছি, শুনিলাম গান হইতেছে। আমি সেখানে গেলাম। এক ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে গান হইতেছিল, একটি

মুসলমান মগ্ন হইয়া শুনিতেছে, চক্ষের জল পড়িতেছে। এক গোস্বামী তাহাকে দেখিয়া বলিল, "ওঠ বেটা, তুই এখানে কেন? একি হাট বাজার?" নীলকণ্ঠ হস্ত জোড় করিয়া বলিলেন, "প্রভু, এ কি? কৃষ্ণনামে আবার জাতিবিচার? হরিদাস যবন হইয়াও হরিনামে জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন, যাঁহাকে আপনি এখন ও বেটা! বলিতেছেন, দেবতারা এখন তাঁহার চরণ-ধূলি প্রার্থনা করিতেছেন।" এই সময় একটি গান রচনা করিয়া গাহিলেন ;

গোস্বামী মহাশয় বলিতেন—দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনিয়া যে মর্য্যাদালঙ্ঘন করা হইয়াছিল, এ যাবৎ এদেশে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। এদেশবাসী যত দিন না স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি করিতে শিখিবে, তত দিন এদেশের কল্যাণ হইবে না। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যে উন্নতি দেখা যায়, তদ্দেশীয়গণের নারীজাতির ও স্বজাতির প্রতি সম্মানই তাহার শ্রেষ্ঠ কারণ। এই জন্য তাঁহারা ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মানুষ তিনটি গুণের অধীন, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। শাস্ত্রকর্ত্তারা আহার ব্যবহার দ্বারা কে কোন্ গুণান্বিত তাহা নিরূপণ করিয়াছেন।

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ।
পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া কিংবা শুনিয়া ধর্ম্মলাভ হয় না। সাধু, গুরু, ভক্তের কৃপা হওয়া চাই এবং তাঁহাদিগের উপদেশ পাইয়া জীবনে তাহা লাভ করিতে নিজের সাধন চাই। সাধন দ্বারা আপনাকে ধরা যায়। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, ভগবদ্ভক্তির উদয়েও পাপ, তাপ ও সর্ব্বপ্রকার অন্ধকার দূরীভূত হয়। তখন কেবল আনন্দ, পূর্ণানন্দ।

শান্ত, দান্ত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিবে।

অনাশ্রমী পুরুষেরও জপাদিসাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভব—স্মৃতি বলিয়াছেন।

ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক।

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃস্যাৎ—অর্থাৎ যৌবনকালেই ধর্ম্মশীল হইবে। বীর্য্য-ধারণ প্রধান কর্ত্তব্য। বীর্য্যরক্ষা না হইলে ঐহিক পারত্রিক দুইই নষ্ট হইয়া যায়। শাস্ত্রবিহিত মতে চলিলে সেটি হয় না। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষলাভে সর্ব্বদা যত্ন করা কর্ত্তব্য। কুসংসর্গ, কুস্থান এবং মাদকাদি বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

সংগ্রাম অনিবার্য্য। যে পর্য্যন্ত দৃঢ় না হওয়া যায় সে পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিতেই হইবে। যেমন চারা গাছ বেড়া দিয়া পশু পক্ষী হইতে রক্ষা করা হয়। কামক্রোধাদি যাহাতে বিপথে চালিত করিতে না পারে তজ্জন্য প্রবল সংগ্রাম করিতে হয়। অসংযত হিতাহিতজ্ঞানশূন্য লোক আপাতমধুর কাযে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বনাশ করে। শাস্ত্রানুসারে সংযম অভ্যাস করিলে রিপুকুলকে বশে আনা সম্ভব হয়।

প্রাণায়াম গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। ইহাকে ভূতশুদ্ধি বলে। ইহা দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয়, মন স্থির হয় ও ইন্দ্রিয়দমনের সাহায্য হয়। সদ্‌গুরু খুঁজিতে ব্যস্ত হইতে হয় না। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে উপযুক্ত পাত্রের কোন না কোন সময়ে তাহা লাভ হইয়া থাকে।

সংসারাসক্তি, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও বিষয়াসক্তিবর্জ্জনের নাম অনাসক্তি। অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মবোধে সংসারের সকল কাজই করিতে হইবে। ফলাফলের প্রত্যাশা না করিয়া নির্লিপ্তভাবে কাজ করার নামই নিষ্কাম কর্ম্ম।

সাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। অহঙ্কার, অভিমান প্রভৃতি দূর হইলে মানুষ ভগবৎকৃপা লাভ করে।

সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর না হইলে প্রকৃত শান্তিলাভ হয় না। নির্ভরতা দুই প্রকার—পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ। সচরাচর সাধনাবস্থায় সকলকে পরোক্ষ ভাবেই চলিতে হয়। জগতের ও আমার একজন স্রষ্টা, পাতা ও বিধাতা আছেন। এইরূপ নির্ভরতা পরোক্ষভাবেই হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কখন সরস ভাব, আবার কখন শুষ্কতা আসিবে। অনন্যোপায় হইয়া ভগবদ্দর্শনের জন্য যে আন্তরিক সরল ইচ্ছা, ইহা কখন কখন পুরুষকার দ্বারা হইয়াছে দেখা যায়। যেমন শাক্যসিংহের হইয়াছিল। ছয় বৎসরের তপস্যা পরিশ্রম সকলই বৃথা হইল দেখিয়া তিনি এমন সংকল্প করিলেন যে, এই উপবেশনেই হয় সিদ্ধিলাভ হইবে নচেৎ প্রাণত্যাগ করিবেন। তাঁহার সেই 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন' মন্ত্র শুনিয়া সঙ্গিগণ তাঁহাকে ভ্রষ্টাচারী নাস্তিক প্রভৃতি কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। ইহা তাঁহার পক্ষে কি ভয়ানক পরীক্ষা! কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার ঐকান্তিকী নির্ভরতা ও প্রাণের প্রবল বাসনা জানিয়া এমন কৃপা করিলেন যে, তিন দিনেই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। তিনি উত্থান করিয়া বলিলেন, "আমি ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া পরা শান্তি লাভ করিলাম।"

বাগানে কত ফল, ফুল, গাছ পালা থাকে। মালিক বা মালী তাহার ব্যবহার ও প্রয়োজন জানে। যদি কেহ একটীকে নষ্ট করে তবে তাহা তাহার অজ্ঞানতার দোষে অন্যায় হইবে। এই সংসারেও নানাবিধ মানুষ আছে। প্রত্যেকেরই কোন না কোন প্রয়োজন আছে। বৃথা কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। যে ঘৃণা ও রোষপরবশ হইয়া অন্যকে আঘাত করে বা মর্ম্মবেদনা দেয়, সে নিতান্ত দুর্ব্বোধ ও কৃপার পাত্র। সে কখনও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না।

টাকা কালকূট! ঘরে কখনও পুষিয়া রাখিবে না। টাকা উপার্জ্জন করিয়া প্রয়োজন মত ব্যয় করিবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা

ভগবানের গচ্ছিত ধন বলিয়া মনে করিবে। যদি তিনি লোক পাঠান, (অর্থাৎ যদি কেহ অভাবে কি বিপদে পড়িয়া আসে) তবে অমনি তাহা দিয়া দিবে। যাঁহারা ধনী হইতে চান তাঁহাদের কথা ভিন্ন। যাঁহারা ধর্ম্ম চান, তাঁহাদের কোনমতে দিন কাটিয়া গেলেই হইল।

যত দিন মনের কার্য্য থাকে, তত দিন স্ত্রী পুরুষের অথবা বিষয়ের আকর্ষণ থাকে। মনের লয় হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে, কিন্তু কার্য্য স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ থাকে না।

ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসক শৈব, সৌর, গাণপত্য ও শাক্ত। মাধুর্য্যভাবের উপাসক বৈষ্ণব। সীতারাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণউপাসক যদি ঐশ্বর্য্য-ভাবের উপাসক হন, তবে তাঁহাদিগকে শৈব, সৌর, গাণপত্য বলিতে হইবে। কালী, দুর্গা, শিব, সূর্য্য, গণপতি নারায়ণউপাসক যদি মাধুর্য্য-ভাবের উপাসক হন, তবে তাঁহাদিগকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ তাহার প্রমাণ।

ভ্রষ্টা স্ত্রী ও পুরুষ অত্যন্ত সাহসী। যাহার যে অভাব সে তাহা বুঝিতে পারে, অন্যে বুঝে না। কিন্তু শরীরে কি চায় তাহা অনেক বিজ্ঞ লোকেও জানে না। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, ইহার কোন্ পদার্থের কোন্ কার্য্য তাহা না জানিয়া, প্রকৃত আহার কি তাহা না জানিয়া আহার করে। বালক মলত্যাগ করিয়া তাহা ভক্ষণ করে এবং অতি আনন্দে হাস্য করে; কিন্তু মাতা পিতা ঘৃণায় নাকে হাত দেন।

ক্রোধী যদি লঙ্কাসর্ষপ প্রভৃতি পিত্তবৃদ্ধিকর উত্তেজক বস্তু ভোজন করে, কামুক যদি মৎস্য, মাংস, ঘৃত, মধু এবং মিঠাই প্রভৃতি খায়, লোভী যদি অধিক তিক্ত খায়, অহঙ্কারী যদি অধিক মসুরের ডাল খায়, সংসারের মোহে আসক্ত ব্যক্তি যদি অধিক অম্বল খায়, অভিমানী যদি অধিক লবণ খায়, তাহা হইলে শিশুর ন্যায় আহার হয়।

সাংখ্যযোগে কপিলদেব পঞ্চতত্ত্ব বিভাগ করিয়া এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া প্রত্যেক্ তত্ত্বের সহিত মনের কি সম্বন্ধ তাহা ঠিক করিয়া আহার বিহারের বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিষ্ণুপরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব, পাতঞ্জল-দর্শন, মৈত্রেয় উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে। তাহা দেখিয়া আহার বিহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত মাতা পিতা সন্তানের জন্য দায়ী। আহারের সঙ্গে ধর্ম্মসাধনের যোগ আছে। আহার মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

ক, খ, অভ্যাস করিয়া পড়িতে শিখিলাম। পরে যে পুস্তক পড়ি প্রত্যেকের মধ্যে ক, খ, আছে। ক, খ, ত্যাগ করিয়া পড়িতে পারি না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেইরূপ। একটী একটী প্রণালী ধরিয়া চলিতে হইবে। প্রথমে এই দেহই আমি, এইজ্ঞান ভেদ করিয়া শরীর তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা এ সমস্ত করিতে হয়। যিনি না করেন, তিনি দেহ ও আত্মা যে কি তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। পরে সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে হইলে দেবতা সকলের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। তজ্জন্য দেবোপাসনা: সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলে তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর সমস্ত কিছু নহে এরূপ বোধ হয়। আমি এবং ব্রহ্ম এক কি ভিন্ন ইহার জন্য যোগ। এ যাগ প্রাণায়াম প্রভৃতি নহে। আত্মাতে পরমাত্মাদর্শন। যথার্থ যাগ সাধিত হইলে, ভগবান্ কিরূপে জগতে বিরাজ করেন তাহা প্রত্যক্ষ হয়। তখন ইহলোক পরলোক এক হয়। পূর্ব্বকালের ঋষিগণ অনেক পরিশ্রম করিয়া এইরূপ ক্রমে ক্রমে সাধন প্রণালী লাভ করিয়াছেন। ক্রম অনুসারে না হইলে, যেটুকু সাধন করিবে তাহারই ফল পাইবে। পরের অবস্থা বুঝিতে পারে না, এখন সমস্ত বিশৃঙ্খলা, কিছুই প্রকৃতরূপে হয় না। মৃত্তিকায় বীজ

বপন করিলে, গাছ এবং ফল হয়; ইহা কৃষকের গুণ নহে, সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মের গুণ; সাধনক্রমও তদ্রূপ।

পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে—এ সকল বিষয় যত দিন না প্রত্যক্ষ হয় কেহ আছে অথবা নাই বলিলে সন্দেহ যায় না। যাহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাহারা শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে অনায়াসে বিশ্বাস করিবে। যাহারা মুক্ত নহে তাহারা পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

অভক্ত যদি দীন হীন হইয়া ভগবৎ-চরণে পড়িয়া থাকেন, তাহা-হইলে ভক্তি দেবী অবশ্যই কৃপা করিবেন। কিন্তু আমি ভক্ত, এই অভিমান যেখানে, সেখানে ভক্তি দেবী গমন করেন না। ভক্তির অর্থ, যাহাদ্বারা ভগবৎ ভজন করা যায়। সাধকগণ এজন্য প্রথমে ভক্তি বৈধী এবং অহেতুকী, এই ভাগ করিয়াছেন। বৈধী ভক্তি চারি প্রকারে আত্মায় গ্রহণ করে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী. জ্ঞানী। আর্ত্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ, যখন আমাদের প্রাণে অবিশ্বাস, অভক্তি, শুষ্কতা, পাপ তাপ প্রভৃতি আমাকে কাতর করিয়া ফেলিতেছে। ইহাই আর্ত্তের প্রকৃত অর্থ ও অবস্থা। ভগবানের নাম লইতেও বিরক্তি এবং অবিশ্বাস; এই সময়ে করযোড়ে নাম লইতে চেষ্টা করাই ভজন। শুষ্কতা অবিশ্বাসে নাম লইলেও তাহা বৃথা হয় না। ঔষধ তিক্ত; উহা বিরক্তির সহিত সেবন করিলেও রোগ শান্তি হয়।

নামে পাতকী উদ্ধার হয়, ইহা বস্তুগুণ। বস্তুগুণ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না। অগ্নিতে হাত দিলেই পুড়িবে। যাঁহার একটুও ভক্তি আছে, তিনি যদি অভক্তির সহিত নাম করেন, তবে সে ভক্তি টুকুও শুকাইয়া যায়। ভক্তির সহিত নাম করিবে।

ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া চালাইতেছেন। বিধি ব্যবস্থা নিয়ম প্রণালী অব্যর্থ। প্রত্যেক পদার্থে দৃষ্টি করিলে সমস্তই অসীম বোধ হয়। যাহা সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই ব্যবস্থা আছে, নিয়ম আছে। তবে

আমরা একটু ঝড় তুফান, গ্রীষ্ম, বর্ষার আধিক্য দেখিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া বিচার করি কেন? অসন্তোষ প্রকাশ করি কেন? মূলে অবিশ্বাস। এ অবিশ্বাসের মূল কি? পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ, আত্মস্বার্থ-চিন্তা করিতে করিতে ঐ দুর্নীতি উপস্থিত হয়। এজন্য ধার্ম্মিকের একটি প্রধান লক্ষণ, তিনি প্রাণান্তেও পরনিন্দা করেন না, আত্মপ্রশংসা বিষতুল্য জ্ঞান করেন। হিংসা সে হৃদয়ে স্থান পায় না। জীবে দয়াবান্ ও ভগবানে বিশ্বাসী হইয়া সর্ব্বদা সন্তোষজনক পথে চলেন। ভগবানের কার্য্যে অবিশ্বাসী হইলেই অসন্তোষ। "হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে, তোমার সম্পদ্ বিপদ্ আমার দুই সমান।" এইরূপ ভাব ধর্ম্মজীবনের পরিচায়ক, ইহাতে সকলের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

মানুষ জ্ঞানদ্বারা সৃষ্টবস্তুর বিচার করিতে পারে। ভগবত্তত্ত্ব মানবীয় জ্ঞানের অধীন নহে। ঋষিরা জ্ঞানকে পরা ও অপরা বিদ্যা নামে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥" "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

মনুষ্য ক্ষুদ্রকীট, তার এত অভিমান যে সে আত্মজ্ঞানে ভূমা ঈশ্বরকে জানিবে, তাহা কখনই হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানে ঈশ্বরকে জানা দূরে থাক্—নিজের শরীর ছাড়া আত্মাকে জানিতে পারে না।

যে বস্তু ভালবাসি তাহার সম্বন্ধে যত ভাল কথা শুনিয়াছি তাহা বলিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা নিজের অবস্থা বলিয়া বলিলে দোষ হয়; ভগবানের বা মহতের প্রশংসাপ্রচারে দোষ নাই।

কাম শরীরের গুণের সঙ্গে মিশ্রিত থাকিলেই কাম, শরীর হইতে ভিন্ন হইলেই প্রেম। তখন আত্মার অংশ বা আত্মা। শারীরিক গুণ সহজে

ছাড়ে না। আহারে সংযম একমাত্র ব্যবস্থা। যাঁহারা বিষয়কর্ম্ম করেন, তাঁহারা এ নিয়ম পালন করিতে পারেন না। আহার স্বপাকে এবং ক্রমে কমাইয়া ফলমূলে পরিণত করিতে হয়। প্রাতঃকালে এবং সমস্ত দিন রাত্রি আসনে বসিতে অভ্যাস ও নিদ্রা কমাইবার অভ্যাস করিতে হয়। সর্ব্বদা নাম করিতে না পারিলেও কেবল আসনে বসিয়া থাকাতেই উপকার হয়। গ্রাম্য আলাপত্যাগ, নিম্নদৃষ্টি-প্রভৃতি দ্বারা শারীরিক গুণের পরিবর্ত্তন হইলে কাম নিস্তেজ হয়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

উপদেশ।

(২)

শাক্যসিংহ আমাদের দেশের কত লোককে উদ্ধার করিয়াছেন, কত অন্ধকে চক্ষু দিয়াছেন, কত মৃত মনুষ্যকে জীবন দিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেকেই মনে করেন, তিনি পরমেশ্বরের চিন্তা করিতেন না, তাঁহার ধর্ম্ম—নাস্তিক ধর্ম্ম, মাত্র নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থসকল পাঠ করিলে দেখা যায়, বুদ্ধ একজন যথার্থ বিশ্বাসী ছিলেন। ললিত-বিস্তর-নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধ যখন সফলকাম হন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রহ্মে স্থিতি করিতেছি"। মানব এইরূপ ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া শান্তিলাভ না করিলে জরা, মৃত্যু, শোকের হস্ত হইতে রক্ষা পায় না। সত্য কথা বল, পরোপকার কর, এ সকল শুষ্ক নীতির কথাতে বক্তা শ্রোতা উভয়ের ভার ভার বোধ হয়, শান্তিলাভ হয় না॥ তাই শুষ্ক নীতিতে কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম কথায় হয় না, ধর্ম্ম প্রাণের অবস্থা; প্রাণে সেই অবস্থা লাভ করিলে ধর্ম্ম লাভ হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের কথা যতই যে প্রকারে বল না কেন, যখন সেই ধর্ম্মে বহুসংখ্যক নরনারীর প্রাণে শান্তি প্রদান করিয়াছিল, তখন তাহাতে পরমেশ্বরের ভাব নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না। পুরাণে শাক্যসিংহের নাম গয়াসুর। গয়াসুর তপস্যাবলে এমন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে তিনি যে দিকে দৃষ্টি করিতেন, সেই দিকই পবিত্র হইয়া যাইত, একথা পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুরা বুদ্ধদেবের ঘোরতর বিরোধী হইয়াও পরিশেষে তাঁহাকে দশাবতার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন; কেননা, বুদ্ধদেব ধর্ম্মসম্বন্ধে কেবল উপদেশ দিতেন না, তিনি মনুষ্যের প্রাণে

এমন এক শান্তি দেখাইয়া দিতেন যে, তাহাতে মনুষ্য শান্তি লাভ করিত। মনুষ্যকে আমি উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহাতে হয়ত তাহারা দুই চারি দিন উপকার প্রাপ্ত হইল; পরে প্রবৃত্তির অত্যাচারে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। এরূপ উপদেশ কে চিরদিন গ্রহণ করিয়া থাকে? যাহাতে প্রাণে রিপুসকল শান্ত হয়, আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাই লোকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

শাক্যসিংহ রাজপুত্র, তাঁহার ঐশ্বর্য্যভোগের সীমা ছিল না। তাহাতে কি হইবে? তিনি দেখিলেন পৃথিবীর নরনারী রোগে, জরামৃত্যুতে জর্জ্জরিত হইতেছে; ইহাতে তাঁহার প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। কিসে মানবের কষ্ট দূর হয়, কিসে শান্তি লাভ হয়, তজ্জন্য তিনি স্ত্রীপুত্র, রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি এজন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া দেখিলেন, তখনও প্রাণে পাপের মূলসমূহ চলিয়া যায় নাই, শান্তি আসে নাই; এ অবস্থা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন কঠোর তপস্যাতে শান্তি নাই বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, ভণ্ড প্রতারক বলিয়া গালি দিতে লাগিল। তাঁহার পক্ষে কি ভয়ানক পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল! এক দিকে ছয় বৎসরের পরিশ্রম পণ্ড হইয়া গেল, আর এক দিকে যাঁহারা সেবা শুশ্রূষা করিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, তাঁহারাও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; মানবের পক্ষে ইহা সামান্য উৎকট অবস্থা নহে। কিন্তু বুদ্ধ সেই প্রকারের লোক ছিলেন না। তিনি ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে আত্মন্, দেখ শান্তি পাইলে কি না? যখন শান্তি প্রাপ্ত হও নাই, তখন ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক, কিছুতেই তাঁহার অনুসন্ধান ছাড়িবে না"। পুনরায় এই প্রকার উৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত শান্তিলাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। "যদি শান্তি পাই তবেই উঠিব, নতুবা

এই শেষ উপবেশন," এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি বোধিদ্রুমতলে বসিয়া গেলেন। যখন প্রাণের টান এক দিকে চলিল, তাঁহার আত্মাতে যে শক্তি লুক্কায়িত ছিল তাহা জাগ্রত হইল। প্রাণ এমন আকর্ষণে পড়িয়া গেল, কিছুতেই আর তাঁহার প্রাণকে ফিরাইতে পারিল না। কাম তাহার সহচরদিগকে সঙ্গে করিয়া কতই পরীক্ষা করিল, কতই প্রলোভন দেখাইল, কিছুতেই বুদ্ধের প্রাণকে বিচলিত করিতে পারিল না। সেই স্রোত—যে স্রোত বুদ্ধের প্রাণে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার সম্মুখে হিমালয় কেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ফেলিয়া দাও, সে সমস্ত তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এই আকর্ষণে পড়িয়া যখন বুদ্ধের প্রাণের শক্তি জাগ্রত হইল, তখন তিনি প্রাণের মধ্যে আর এক জগৎ দেখিতে পাইলেন, প্রাণ বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা লাভ করিল। তিনি দেখিলেন প্রাণের ভিতরে আর এক চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকময় বোধ হইতেছে, "বোধিদ্রুম" উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে ; যাহা দেখিতেছেন, সব উজ্জ্বল বোধ হইতেছে, প্রাণে আনন্দ নৃত্য করিতেছে, শান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, "আমি ব্রহ্মেতে স্থিতি করিতেছি"। কি উপায়ে শান্তি লাভ হয়, এত দিনে শাক্যসিংহ সেই পথ বাহির করিলেন। আমাদের উপাসনাতে, গির্জাতে, মন্দিরে, মসজিদে সেই ধর্ম্মের টানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই জন্যই নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ই, সেই এক দেবতার নিকট যাইতে চায় ; কিন্তু সেই আকর্ষণ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কতক স্ত্রীপুত্রেতে, কতক বৃত্তিবিভবে, কতক যশ মানেতে চলিয়া গিয়াছে। এই জন্যই এক দিকে আকর্ষণ হইতেছে না। কখনও কখনও ভগবানের কথা স্বপ্নের মত এক এক বার মনে হয়, কখনও মনে হয় ঈশ্বর আছেন, আবার মনে হয়, না, নাই। এ অবস্থায় কি তাঁহার উপাসনা হয় ? কখনও উপাসনাদি করিয়া প্রাণে একটুকু আনন্দ পাইলাম, প্রবৃত্তিসকল দুই চারি দিনের জন্য সংযত হইল,

আবার যে দুরবস্থা সেই দুরবস্থা; আর সে আনন্দ নাই, আর সে শান্তভাব নাই; প্রবৃত্তি সকল স্বীয় স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। যে উপাসনায় স্থায়িভাব হয় না, তাহাকে উপাসনা বলে না। যথার্থ উপাসনাতে নিত্য একই ভাব হয়।

পরমেশ্বর বাহ্যজগতের যেরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, অন্তর্জগতেও সেই প্রকার বিধিই সংস্থাপন করিয়াছেন। যেরূপ চারি পাঁচটি ঝরণার জল একত্র হইলে অধিকতর বেগ লাভ করে এবং তখনই উহা নদীতে পরিণত হইয়া বেগে সমুদ্রের দিকে চলিয়া যায়, কিন্তু এক একটী ঝরণার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্রোতে তাদৃক্ নদীর উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ মানুষের প্রাণের নানাদিকের আকর্ষণ যখন একীভূত হইয়া যায়, তখনই তাহা অধিকতর বেগশালী হইয়া এক পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় এবং যথার্থ শান্তি লাভ হয়। শাক্যসিংহও ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়া যখন এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেখিলেন যে, প্রাণের আকর্ষণ নানা দিকে রহিয়াছে, তখন তাহার একটি একটি করিয় দূর করিয়া দিতে লাগিলেন, আর প্রাণে অধিকতর বেগ আসিতে লাগিল। সেই বেগেই তাঁহার প্রাণের শক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি শান্তি লাভ করিলেন। এ জগতে সকলের জন্যই এক ব্যবস্থা। একবার যদি এই ভাব আসে যে পরমেশ্বরকে লাভ করিতেই হইবে, ইহাতে প্রাণ থাকে থাকুক, যায় যা'ক; সর্ব্বদা যখন এই অবস্থা দর্শন করেন, তখন প্রাণের যেখানে যে বন্ধন থাকে, তাহা তিনি স্বয়ং খুলিয়া দেন। "যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ। তবু যদি না ছাড়ে পাশ, তার হই দাসের দাস॥"—ইহা অতি সত্য কথা। তবে কি পরমেশ্বর অমঙ্গল করিয়া থাকেন? তাহা নহে। যে সকল সুখ তাঁহার দিকে যাইতে বাধা দিতেছিল, তাহা তিনি তুলিয়া লইয়া যথার্থ মঙ্গলই করিয়া থাকেন। এইরূপে যখন প্রাণের গ্রন্থিসকল খুলিয়া যায়, তখন আত্ম-শক্তি জাগ্রত হয়। সেই শক্তির স্রোত আর কেহ রোধ

করিতে পারে না। যদি একবার প্রাণের সেই স্বাভাবিক স্রোত, যাহা অনন্ত-সাগরে গমন করিবে, নানাদিক হইতে একমুখীন করিতে পারি, তবে আর কোন অভাব থাকিতে পারে না। যত দিন অন্য বস্তুতে আকর্ষণ থাকে ততদিন সেইটি হয় না। আবার যখন ভগবানের দিকে টান হয়, তখন "সকল বস্তুই তাঁহার" এই বলিয়া, আমার প্রিয়তমের এ সকল পদার্থ এই বলিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের প্রতি প্রাণের টান উপস্থিত হয়। তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থকে যেরূপ ভালবাসা যায়, আগে কি তেমন ধারা হয়? আমার প্রিয়তমের বস্তু বলিয়া যে ভালবাসা, তাহার কি তুলনা আছে? এ সংসারে যদি কেহ প্রণয়ীর পত্র পায় তাহাকে কত চুম্বন করে, কত আদরে সোণার কৌটায় রাখিয়া দেয়—উহাকে ইষ্ট কবচ করিয়া রাখিলেও যথোচিত আদর করা হইল না মনে করে।

এই যে বৃক্ষ পত্র, এই যে চন্দ্র তারা, এ সকল তাঁহার হাতের অক্ষর, আমার প্রিয়তমের অক্ষর,—ইহা বুঝিলে এদের আমি কোথায় রাখিয়া দিব? না,— আমি "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" রাখিয়া দিব।

মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলি, কিন্তু তাঁহার প্রতি যদি প্রাণের আকর্ষণ না হয়, তবে সকলই মিথ্যা। এইভাবে আমাদের কত কালই নষ্ট হইয়া গেল। ছয় বৎসরের তপস্যাতে শাক্যসিংহ যেমন প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তেমনি প্রত্যেকেই আপনার আত্মাকে জিজ্ঞাসা করুন, "হে প্রাণ, তাঁহার প্রতি কি তোমার টান হইয়াছে"? যতদিন প্রাণে সেই স্বাভাবিক টান না আসে ততদিন ধর্ম্ম হইবে না, এবং যে শান্তি পাইলে রোগ, মৃত্যু, জরা অতিক্রম করা যায়, সে শান্তি মিলিবে না। সেই টান, সেই স্রোত আমি নিজে আনিতে পারি না; যদি একবার প্রাণের সহিত বলিতে পারি, "পরমেশ্বর, এই দুর্ব্বল শক্তিতে কিছু হইবে না, তুমি আমার একমাত্র সর্ব্বস্ব, আমি তোমাকেই চাই," যদি প্রাণ হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হয়, দেখিবে

একটি একটি করিয়া তোমার প্রাণের গ্রন্থিগুলি খুলিয়া যাইবে, প্রাণে অনন্ত স্রোত খেলিতে থাকিবে।

নদীর জল যেরূপ একবার সাগরে যাইতেছে, আবার তথা হইতে মেঘরূপে আসিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছে আমরাও সেই প্রকার এই স্রোতবেগে একবার পরমেশ্বরেতে ডুবিব, আবার পৃথিবীর নরনারীকে হৃদয় ঢালিয়া দিব। আমি কেবল সাগরে যাইব না; সাগরে যাইব, আবার মেঘ হইয়া পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে পড়িব। প্রকৃত ব্রহ্মচক্র, যোগচক্র এইরূপে ঘুরিতেছে। এই টান চাই, এই স্রোত চাই; মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিলে চলিবে না। আমি কোন্ দেবতার পূজক, কাম কি ক্রোধের? কোন্ বাসনা আমার দেবতা,—পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। শাক্যসিংহের তত্ত্ব সারতত্ত্ব; এই পথ সকলের পথ। শাক্যসিংহ যেমন বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া পরা শান্তি পাইলাম", এইরূপ বলিতে পারিলে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হইল। আমি আপনাদিগকে উপদেশ দিতেছি না, নিজকে নিজে বলিতেছি; অনেক দিন প্রচারক ধার্ম্মিক বলিয়া অহঙ্কার ছিল, আপনারা যদি আমার বন্ধু হন, আমার সুখ্যাতি করিবেন না, আমাকে তিরস্কার করুন। এখনও নিন্দা প্রশংসার অধীন রহিয়াছি, আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কৃপাক'রে অবস্থা ক'রে দেওয়া; তাহাতে এসকল বস্তুর মূল্য থাকেনা। তপস্যার যে একটা ফল আছে, তাহা স্বীকার্য্য। তপস্যা কিছুদিন কর্ত্তব্য, পথে না চলিলে কেহ চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া যায়, স্থানে গেলাম, কিন্তু পথের সংবাদ কিছুই জানিলাম না। এজন্য তপস্যা-অনুষ্ঠান। বিশ্বামিত্র বহু তপস্যা করিয়াও রিপুজয় করিতে পারিলেন না, নিস্তব্ধ রহিলেন। যখন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন তিনি রিপুর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। আহার কমিয়ে কমিয়ে কেবল ফলমূলে আনিলে

শারীরিক উত্তেজনা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। এ উপায় যিনি করেন তিনিই উপকার পান।

ধর্ম্মসাধনা দুই প্রকার। যাঁরা প্রবৃত্তির অধীন, তাঁহাদের প্রবৃত্তিধর্ম্মকে শক্তিধর্ম্ম নাম দিয়াছেন। নিবৃত্তিধর্ম্মকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম নাম দিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

ভগবান্ প্রথমে বামন অবতার হইয়া বলিনামে মানবাত্মারূপ অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। মনুষ্য সংসারে ধর্ম্ম করিতে বসিয়া অত্যন্ত অভিমান প্রকাশ করে। আমি দাতা, আমি জ্ঞানী, আমি ভক্ত, আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দেবগণের রাজা। মনুষ্যের এই ধর্ম্মাভিমান দেখিয়া পরমেশ্বর বামন হইয়া আত্মার আত্মা হইয়া মনুষ্যের নিকট ত্রিপদ প্রার্থনা করেন। ত্রিপদ শুনিতে সামান্য; কিন্তু উহাই সর্ব্বস্ব। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; ভগবান এই ত্রিপদ অধিকার করিলে তখন বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া জীবের সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বামনদেব বলির দ্বারে দ্বারী হইয়া পাতালে ছিলেন। এরূপে যে ব্যক্তি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান্ তাঁহার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, তখন জীবকে আর ভাবিতে হয় না।

কবির ও গুরু নানকের ধর্ম্মে প্রভেদ নাই। উত্তরপশ্চিমে মেথর, ডোম, চামার, এই সমস্ত জাতি কবিরপন্থী। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে তাঁহাদের পদধূলি না লইয়া থাকা যায় না। গুরু নানক ক্ষত্রিয় ছিলেন, এজন্য তাঁহার মত অবাধে সকলের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

প্রঃ—ভগবানে অচলা ভক্তি কিসে হয়? কিরূপে তাঁহাকে মন সমর্পণ করিতে পারা যায়? উঃ—এ সম্বন্ধে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে, তাহা দেখা প্রয়োজন। উপনিষদে বিশেষ বিশেষ উপায় বলিয়াছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এ বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থ এবং চৈতন্যভাগবত,

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিলে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-অনুসারে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ করিলে অনেক জন্মের পুন্যফলে ভগবানের ভজনে আন্তরিক ব্যাকুলতা জন্মে। সেই সময় সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপদেশমত অকপটে সাধন করিলে ভগবান্‌ কৃপা করিয়া সাধককে দর্শন দেন। মানুষ প্রেমময়কে লাভ করিয়া আর কখনও তাঁহার চরণ ছাড়া হইতে পারে না।

ঋষিগণ বলিয়াছেন—প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বভূতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব। দ্বিতীয় অবস্থা যোগ, আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষলাভ। তৃতীয় ভগবৎপ্রসঙ্গ পূজা, অর্চ্চনা। এই অবস্থায় তাঁহার রূপদর্শন হয়। সেইরূপ সৎ, চিৎ, আনন্দ। ইহা সেরূপ পাঞ্চভৌতিক নহে।

প্রথমে যদি মনে হয়, আমি ধার্ম্মিক, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত এবং যখন এইরূপ অভিমানে স্ফীত হইয়া সম্মান পাইতে লোভ করি ও চারিদিক হইতে লোকে সম্মান দান করে, তখন যদি অন্তর অসাধু, ধর্ম্মহীন ও অজ্ঞানান্ধ হয়, তবে পূর্ব্বসম্মান রাখিতে গিয়া মানুষ ক্রমেই কপট হইয়া ঘোর পাপের মধ্যে ডুবিতে থাকে। এজন্য লোকের সমক্ষে যতই হীন মলিনরূপে পারিচিত হই ততই মঙ্গল। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে ঋষিগণ ৪টি উপায় স্থির করিয়াছেন। ১ম—স্বাধ্যায়—ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, নামজপ। ২য়—সৎসঙ্গ। ৩য়—আত্মপরীক্ষা—যদি আত্মপ্রশংসা ভাল লাগে, পরনিন্দায় আমোদ হয়, তবে আপনাকে নরকগামী ও ধর্ম্মভ্রষ্ট মনে করিতে হইবে। ৪র্থ—দান। দান শব্দে দয়া বলিয়াছেন—কাহার প্রাণে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া। বৃক্ষ, লতা, পশু পক্ষী, মনুষ্য, সর্ব্বজীবে দয়া কর্ত্তব্য। স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ, বিচার, দান প্রতিদিন সাধন করিতে হইবে। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে তপস্যা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করিতে অভ্যাস করা প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন। এই উপায়ে সহজে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইবে।

কীর্ত্তনে তিন প্রকার ভাব হয় ;—সত্ত্বভাবে উপস্থিত লোকে উপকৃত হয়। রজোভাবে অন্যলোকে কখনও উপকার, কখনও অপকার পায়, এজন্য সম্বরণ করিবে। তমোভাবে উপস্থিত লোকদিগের উৎপাত বোধ হয়; কারণ, তমোগুণের নৃত্য অধিকাংশ বেতালা লম্ফ ঝম্ফ হয়। নৃত্যকারীর পা লাগিয়া অনেকে খোঁড়া হয়, ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হয় ; বালকগণ ভয় পাইয়া চীৎকার করে।

দলে থাকিলে বা সকল দলে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয় না। অবিরত ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণ ভগবানের অধীন হইয়া সত্যকে অকপটে গ্রহণ করিতে হয়। সংসারে যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায় তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। লোকনিন্দা, লোকপ্রশংসা অগ্রাহ্য করিতে হয়।

শাস্ত্র, সদাচার, এই উভয় মিলাইয়া চলিলে বিঘ্ন হয় না। যদি সর্ব্বদা নিজের অন্তর বিচার করা যায়, আত্মদোষগুলিতে হৃদয় মলিন হইয়া ভগবৎ-সহবাসের ব্যাঘাত হইতেছে, ইহা দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা হয়।

মানুষের সঙ্গে সকল প্রাণীর সদ্ভাব হয়। আদর, যত্ন ও দয়াতেই সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই আদর যত্নে বৃদ্ধি হয়।

গ্রাম্য কথা কাহাকে বলে? যাহাতে পরনিন্দা হইতে পারে, পরপীড়া হইতে পারে, বিষয়ে আসক্তি জন্মিতে পারে।

অভিমান অনেক টাকা থাকিলে হয়। এ অভিমান সহজে নষ্ট করা যায় ; কিন্তু আর এক প্রকার অভিমান ঠিক বিপরীত। নির্ধন দরিদ্র মনে করে যে, ধনী আমাকে ঘৃণা করে, অতএব আমিও উহাকে ঘৃণা করিব, নতুবা আমার নীচতা প্রকাশ পাইবে। মূর্খ বিদ্বানকে অভিমান করেন। পাপী সংসারাসক্ত মানুষ ধার্ম্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীকে অভিমান করেন।

এটী সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। রাজা জনকের নিকট অনেক ঋষি তপস্বী গিয়া ঐরূপ অভিমান প্রকাশ করিতেন।

যাঁহার যেরূপ ভজন তিনি তাহা নিষ্ঠাপূর্ব্বক করিবেন। প্রত্যেক সাধক আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন। ইহা শিববাক্য।

প্রঃ—দুশ্চরিত্র নেশাখোর লোককে কি দান করা উচিত?

উঃ—যে নেশাখোর, সে সেই নেশা না খাইলে থাকিতে পারে না, অসহ্য যন্ত্রণা হয়; যদি কেহ কিছু না দেয় তবে চুরি করে।

একজন সন্ন্যাসী আফিং মদ দুই নেশা করেন। তিন দিন আফিং মদ নাই। বনের মধ্যে তালের খুঁটি, তাহাতে আসনের আঘাত করিতেন, আর বলিতেন, বেটি, তোর চুলের মুঠি ধরিয়া মারিব, আমাকে এসব অভ্যাস করাইয়া এখনও দাও না কেন? এমন সময় পুলিশ আফিং গাঁজা সহ এক জনকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ পুলিশের বাহ্যের বেগ হওয়াতে সে বাহ্যে গেল। ঐ লোকটা দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, সাধু, এই আফিং গাঁজা লও। এই বলিয়া সে দূরে ফেলিয়া গেল, তখন সন্ন্যাসী বলিল, বেটি, মারের ভয়ে দিলি?

তীর্থভ্রমণে সৎসঙ্গ দ্বারা সব ঠিক হয়। বামাচারীর প্রণালী বড় সূক্ষ্ম, তাহা অবগত হইয়া সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

৺কাশীধামে একজন পরমহংস ছিলেন। একদিন তাঁহার মনে হইল যে কাশীতে কেহ উপবাসী থাকে না। অন্নপূর্ণা সকলকে আহার দেন। ইহা মনে হইবামাত্র কাশীর একটি ক্ষুদ্র গলিতে আসিয়া বসিলেন। সেখান দিয়া কেহ গমনাগমন করে না। একদিন, দুদিন, তিনদিন চলিয়া গেল। ক্ষুধায় কাতর হইয়া মনে করিলেন তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? তখনই মনে হইল —শাস্ত্র মিথ্যা নহে, অন্নপূর্ণা আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু অন্নপূর্ণা না দিলে খাব না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

চতুর্থ দিনে কাশীকলেজের একজন অধ্যাপক সেই ব্রাহ্মণকে মৃতপ্রায় দেখিয়া মনে করিলেন, 'জীবনে কখনও এ গলিতে আসি নাই, আজ আসিলাম কেন ? তবে অন্নপূর্ণা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন—এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "অন্নপূর্ণামায়ী হাম্‌কো ভেজা আপ্‌ আইয়ে" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণকে স্বীয় বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কিছুকাল সেই স্থানে থাকিয়া শিবপূজা করিতে করিতে মহাদেবের কৃপালাভ করিলেন। তিনি একজন অতি সুপণ্ডিত পরমহংস। এই নির্ভর পরীক্ষা করিলে মানুষ পরাস্ত হয়। ভগবৎকৃপায় বিশ্বাসী হইয়া ঘটনাক্রমে নির্ভর করিলে হাতে হাতে ফল।

একজন ব্রাহ্ম সাধনগ্রহণেচ্ছুকের প্রতি—ধর্ম্মসাধন কোন প্রকার কল কৌশল নহে যে, তদনুসারে কার্য্য করিলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। ধর্ম্মসাধনের জন্য জগতে নানা প্রকার প্রণালী আছে। সেই অসংখ্য প্রণালীর একটি মাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ধর্ম্মলাভ করিতে যত্ন করিয়া থাকি। এ প্রণালীতে সাধন করিলে কেহ বা শীঘ্র, কেহ বা বিলম্বে ফল লাভ করিয়া থাকেন। অনেকে বিলম্ব দেখিয়া, কেহ কেহ নিরাশ হইয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রণালী মতে কার্য্য করেন।

ভগবৎকৃপা ভিন্ন কোন প্রণালীর দ্বারা সহজে কিছু হয় না। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী ছাড়িয়া যখন আর একটী পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন হঠাৎ কিছু করা ভাল নহে। আমাদের কার্য্যকলাপ ভাল করিয়া আলোচনা করুন, পরীক্ষা করুন, লোকের মুখে কিছু শ্রবণ করিয়া হঠাৎ তাহাতে প্রবেশ করা উচিত নহে।

প্রদীপ যদি প্রজ্বলিত থাকে তাহা হইতে সহস্র প্রদীপ জ্বালা যায়। কেবল তৈল, সলিতা, তৈলাধার এ সমস্ত আছে, কিন্তু অগ্নি না জ্বলিলে একটি প্রদীপও জ্বলে না। অগ্নি সর্ব্বত্র, ইহা বলিলে দীপ জ্বলে না। যে উপায় দ্বারা জ্বলে, তাহা না করিলে কিছুতেই দীপ জ্বলে না। শক্তিও সেইরূপ।

যে দেশে দাতাকর্ণ, স্ত্রী-পুরুষে সন্তান কাটিয়া অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন, সেই দেশের অতিথি সেবা ভুলিলে চলিবে কেন? অতিথির যাহা ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন তাহা দিতেই হইবে।

অহিংসাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ যিনি ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার ধর্ম্ম অহিংসা। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রাজ্যশাসন জন্য মারা মারী, কাটা কাটি করিয়া বহু জন্ম ঘুরিতে ঘুরিতে যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে তাহার ঐ অবস্থা। মনুষ্যত্ব যেমন উন্নত হইবে, তদ্রূপ তাহার কার্য্য সাধারণ মনুষ্য হইতে ভিন্ন হইবে।

অন্তঃকরণ হইতে হিংসা নষ্ট হইলে, যদি ছারপোকা, মশা, পিপীড়াকে আঘাত না করে, বাস্তবিক সরল মনে তাহাদিগকে দয়া করে তবে হাজার হাজার ছারপোকা প্রভৃতির মধ্যে থাকিলেও তাহারা দংশন করিবে না। মনে একটু হিংসা থাকিলে দংশন করিবে।

সাধুগণ অরণ্যে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর মধ্যে থাকেন, তাহার কোন মন্ত্র তন্ত্র কি অন্য বুজরুকী নাই; কেবল অহিংসাই কারণ। মনে কিছুমাত্র হিংসা না থাকিলে ব্যাঘ্রাদিও আপন হইয়া যায়।

কৃপা অনেক উপরের কথা। মানুষের মনুষ্যত্বকে মানবীয় ধর্ম্ম বলে। যেমন জলের ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির উষ্ণত্ব ইত্যাদি। প্রত্যেক মনুষ্য সাধন করিলে মানবীয় ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া দেবত্ব লাভ করে। তাহাতে কৃপা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি অর্থাৎ মনুষ্যত্ব যদি নষ্ট হয়, তাহা সাধু উপায় দ্বারা পুনরায় লাভ হয়। এজন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত কহে। শরীরের মধ্যে চক্ষুও একটী ইন্দ্রিয়, চক্ষুর ধর্ম্ম দর্শন। যদি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয় তবে ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্য লাভ করিবে। এইরূপ মনুষ্য মধ্যে অনেক গুণ আছে; তন্মধ্যে দয়া প্রধান গুণ। এই দয়া যথার্থ পরিচালিত হইলে, অহিংসা মানুষের স্বাভাবিক কার্য্য হইবে। এই

মনুষ্যত্ব হইতে উন্নত হইলে দেবত্ব। দেবত্ব হইতে উন্নত হইলে জীবাত্মা পরমেশ্বরের অসীম সত্তায় প্রবেশ করিয়া লীলারস সম্ভোগ করেন।

কলিকাতাতে একটী সাধনের লোক, একখান ফ্লানেলের চাদর আনিয়া গোস্বামী মহাশয়কে দিবার জন্য উপস্থিত করিল। গোস্বামী মহাশয় চাদর লইয়া গায়ে দিলেন; এমন সময়ে আর দুটী সাধনের লোক বলিলেন যে, আপনি আর কতদিন এই চাদর রাখিবেন? কাহাকেও দিয়া ফেলিবেন ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় চাদর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও লিখিলেন—

সম্পূর্ণ সত্বত্যাগ দান। যাহাকে দিবে, সে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে দাতা কিছু বলিতে পারেন না; কারণ, তখন সে বস্তু তাঁহার নহে। দাতা যদি কিছুমাত্র মনে করেন যে, আমার অভিপ্রায় মতে আমার দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, তবে ইহাকে দান বলে না। ইহাকে গচ্ছিত রাখা বলে। শাস্ত্রে ইহাকে ন্যস্ত বস্তু বলিয়াছেন। ন্যস্ত বস্তু দান করা ও গ্রহণ করা উভয়ই পাপ। তোমাদের মনে এ ভাব আছে। আমি যাচ্ঞা করি না। যদি আমার কোন ব্যবহারে যাচ্ঞা করা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা আমার অপরাধ সন্দেহ নাই। আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহি; সুতরাং আমার ক্রটি থাকা অসম্ভব নয়। যখনই ক্রটি দেখিবে, তখনই বন্ধুভাবে বলিবে, মনে মনে রাখিও না। যিনি আমার দোষ দেখাইয়া দেন, তিনি আমার পরম বন্ধু। আমি তাঁহাকে ভালবাসি। হাজার রসগোল্লা দাও, কাপড় দাও, তাহাতে ভবি ভোলে না। কেবল দোষ দেখালে ভোলে। ভগবৎকৃপায় তোমাদের মঙ্গল হউক।

একজন প্রার্থনা করিল, "প্রভো! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। আমার বলিতে যেন কিছুই না থাকে, সবই তোমার হউক।" পরমেশ্বর উত্তর করিলেন, "হে মানব! এমন কথা বলিও না, আমাকে যৎকিঞ্চিৎ দাও,

অবশিষ্ট সকল তোমার থাক্। তুমি জান না যে কি কথা বলিতেছ।" মানব কাতর হইয়া বলিল "প্রভো, তাহা হইবে না। আমার যেন কিছু না থাকে, সব তোমার হউক।" ভগবান্ তাহার বাড়ী ঘর আত্মীয় বন্ধু সমস্ত নষ্ট করিয়া যখন পুত্রটীকে লইতে যান, তখন সে কাঁদিয়া বলিল, "প্রভো, কি করিতেছ? অমি যে আর সহ্য করিতে পারি না।" তখন ভগবান্ তাহার সমস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, এই লও, আগেই বলিয়াছিলাম—তোমার কর্ম্ম নহে।

ভগবান্ যখন যে ভাবে রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। আমার নিজের পছন্দ করিবার কিছুই নাই। "কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়,"—আমাকে সেরূপ কর। তুমি ত জীবনের আধার।

হরিনামে প্রেমলাভের ক্রম।—প্রথম পাপবোধ, দ্বিতীয় পাপকর্ম্মে অনুতাপ, তৃতীয় পাপে অপ্রবৃত্তি, চতুর্থ—কুসঙ্গে ঘৃণা, পঞ্চম—সাধুসঙ্গে অনুরাগ, ষষ্ঠ—নামে রুচি ও গ্রাম্যকথায় অরুচি, সপ্তম—ভাবোদয়, অষ্টম—প্রেম।

প্রঃ—মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম নূতন, না, হিন্দুশাস্ত্রে তাহা আছে?

উঃ—শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাব প্রচার করিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। অতি পূর্ব্বে সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার—এই চারিজন ব্রহ্মার মানস পুত্র। সেই হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার ও সর্ব্বদা ভগবানের নামগান হইতেছে।

ঐ চারিজন প্রচার করিয়া যান; এই জন্য তাঁহাদিগকেই আদি বৈষ্ণব বলে। সনৎকুমারসংহিতাই অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব-উপাসনা অদ্যাপি প্রচলিত। কালের গতিতে এই বৈষ্ণবভাব ম্লান হইয়া যাগ যজ্ঞ, ক্রিয়া কাণ্ড প্রচলিত হয়। ক্রমে এত দূর মলিন হইয়াছিল যে, মহাপ্রভু যখন জন্মগ্রহণ করেন, মনসা পূজা, বিষহরির গান এবং দুই একটী স্তোত্র

মাত্রই ধর্ম্ম ছিল। এসময়ে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করাতে লোকের নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

মহাপ্রভু যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ বৈষ্ণবদের মধ্যে তাহা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ৫।৭ জন যাঁহারা আছেন দেখা যায়, তাঁহারা অধিক সময় নির্জ্জনে ধ্যান করিয়া অতিবাহিত করেন; সময়ে সময়ে একত্র হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াও কৃতার্থ হন।

মতান্তরে বিশেষ হৃদয়বন্ধুর সহিত বিরোধ হয়। বন্ধু শত্রু হন। লোকে বিরোধী সত্যকে ঘৃণিত করিবার জন্য সেই মতের লোকদিগকে মিথ্যা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া চরিত্রে কলঙ্ক দেয়। এজন্য খৃষ্ট সমাজে কত নরহত্যা হইয়াছে। * * এই মতের ধর্ম্ম বিদায় না লইলে সত্য ধর্ম্মের শোভা বিস্তার হইবে না।

চক্র শরীরে ছয়টী। ইহার সঙ্গে বাহিরের শক্তির যোগ। স্থূলশরীরে, সূক্ষ্মশরীরে, কারণশরীরে, তাহার পর আত্মাতে। গ্রন্থ পাঠ করিয়া, উপদেশ শুনিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝা যায় না।

লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে তাহাতে ক্ষতি হয় না, উপকার হয়। তবে নিজের বিবেক মতে না চলিয়া যদি মানুষের মতে ও আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করি তাহাতে স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া ক্ষতি হয়—ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া নিজের বিবেক মতে চলিলে বিশেষ উপকার হয়। একটী নিয়ম স্থির করিয়া চলিলে পীড়া অল্প হয়।

ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত, এই দুইখানি গ্রন্থ উপনিষদের ভাষ্য। গীতা এবং ভাগবতের প্রণালীতে সাধন করিলে ঋষিদের প্রাণের কথা জানা যায়।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিমালয়ে বৌদ্ধ লামাদিগের মঠ আছে। আমি সেখানে গিয়া কিছু দিন ছিলাম। তাঁহাদিগের সাধনপ্রণালী দেখিয়া আনন্দ

হইল। শাক্যসিংহ প্রথম সাধনে ঐ জোয়ার ভাটা ভোগ করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি পূর্ব্ব শিক্ষা যাহা আত্মার অঙ্গ হয় নাই, তাহা ভুলিতে চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন এক একটী সত্য লাভ হইতে লাগিল এবং তাহাই আত্মায় অনুস্যূত হইয়া তাঁহাকে বুদ্ধত্ব আলিঙ্গন করিল।

এখনও বৌদ্ধলামাগণ ঐ প্রণালীর অনুসরণ করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ যদি দেখিতে চান, তবে পালিভাষা শিক্ষা করিয়া হিমালয়ে বৌদ্ধ মঠে গিয়া অধ্যয়ন করুন। অনুবাদে অনেক ভুল; লামাগুরুদিগের আচার ব্যবহার ও তাঁহাদের সাধনপ্রণালী না দেখিলে বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝা যায় না। উহাই একমাত্র পন্থা।

আমিও আপনার ন্যায় কষ্ট পাইয়া অনেক পাহাড় পর্ব্বত ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক সাধনপ্রণালী দেখিয়াছি, কিছুতেই প্রাণের বস্তু পাই নাই। অবশেষে ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে এই পথ দেখাইয়া শান্তিদান করিয়াছেন।

ব্রহ্মের দুইটি ভাব। নিত্য এবং লীলা। নিত্যসাধন গীতা দ্বারা হয়, লীলাসাধন ভাগবতদ্বারা হয়।

প্রঃ—কৃষ্ণ, কালী, শিব, পার্ব্বতী, রাম ইত্যাদির কোন আধ্যাত্মিক অর্থ আছে কি?

উঃ—উহার আধ্যাত্মিক অর্থ নাই। সাধনের সময় তিনটি ভাব প্রকাশিত হয়। ১ম—ব্রহ্মভাব; সাধক দেখেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময়। উহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। ২য়—যোগ। ইহা হঠযোগ নয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ। সাধক দেখেন তাঁহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির অধীন। কেবল শরীর নহে, আত্মায় সমস্ত তৃপ্তি, স্বাদ অনুভূত হইতেছে। কিন্তু এ স্পর্শ, ঘ্রাণ স্বাদ অব্যক্ত। কেবল ব্রহ্মের স্বাদ অব্যক্ত নয়। চিনি ঘি খাইয়া কেহ কি ব্যক্তরূপে বর্ণনা করিতে

পারে? গর্ভবতী নারী যেমন গর্ভস্থ সন্তান অনুভব করেন, সেইরূপ। ৩য়—ভগবদ্ভাব অর্থাৎ লীলা। তখন সাধকের নিকট ব্রহ্ম অনন্তরূপে দেখা দেন।

কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ এ সমস্ত রূপ। এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য রূপ আছে। এই জগতে মানুষ যেমন ব্রহ্মের লীলার পরিচয়, সেইরূপ অন্যান্য জগতে যত ভাবে, যত রূপে ব্রহ্ম লীলা করেন, সমস্তই সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ, কলিযুগে শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই সমস্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধক এইরূপ ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, এই ত্রিবিধভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মরূপ অনন্তসাগরে ঝম্পপ্রদান করেন, তখন একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দ সাগরে আপনাকে ভুলিয়া তাঁহাতেই কখন সাঁতার দেন, কখন নিমগ্ন হন।

পূর্ব্বে ঋষিগণ যে প্রণালীতে শ্রাদ্ধ করিতেন, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে এক প্রকার ছিল; দ্বাপরে অনেক পৌরাণিক ভাব, কিন্তু তখন প্রেতলোক দর্শন করিয়া শ্রাদ্ধ হইত। কলিতে কেবল সেই প্রণালী চলিতেছে।

শরীরের প্রধান যন্ত্র জিহ্বা। জিহ্বাকে বশে রাখিলে সমস্তই বশ হয়। বিশেষতঃ জিহ্বা বশে, অজপা স্বাধীন ভাবে সর্ব্বদা সহস্রার স্পর্শ করিয়া অমৃত পান করায়। এই অমৃত আপনা হইতে ক্ষরিত হইলে আর বাক্য বন্ধ করিতে হয় না। যিনি জিহ্বা ও উপস্থ জয় করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা অন্তর্মুখে ভগবানের নাম জপ করেন, তাঁহাকে কিছুতেই বাধা দিতে পারে না। মূলকথা, শাস্ত্র ও সদাচারের অনুগত থাকিবে।

আসন ছাড়িয়া অন্যত্র গেলেই ক্ষতি। এ জন্য একস্থানে থাকাই ভাল। আসন, স্থান, দিক্, আকাশ, বৃক্ষ, জল, বায়ু এ সমস্তের সম্বন্ধ স্থির রাখিয়া

তাহাদিগকে স্বকার্য্যের সহায় করিতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়। এইগুলি ভ্রমণের দোষ। অন্যদিকে—একস্থানে থাকিতে থাকিতে যদি মায়া জন্মে, তবে ভরত রাজার ন্যায় হরিণ হইয়া পশুত্ব লাভ করিতে হয়।

দেবতা চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। এ সমস্ত দেবতা যাহারা পূজা করে তাহারা সকাম পূজা করে। তাহারা ঐ সমস্ত দেবতা ভিন্ন অন্য কিছুই পাইবে না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তৈব ভজাম্যহম্।"—যে আমাকে যেরূপে ভজনা করে আমি তাহাকে সেইভাবে প্রাপ্ত হই। উপনিষদে আছে—'নেদং যদিদমুপাসতে'; কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের যত বিষয় আছে আমি তাহা নহি। আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনোগ্রাহ্য বস্তু হইতে অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থ হইতে ভিন্ন।

বাক্য, মন, চক্ষু, কর্ণ, প্রাণ, এই সমস্তদ্বারা যাহা উপাসনা করে তাহা আমি নহি। যতদিন চক্ষুকর্ণ ইন্দ্রিয়গণ বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, ততদিন শরীর ছাড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে কিছুতেই শরীর ভুলিতে পারা যায় না। ভিতরে প্রবেশের দুইটি পথ। এক—কোনও উপায়ে একবার ভগবান্‌কে দর্শন করিলে তখন শরীরে দৃষ্টি থাকে না, সহজেই শরীর মনে থাকে না। কিন্তু এ অবস্থা সকলের হয় না। এজন্য একজনকে ভালবাসিতে হইবে—অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভালবাসা হওয়া চাই। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও কষ্ট দিব না। কেহ আমাকে প্রহার করিলে, গালি দিলে, এমন কি সর্ব্বনাশ করিলেও তাহার অমঙ্গল কামনা করিব না। এইরূপে দ্বেষ, হিংসা নষ্ট হইলে প্রাণে ভালবাসা জন্মে। সেই ভালবাসা কোন স্থানে অর্পণ করিয়া তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। এই অবস্থা হইলে সহজে ভগবান্‌কেও লাভ করা যায়।

প্রঃ—মনঃসংযম হয় না কেন?

উঃ—যাহাকে অপকারী শত্রু বলিয়া বিশ্বাস কর, মনে মনে যাহার অনিষ্ট চিন্তা কর, অকপটে তাহার সেবা কর। যাহাতে তাহার হিত হয় এরূপ আচরণ কর। হৃদয়ের অভ্যন্তরে শত্রুতা থাকিলে কিছুতেই মন স্থির হয় না। ভিতরে পচা ঘা রাখিয়া উপরে মলম দিলে সমস্ত শরীর পচিয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা করিয়া আবার এই সকল শাস্ত্র ও সদাচারের অধীন হওয়া এক দিনের কার্য্য নহে। ক্রমে ক্রমে সকলই হয়। ধৈর্য্যের সহিত কাজ করিয়া জলবিন্দুপাতেও প্রস্তরখণ্ডকে ভেদ করা যায়।

শালগ্রামপূজা বড় কঠিন; কারণ, মূলাধার প্রভৃতি কোন এক চক্রে মন স্থাপন সহজে করা যায়। শালগ্রাম চক্রে মন স্থির করা সহজসাধ্য নহে। যাহাদের দৃষ্টিসাধন অর্থাৎ ত্রাটক যোগ অভ্যাস হইয়াছে, কেবল তাহারা শালগ্রাম চক্রে মন স্থির করিতে পারে। শালগ্রাম চক্র ভেদ করিতে পারিলে, এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড মধ্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। তখন প্রত্যেক পরমাণুতে বিষ্ণু দর্শন করা যায়। এই কারণ প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ শালগ্রামচক্র পূজা ও ধ্যান করিয়া থাকেন।

শক্তির দুটা মুখ, অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ। বহির্মুখ দিয়া বাহিরে যায়। বোধ হয় যেন অন্য এক শক্তি আসিয়া বাহিরে টানিতেছে। বস্তুতঃ একই শক্তি। বিশ্বাসপূর্ব্বক কার্য্য করিলে প্রত্যেক গুরুবাক্যের সহিত শক্তি আছে, তাহা নিশ্চয়ই কার্য্য করিবে। গুরুবাক্য বোধ হইয়াছে, অথচ বিশ্বাস হয় না; প্রত্যেক বাক্যে বিশ্বাস হওয়া পূর্ব্বজন্মের সাধনের সঙ্গে বিশেষ যোগ আছে।

ভগবানের কার্য্য দেখিয়া দেখিয়া লোকের এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, ভগবানের প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয় না। রবি ঠাকুর গান করিলেন, ভগবান্ কি আশ্চর্য্য কৌশল বাগ্‌যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার মনে যেরূপ ভাব হইবে, সেইরূপ বাগ্‌যন্ত্রে শব্দ হইবে।

রাগ রাগিণীর কোন রূপ নাই, মনুষ্যমনের ভাব মাত্র। সেই ভাব মনে আসিবামাত্র নানা রাগ রাগিণী কণ্ঠের শিরাতে বাজিতে থাকে। নিরাকার ভাব আকার হইয়া রাগ রাগিণী রূপে পরিণত হইতেছে, ইহার প্রশংসা কেহই করে না। কণ্ঠের শিরা কয়েকটা মাত্র, তাহাতে সমস্ত সুর প্রকাশ হয়। উচ্চ, নীচ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, প্রভৃতি বিবিধ শব্দ ঐ শিরা গুলিতে বাজিতেছে।

প্রঃ—শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে। কলিযুগে কি প্রকারে সহজে মানবের মঙ্গল হইতে পারে?

উঃ—পঞ্চ দেবতা পূজা বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইহার মীমাংসা আছে। এতদুর অনুসন্ধান করিতে অভিলাষ না হইলে প্রচলিত প্রণালী মতে চলিলেই হইতে পারে। উপাসনা দুই নিয়মে প্রচলিত। বৈদিক ও তান্ত্রিক। বঙ্গদেশে বৈদিক উপাসনা প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণগণ কেবল গায়ত্রী ও সন্ধ্যা করেন। তদুপরি তান্ত্রিক দীক্ষা লইয়া থাকেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর এই পঞ্চ দেবতার কোন এক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। প্রতিদিন পূজার সময়, প্রথমে গুরুপূজা করিয়া ঐ পঞ্চ দেবতার পূজা করেন, তৎপর ইষ্টদেবের পূজা করেন। ইহাতে নিষ্ঠা হইলে সকলই লাভ করা যায়।

নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থে আছে,—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। মূলকথা—শাস্ত্র ও সদাচারের অনুগত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে ধর্ম্মলাভ হয়।

অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে মার্কেণ্ডেয় পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, এই তিন খানি পুরাণ অধ্যয়ন করিলে সমস্ত বেদ, উপনিষদ, মন্বত্রি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই অবগত হওয়া যায়।

বরাহদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন, ব্রহ্মা আমি পরম সুখে আছি। দেখ, আমার কত ছানা হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র ছানাগুলি যখন ভ্রমণ করে, তখন কেমন সুন্দর দেখায়। উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদতলে ক্ষুর সকলে খুর্ খুর্ করিয়া ভ্রমণ করে; উহাদের নাসিকা কেমন সুন্দর, যেন যুবতীর স্তনের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। উহাদের শরীরের লোমগুলি কেমন কণ্টকবৎ শোভা পাইতেছে। আহা! উহারা যখন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া আমার নিকটে আসে, তখন আমি বৈকুণ্ঠকে তুচ্ছ মনে করি। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীকে লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি না। আবরণের প্রয়োজন। দেখ, এখানে শুকরীকে লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করি। তাহাতে দেবতারাও কিছু বলিতে পারেন না।

ব্রহ্মা, বড় হওয়া বড় জ্বালা। সমানে দেবতা ও মনুষ্য সকলেই আমার নিকট সংকোচ ব্যবহার করে, স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে না। এখানে শূকর শূকরীগণ আমার নিকট সমান ভাবে চলে। বন্ধু, সখা লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করি। এমন সুখের অবস্থা ছাড়িয়া আমি চতুর্ভুজ বিষ্ণু হইয়া লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে বিহার করিতে ইচ্ছা করি না।

বরাহদেব এরূপ উত্তর করিলে ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণ সহ মহাদেবের নিকট সকল কথা বলেন। মহাদেব নূতন প্রকার পশুর রূপ ধারণ করিয়া বরাহ-দেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় তখন তিনি বরাহদেহ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

এক বিষ্ঠার কীট লাড়ু পাকাইতে পাকাইতে পথে চলিতেছে। দেবর্ষি নারদ তাহার কষ্ট দেখিয়া বলিলেন, হে কীট! তুমি এত কষ্ট পাইতেছ কেন? পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্য স্মরণ কর; স্বীয় কর্ম্ম শেষ করিয়া দেহ ত্যাগ কর। কীট বলিল, দেবর্ষি, তোমার সেই পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে নাই? তাই আমাকে উপদেশ দিতেছ। সে জন্মে আমি তোমার স্ত্রী ছিলাম।

আমার গর্ভে তোমার অনেকগুলি সন্তান হয়। সন্তানগুলিকে স্কন্ধে, ক্রোড়ে, ও মস্তকে বহন করতঃ পথে যাইতেছ এমন সময় পর্ব্বত ঋষির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তোমাকে বলিলেন, দেবর্ষি! তুমি এত দূর মায়ার বশীভূত হইয়াছ ? তবে সামান্য মানুষের গতি কি হইবে ? ইহা শুনিয়া তুমি বলিলে, পর্ব্বত ! মায়া কোথা হইতে আসিল ? বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যা শক্তি ; মা ও মাসী, অথবা মা ও সৎমা। তুমি বলিলে, আমি সন্তানাদি লইয়া পরম সুখে আছি।

দেবর্ষি নারদ, মায়ার দাস হইলে কীট অপেক্ষাও নিকৃষ্ট মনে করিয়া পর্ব্বত ঋষি যেমন তোমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তুমিও আমাকে সেইরূপ উপদেশ দিতেছ ; কিন্তু আপন আপন দেহ যে কি প্রিয় তাহা ত্যাগ করিতে কখনই ইচ্ছা হয় না। তবে আমাকে আর বিরক্ত করিতেছ কেন ? মায়ার প্রভাব সম্বন্ধে পুরাতন এরূপ অনেক আখ্যায়িকা আছে।

গুরুতে বিশ্বাস হওয়া বড় কঠিন। বিশ্বাস হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া বিশ্বাস হইবে বলিয়া মনে হইল। আশ্চর্য্য দেখিলাম। তখন মনে হইল এ লোকটা ভেল্কী জানে ; আমাকে ভেল্কী দেখাইতেছে। এরূপ উপায়ে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হইবার একমাত্র পথ, গুরুর উপদেশমত আচরণ করা। আচরণ করিতে করিতে হৃদয়ের বিকাশ হইলেই বিশ্বাস হইবে।

কুলগুরু বলিতে পৈতৃক গুরু বুঝায় না। যিনি তন্ত্রশাস্ত্র মতে উপাসনা দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করিয়াছেন তাঁহাকে কুলগুরু বলে।

শিষ্য গুরুকে একবৎসর পরীক্ষা করিয়া উভয়ে শাস্ত্রমতে লক্ষণযুক্ত হইলে দীক্ষা হইবে ; নতুবা নয়।

শান্তিপুরের জমিদার শিবচন্দ্র ও কালীচন্দ্র দুই ভাই। ইহারা দুর্দ্দান্ত ছিল। তাদের উপদ্রবে লোকে অস্থির হইত। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করা, ধনীর ধন আহরণ করা প্রভৃতি পাপের হাতে হাতে শাস্তি পাইল। জমিদারী, বাড়ীঘর সর্ব্বস্ব নিলাম হইয়া গেল। অবশেষে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিত। একদিন যাহার মাথায় জুতা মারিয়া টাকা লইয়াছিল, এখন তাহার দ্বারে ভিক্ষুক হইয়া দণ্ডায়মান। এই ভিক্ষা করিতে করিতে অতি কষ্টে জীবন শেষ হইল। ইহাদের কষ্ট দেখিয়া কেহই দুঃখ করিল না। শান্তিপুরের সকলের মুখেই এক কথা—"যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।"

প্রং—জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? মনঃসংযম কিসে হয়?

উং—জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই প্রয়োজন। জ্ঞান না হইলে ভক্তি প্রকাশিত হয় না; কারণ, যাঁহাকে ভক্তি করিব তাঁহার বিষয় না জানিলে কাহাকে ভক্তি করিব? জ্ঞান ভ্রাতা, ভক্তি ভগিনী, উভয়ের সমান মর্য্যাদা। তবে যে সাধক কেবল মোক্ষপ্রার্থী, তিনি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া সন্তুষ্ট হন। যে সাধক, ভগবানের দাস, সখা প্রভৃতি সম্বন্ধ লাভ করিয়া সেবা করিতে চান, তাঁহারা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সাধুসঙ্গ, সর্ব্বদা নিত্যানিত্য বিচার অর্থাৎ সংসারের অসারতাচিন্তা এবং মনে মনে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নাম জপ করা, এই সকল উপায় গ্রহণ করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়।

যদি সাধনগ্রহণের জন্য বাস্তবিক চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। লোকের নিকট কোন কথা শুনিয়া প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। সামান্য বস্তু ক্রয় করিবার সময় লোকে দেখিয়া শুনিয়া গ্রহণ করে।

যাঁহার নিকট সাধন গ্রহণ করিব এবং যেরূপ সাধন লইব, তাহা শাস্ত্র ও সদাচারসম্মত কিনা, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গ্রহণের পূর্ব্বে শত শত সন্দেহ হইলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু গ্রহণের পর এক একটী ঘটনা দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইলে ক্ষতি হয়। এজন্য কিছুদিন বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া গ্রহণ করা ভাল।

প্রং—গুরুর নিকট কোন পূজা, অর্চ্চনা, সাধন, ভজন নাকি নাই?

উং—গুরুর অনুমতি থাকিলে করিতে পারে। যদি কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়, (লোককে দেখাইবার ভাব থাকিলে তাহাকে ঔদ্ধত্য বলে) তাহা সর্ব্বদা পরিহার্য্য। গুরুতে বিশ্বাস হইলে সে কথা। গুরুতে সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান দর্শন হইলে পৃথক্ স্থানে অর্থাৎ গুরু ভিন্ন পূজা নিষেধ।

প্রং—স্ত্রীলোকের নিকটে দীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহাতে উপকার হয় কি না এবং স্ত্রীলোকের দীক্ষা দিবার অধিকার আছে কি না?

উং—যদি স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্র গৃহীত হয়, তবে সেই গুরুবংশের কাহাকেও উপগুরু করিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত পূজা, পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া পুরশ্চরণ করিলে উপকার হয়। ইহাও দেশাচার, কিন্তু শাস্ত্রসম্মত নহে।

অভ্যাগতদলে দুই শত হইতে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত সাধু থাকেন। মহান্ত একজন থাকেন। তিনি সকলকে চালান, কিন্তু কাহারও ধর্ম্ম নষ্ট করেন না, প্রত্যেকের বিশ্বাসকে মর্য্যাদা দান করেন। ইহাঁরা ভিক্ষা করেন না। ভগবৎ-কৃপায় যাহা পান, তাহাই সকলে ভাগ করিয়া আহার করেন। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কেহই পৃথক্ ভাবে আহার করেন না। ঐ দলের মধ্যে দুই এক জন গৃহস্থ লোকও দেখিয়াছি। ইহাদের সঙ্গে ভ্রমণ করিলে যেখানে যাহা আছে সমস্তই জানা যায়।

ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় বসিয়া আছি, একটী স্ত্রীলোক কাঁদিয়া বলিল যে আমার কন্যা মারা যায়, কিছু উপায় কর। আমি অন্য মনে ছিলাম, বিচার না করিয়া চেষ্টা করিলাম। তাহার পর আমার মন অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। গুরুজী আসিয়া ভৎ´সনা করিলেন।

লামা যোগীদের একখানি প্রাচীন গ্রন্থে 'হারাইলাম' নামে একজন যোগীর বিবরণ আছে। তাঁহারা বলেন ইহা খৃষ্টের বিবরণ।

প্রং—ঐ গ্রন্থ কোথায় আছে? উং—আর্ব্বলী পাহাড়ে কয়েকটী যোগী থাকেন, তাঁহাদের নিকট।

প্রত্যাদেশ নানাপ্রকার হয়। পরলোকের আত্মা প্রত্যাদেশ করিলে এবং কোন মহাত্মা স্থূক্ষ্ম দেহে আসিয়া উপদেশ করিলে তাহাও প্রত্যাদেশ বলে; কিন্তু প্রকৃত প্রত্যাদেশ, ভগবৎ-আদেশ। বিশেষ চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভগবৎ-আদেশ শুনা যায় না। ভগবৎ-আদেশ বিবেক নহে, বা মনের ভাব নহে। ভগবৎ-আদেশ আত্মাতে শ্রবণ করা যায়।

প্রকৃত প্রত্যাদেশ জীবনে দুই একটির বেশী হয় না। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' ইহা বুদ্ধদেব শুনিয়া জগৎকে জাগ্রৎ করিয়া ছিলেন। শ্রীচৈতন্য "জীবে দয়া, নামে রুচি" শুনিয়া জগৎকে মত্ত করিয়াছিলেন। খৃষ্ট শুনিয়াছিলেন, "ভগবৎসেবাতে জীবের উদ্ধার হয়, একজনে দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না।" এইরূপ যিনি যে প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন, তাহা গৃহের কোণে লুকায়িত থাকে না, তাহা জগতে ব্যাপ্ত হয়।

ঋষিগণ যে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছিলেন তাহাই উপনিষদ্‌রূপে বর্ত্তমান।

প্রত্যাদেশ সত্য, পতিতপাবন, জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ, তাহার সহিত কাহারও অনৈক্য হয় না।

একদল সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাগত বলে। অভ্যাগতদলে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, যোগী সকল প্রকার সাধু আছেন। ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সঙ্গে বড় বড় ছাতা থাকে। সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন। প্রতি বার বৎসরে ভারতভ্রমণ।

সমাধি হইবার পূর্ব্বে সুষুপ্তি হয়। তখন শরীর ঠিক থাকে না; এ অবস্থা চলিয়া গেলে শরীর স্থির থাকে।

লোকালয়ে আসিয়া ভগবদিচ্ছার অধীন হওয়া বড় কঠিন। এজন্য পাহাড়ে গিয়া থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম। উত্তর পাইলাম, "দত্ত বস্তুতে দাতার কোন সম্বন্ধ নাই। পাহাড়ে যাওয়া কি নগরে থাকা, ইহা যখন তুমি ভাব, তখন আমাকে আত্মদান কর নাই।" পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলে একমাস পরে উত্তর পাইলাম, "পুনর্ব্বার তোমাকে গ্রহণ করিলাম। সাবধান, লুকোচুরি করিয়া ধর্ম্ম হয় না। আমার বস্তু আগুনে ফেলিব, সুখে রাখিব, দুঃখে রাখিব।"

শান্তি ও জগবন্ধু ঢাকাতে কিছু বেশী টাকা খরচ করিয়া ফেলাতে কিছু পারিবারিক গোলযোগ হয়। তাহাতে জগবন্ধু শান্তিকে বলেন, "টাকা খরচ করিবার জন্য, খরচ হইয়াছে।" লোককে খাওয়ান অন্যায় নহে। ইহা না বুঝিয়া কেহ কিছু বলে ত সহ্য করিবে। সংসারের হিসাবে যাহারা টাকা দেখে, তাহারা তোমাদিগকে মন্দ বলিবে। ভগবানে নির্ভর করিয়া যাও। তাহাতে ভয় নাই। তিনি যদি আহার না দিয়া মারিয়া ফেলেন তাহাও ভাল; তথাপি সংসারকে সার ভাবিবে না। লোকের কথা শুনিলে কষ্ট পাইবে। যদি সংসারে আসিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাও, সম্পূর্ণ ঈশ্বরে নির্ভর কর। লোকের নিন্দা প্রশংসা শুনিও না।

প্রং—শরীর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ করা যায় কিনা ?

উং—অভ্যাস থাকিলে পুনরায় শরীরে আসা যায়, নতুবা আসা যায় না।

প্রং—মহাপ্রভু তাঁহার নিজের ভাবাবেশের অবস্থাকে মৃগী রোগ বলিতেন কেন ?

উং—সাধারণে মৃগী রোগ বলিত। সকলই যে তখন সাত্ত্বিক ভাব, নিজের মনে আপনাকে ভক্ত মনে করিতেন না, তাহা হইলে অভিমান আসিত।

এখন যেমন একটু নাচিলে নিজকে ভক্ত বলিয়া অভিমান হয়, মহাপ্রভুর সময় সেরূপ ছিল না ; এজন্য দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন, একটু অভিমান আসিলে ভক্তি হয় না।

ঋষিগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র নখদর্পণের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন। উপনিষদ, মন্বত্রি প্রভৃতি ধর্ম্মসংহিতা, অষ্টাদশ পুরাণ, তন্ত্র, সমস্ত শাস্ত্র একজন জানিতে পারে না। এজন্য সংক্ষেপে জানিবার উপায়, তন্ত্রমতে প্রথমে পঞ্চ উপাসনা, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সৌর, করিয়া দিয়াছেন। যিনি যে উপাসনায় দীক্ষিত হইবেন, তিনি তদধিকারী শাস্ত্র দেখিবেন। গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ইহা শাস্ত্রের শাসন। শাস্ত্র ও সদাচার না থাকিলে ঋষিদের পথের অনুসরণ হয় না।

তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, তপস্যা দ্বারা বিষ্ণু নানা অবতার হইয়া অসুর বধ করেন। তপস্যা দ্বারা শিব সংহারশক্তি প্রয়োগ করেন।

নিজে কিছুই স্থির করিতে নাই। ভগবৎ-ইচ্ছায় নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। নিজের হাতে ভার লইলেই কষ্ট। যে ঘটনা ভগবৎ-ইচ্ছায় হয়, সে ঘটনায় বিশেষ প্রয়োজন আছে। একটি মনুষ্যকে বিশেষরূপে ভালবাসা ধর্ম্মসাধনের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। পূর্ণ যিনি, তিনি ব্রজবিহারী, যদুনন্দন নহেন পূর্ণ। গুরুকে ব্রহ্ম বলে।

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন গুণ। মৃত্তিকা হইতে প্রস্তর হয়। প্রস্তর হইতে মণিরত্ন হয়। প্রত্যেক মণির গুণ ভিন্ন; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; মনুষ্যের এই তিন গুণ। এই তিন গুণের সঙ্গে প্রত্যেক শালগ্রামের মিল আছে। যে চক্রের সহিত সাধকের অধিক মিল, সেই চক্র সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিলে ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ দেখা যায়।

স্বপ্নে যদি প্রকৃত দেবদর্শন হয় তবে বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়। ঐ দেব-দর্শন সম্বন্ধে কখনই সন্দেহ হইবে না। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিলে, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে যে আনন্দ হয় তাহা কখনই ভুলিবে না এবং মনে নিশ্চয় বিশ্বাস হইবে—আমি ধন্য হইয়াছি, উদ্ধার হইয়াছি। যাহা প্রকৃত দর্শন নহে, কেবল স্বপ্নমাত্র, তাহাতে এরূপ অবস্থা কখনই হইবে না।

সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই দেহ দেহী ভিন্ন। মনুষ্যের দেহ পাঞ্চভৌতিক। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য। শরীরকে ক্ষেত্র বলে, মনুষ্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ভগবান্ যখন দেহ ধারণ করেন, তখন দেহ ও তিনি অভিন্ন। যত দর্শন হয় ততই পরিষ্কার হয়।

অনেক জন্মের পরে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে। বিষয়জ্ঞান প্রথম জন্ম হইতেই লাভ হইতে থাকে। মনুষ্যের মধ্যে জড়ত্ব বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব ও একত্বের বাস। মনুষ্যের এই সপ্ত সোপান অথবা সপ্তভূমি।

পূর্ব্বে শরীরে একটু পীড়া হইলেই মন খারাপ হইত। এখন দেখি শরীর ও আত্মা সম্পূর্ণ দুটা বস্তু। যেমন হিমালয়ের নিকট গেলে শরীরে শীত বোধ হয়, সেইরূপ শরীরে কোন ব্যথা কি পীড়া হইলে জানা যায় মাত্র, ভোগ হয় না। ভোগ শরীরেই হয়।

দীক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক নিয়মে—বেদ-বেদান্তবেত্তা, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চারি অশ্রমের কোন আশ্রমে যিনি নিয়মিত আচার প্রতিপালন করেন, এমন বেদজ্ঞ, সদাচারী আশ্রমী ব্রাহ্মণ সদ্‌গুরুশব্দবাচ্য। বৈদিক গুরুর নিকট কেবল ব্রাহ্মণ ওঁ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য জাতির অধিকার নাই।

দ্বিতীয় তান্ত্রিক। কলিতে যে সকল দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, বৈদিক আশ্রম ও সদাচার প্রতিপালনে অক্ষম, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য মহাদেব দয়া করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারিবর্ণ এবং সমস্ত বর্ণসঙ্কর মনুষ্যের অধিকার আছে।

তন্ত্রসাধনের তিনটী সোপান। পশু, বীর, দিব্য, এই ত্রিবিধ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থের সহিত মন্ত্রচৈতন্য করিয়াছেন, তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। এই সিদ্ধ মন্ত্রের সহিত ওঁকার যুক্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধ মন্ত্রে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরু মহাদেবের আজ্ঞানুসারে সর্ব্ববর্ণে ওঁকারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করেন। তাহা সাধন করিলে নিতান্ত অশ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিও তিন জন্মে মুক্তি লাভ করে। সত্য, সত্য, সত্য, ইহা শিব বাক্য।

যাহার যাহা শাস্ত্র, তাহা অবলম্বন করিয়া রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ধর্ম্ম।

সাধারণ ব্রহ্মসমাজ ভুল করিতেছেন। মনুষ্যের চিত্তে সাধন না থাকিলে সাধারণের যাহা মত, তাহাই আমার ধর্ম্ম, ইহা কথনই হয় না। ইহা মনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এরূপ করিলে, নিজেই কোণঠেসা হইয়া নষ্ট হইতে হয়।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের যে উপনয়ন হয়, তাহাই পূর্ব্বকালের বৈদিক দীক্ষা। গর্ভাধান হইতে ব্রাহ্মণের দশকর্ম্ম বৈদিক মন্ত্রে সম্পন্ন হয়। ইহা প্রাচীন প্রথা মাত্র। ইহাতে প্রাণের অভাব দূর হয় না। এজন্য সমস্ত বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সমস্ত দেশে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচলিত। "কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইবে"। দেশের লোকে ইহার অর্থ না জানিয়া পিতা মাতার গুরুকে কুলগুরু বলেন। কুলগুরুর অর্থ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে, যিনি সাধন দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়াছেন, তাঁহাকে কুলগুরু বলে।

এখন শ্রদ্ধাবান্ লোক বিরল। সকলেই মহাত্মাদিগের পরীক্ষা করিতে চায়। একবার পরীক্ষা হইয়া গেলে তাহারা আবার পরীক্ষা করিতে চায়। যখন শ্রদ্ধাবান্ লোকের সংখ্যা অধিক হইবে, তখন তাহাদের দ্বারা দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইতিমধ্যেই অনেক ইংরাজি শিক্ষিত লোক শাস্ত্র ও মহাত্মাদিগকে বিশ্বাস করিতেছেন। শাস্ত্রচর্য্যা আরম্ভ হইয়াছে যখন তাহারা ক্রিয়াশীল হইবে তখন অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিবে।

শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্যপথ যদি ব্রহ্মলোকেও লইয়া যায় তাহা গ্রহণ করিবে না, কারণ, দৈবাৎ দুই এক ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে অন্যপথে সদ্‌গতিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু যাদের প্রথম আরম্ভ, তাহারা ঘোর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ইহা ঋষিবাক্য।

আসন অনেক পরিশ্রমে ঠিক হয়। সেই আসনে যত দিন থাকা যায়, কোন প্রকার পীড়া এবং অসুবিধা হয় না। আসন ছাড়িয়া একদিনের জন্য অন্য স্থানে গেলে নানা পীড়া ও অসুবিধা হইয়া থাকে। এ জন্য পূর্ব্বের মত নানা স্থানে ভ্রমণ আমার পক্ষে মৃত্যুর কারণ।

প্রং—ঈশ্বরের আদেশ কিরূপে বুঝা যায়?

উঃ—বাল্যকালে একজনের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল। সেই ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনাক্রমে ২০ বৎসর দেখা হয় নাই। একদিন হঠাৎ সে বন্ধু আমার নাম ধরিয়া ডাকিল, তাহার পর কিরূপে চিনিতে পারি, ইহা কখনই প্রকাশ করিতে পারি না। তদ্রূপ ঈশ্বরাদেশ কিরূপে জানা যায়, তাহা কেহ বুঝাইতে পারে না।

প্রঃ—শাস্ত্রে ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে, ইহার অর্থ কি ?

উঃ—শিশুর আহার এক প্রকার, রোগীর আহার এক প্রকার, বালকের আহার এক প্রকার, যুবার আহার এক প্রকার, বৃদ্ধের আহার এক প্রকার। প্রত্যেকেই আপন আপন আহারে পুষ্টি লাভ করে। একজনের আহার আর একজনকে দিলে তাহার জীবন নষ্ট অথবা পীড়া হয়।

ভাব দুই প্রকার। স্থায়ী ও সঞ্চারী। সংকীর্ত্তনাদিতে যে নৃত্য হয়, তাহা সঞ্চারী ভাব। তাহা কখন হয়, কখন হয় না। স্থায়ী ভাব একবার হইলে তাহা আর যায় না। সঞ্চারী ভাব স্থায়ী ভাবের আভাস মাত্র। নাম করিতে করিতে স্থায়ী ভাবের উদয় হয়।

গুরুর প্রয়োজন। সংসারের মধ্যে যাহা দর্শন করি, শ্রবণ করি, ঘ্রাণ, স্পর্শ করি, আস্বাদ করি, এসমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করি। যদি সেই সমস্তের তত্ত্ব জানিতে হয়, তবে ঐ সকল বিষয় যিনি অবগত আছেন তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে হয়। সেইরূপ ঈশ্বর আছেন, আমি আছি, জগৎ আছে, এগুলি সহজ জ্ঞান দ্বারা সকলেই জানে। যদি কেহ সহজ জ্ঞানে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার তত্ত্ব জানিতে চান, তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্ ভিন্ন অন্য পণ্ডিত ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশদানে অধিকারী নহেন। এজন্য গুরু ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। দ্রোণাচার্য্য ক্ষত্রিয়দিগের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়া তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য কৃত্রিম পক্ষীকে বৃক্ষে রাখিয়া ঐ পক্ষীর চক্ষুকে লক্ষ্য করিলেন। দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রত্যেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন

বৃক্ষে কি পক্ষী দেখিতেছ? কেহ বলিলেন বৃক্ষ ও পক্ষী দেখিতেছি; কেহ বলিলেন, বৃক্ষ দেখিতেছি না, পক্ষীর ডানা ও পুচ্ছ দেখিতেছি; কেহ বলিলেন পক্ষীর পিঠ; কেহ বলিলেন পক্ষীর মাথা দেখিতেছি। দ্রোণাচার্য্য সকলকে বিদায় দিয়া অর্জ্জুনকে ডাকিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, একটি চক্ষু দেখিতেছি, আর কিছুই নাই। তখনই লক্ষ্যভেদ করিতে গুরু অনুমতি দিলেন। সেইরূপ সদ্‌গুরু যখন দীক্ষা দেন, তখন সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত থাকিলেও গুরু শিষ্য ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পান না। তিনি যে নামরূপ বীজ রোপণ করেন, তাহা কেবল শিষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হয়। শরীরে ঔষধের ক্রিয়াও এইরূপ। ঔষধ সেবন করিলে সমস্ত শরীরে তাহার ক্রিয়া হয় না; শরীরের যে অঙ্গে পীড়া, কেবল সেই অঙ্গেই ক্রিয়া হয়।

অদ্বৈতবাদ মত নহে, আত্মার এক প্রকার অবস্থা। জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হইলে তখন আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যায়। যাহা দেখে কেবল ব্রহ্মসত্তাই দেখে। অনন্ত সাগরে একটি জলবিন্দু প্রবেশ করিলে সে চারিদিকে সমুদ্রের হিল্লোল কল্লোল দেখে, কখনও ডোবে, কখনও ভাসে। আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। তাহা হইলে এত পরিশ্রম করিয়া ঋষিগণ সাধন করিতেন কেন? ইহাই পরম গতি, পরম সম্পদ্।

৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্যজন্ম হয়; এই জন্মে সে যে কর্ম্ম করে, তাহাকে প্রারব্ধ, সঞ্চিত, বর্ত্তমান বলে। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম শেষ করিতে অনেক জন্ম, মৃত্যু হয়; তাহা মানবজন্মের ঘটনামাত্র। এইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এই ত্রিবিধ দেহ নষ্ট হইয়া মায়া হইতে মুক্ত হয়।

মনুষ্য জন্ম পাইয়া যদি ভগবানের ভজন, পূজন না করে, তবে পুনর্ব্বার অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ যোনিভ্রমণ আরম্ভ হয়। মনুষ্য জন্ম পাইয়া যদি একবার ভগবানের নাম শুনার মত শুনে, বলার মত বলে, ডাকার মত

ডাকে,—অর্থাৎ শিশু যেমন মা বলিয়া ডাকে, তাহাতে অমনি মা শিশুর নিকটে দৌড়িয়া আসেন। ইন্দ্রিয়সুখে ও ভোগে মত্ত হইয়া যদি মাকে ভুলিয়া যায়, তবে তাঁহার মনুষ্যজন্ম বৃথা হইল। উপনিষদ্,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়। সমস্ত সংশয় নষ্ট হয়, এবং সমস্ত কর্ম্ম শেষ হয়।

কেবল প্রাণায়ামে শরীর সুস্থ থাকে ও মনের একাগ্রতা হয়। এরূপ একাগ্রতা মনে থাকিতে থাকিতে মন নিরোধ হইলে সমাধি হয়। ইহাকে শূন্য সমাধি বলে। এরূপ শূন্য সমাধিতে সহস্র বৎসর থাকিলেও তাহাতে কোন উপকার হয় না। এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ট রামায়ণে এক বাজীকরের কন্যার বিবরণ দ্বারা সুন্দর বুঝাইয়াছেন। অধ্যাত্ম যোগ, অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাতে ব্রহ্ম লাভ হয়। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন এরূপ সমাধি হয় না।

যাহারা সাধুর নিকট উপদেশ শুনে, কিন্তু উপদেশ মত কার্য্য করে না, তাহারা চকমকি পাথরের মত। চকমকি পাথর জলের মধ্যে ফেলে রাখ, অথবা সহস্র কলসী জল তাহাতে ঢাল, তথাপি যখনই ঠুকিবে আগুন বাহির হইবে।

সর্ব্বদা নিজকে হীন মনে করা উচিত নয়। একদিকে তৃণ হইতে নীচ, অন্য দিকে আমি ভগবদংশ, আমার ক্ষমতার সীমা নাই, পবিত্রতার সীমা নাই—ইহা বিশ্বাস করিব। এই বিশ্বাসে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি। আমি যে তৃণ হইতে নীচ, আমার উচ্চতা বোধ করিলে বলিতে পারি।

পাপ কি? স্বভাবের বিপরীত কার্য্যই পাপ। যেমন আধ্যাত্মিক পাপ অপ্রেম, নিষ্ঠুরতা, নীচতা ইত্যাদি। শারীরিক পাপ—রোগ। মানসিক পাপ—কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি। সামাজিক পাপ—চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও মানসিক এই প্রকার পাপ লোকে দেখে না। সামাজিক পাপ নিবারণ জন্য রাজশাসন, সমাজশাসনের বিধি আছে। এই সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, প্রশংসা দিয়াছেন। ডাকাত, লম্পট ব্যক্তিও যদি কাহাকেও অন্যায় করিতে দেখে, তৎক্ষণাৎ তাহার শাসন করে। এই অবস্থা আছে বলিয়াই রক্ষা পাওয়া যায়।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উপদেশ।

(৪)

কর্ম্ম করা বৃথা নহে। কর্ম্ম করিতে করিতে যদি ভগবানের নাম কর, তাহা হইলে বাসনা নষ্ট হয়। যাহার কর্ম্ম কাটে নাই সে সমস্ত দিন নাম করিতে পারে না। বৃথা কাজে তাহার অনেক সময় নষ্ট হয়। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মবন্ধন কাটিয়া যায়।

নাম যত অধিক করিবে ততই শীঘ্র উপকার হইবে। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই সাবধান থাকিবে। তাহাদের মধ্যে কখনই ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়। স্ত্রীজাতিকে যত সম্মান করিবে ততই নিজে পবিত্র থাকিবে। যাঁহাকে সম্মান করা যায় তাঁহার প্রতি কুৎসিত ভাবে দৃষ্টি করা যায় না। আমাদের দেশে নারীজাতিকে তত সম্মান দেওয়া হয় না। উত্তরপশ্চিমে স্ত্রীজাতির সম্মান আছে, বোম্বাই, মহারাষ্ট্রে নারীকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়, তাতেই সব বীর জন্ম গ্রহণ করেন। নারীজাতিকে সম্মান না করিলে স্বীয় চরিত্র পবিত্র রাখা সুকঠিন।

মনে মনে কুচিন্তা করিলেও চিত্ত অপবিত্র হইবে।

কলিতে ব্রহ্মনামের দীক্ষার প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন কলির জীবের গতি নাই। ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ মত দীক্ষিত হইতে হইলে হৃদয় প্রস্তুত কিনা তাহা দেখিতে হইবে। এই জন্ম যাঁহাদের দেববাক্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, কেবল তাঁহারাই সেই উপদেশ পালন করিতে পারেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনূদিত হইয়াছে। তাহা পড়িলে

বুঝিতে পারিবেন, যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তাঁহারা শত চেষ্টা করিয়াও জাতিভেদ রাখিতে পারিবেন না।

সাধুর লক্ষণ কি? আত্মপ্রশংসা করেন না, পরনিন্দা করেন না, অন্যের বিশ্বাস নষ্ট করেন না, সর্ব্ব জীবে দয়া করেন, সময় নষ্ট করেন না, সর্ব্বদা ভগবানের স্মরণ, অর্চ্চন, কীর্ত্তন, সাধুসেবা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন।

বেদ ও উপনিষদে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে হিন্দুশাস্ত্র বুঝা সুকঠিন। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া না পড়িলে ধর্ম্মের জটিল প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিতে পারা যায় না। আদিপর্ব্বে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মীমাংসা শান্তিপর্ব্বে আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে একটি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মীমাংসা হইয়াছে অন্য পুরাণে; সুতরাং সমগ্র শাস্ত্র না পড়িলে শাস্ত্রের মত বলা যায় না।

আজ কাল ব্রাহ্মণদের আর সেরূপ শিক্ষা নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সকলেই ব্যবসায়ী। কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ততটুকুই পড়েন। ধর্ম্মলাভের জন্য শাস্ত্রালোচনা করেন না। তাহা না হইলে একালেও বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, মনুসংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি বিশেষরূপে প্রচলিত থাকিত।

যাঁহারা যথার্থ মহাজন তাঁহাদের আশ্রয় লইতে হইবে। লোকের মুখে শুনিয়া প্রকৃত সাধু জানা যায় না।

সৎপাত্রে দান করিবে। যে সর্ব্বদা যাচ্ঞা করে সে ব্যক্তি দানের পাত্র নহে; চাটুকারকে দান করা অন্যায়। ভয়ে, লজ্জায়, সম্মান বা প্রত্যুপকারের আশায় দান করিলে তাহা প্রকৃত দান হয় না। স্বর্গকামনায় বা পাপ-মোচনেচ্ছায় দান করিলে তাহা দান হয় না। দান করিয়া অনুতাপ করিলে তাহা দান হয় না। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জল দেখিলে পান করিতে ব্যগ্র হয়, প্রকৃত দাতাও সেইরূপ সৎপাত্র পাইলে দান করিতে ব্যগ্র হন। সর্ব্বস্ব

দিয়াও যদি পরের দুঃখ দূর করিতে পারেন তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। প্রকৃত দান করিতে পারিলে আনন্দের সীমা থাকে না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে তপস্যার পক্ষে উপযুক্ত স্থান নাই। হিমালয়, সিন্ধু, কাবেরী, নর্ম্মদা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীর তীর, গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান তপস্যার পক্ষে খুব ভাল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ইষ্টদেবতা যে ভাবে যে মূর্ত্তিতে সাধিত হন, সাধনসিদ্ধির পূর্ব্বে সেই দেবতা স্বপ্নে দর্শন দিয়া আকর্ষণ করেন।

যত দিন কাম ক্রোধ থাকিবে তত দিন সময় সময় মনে উদিত হইবে। মনে উদিত হইলেই পাপ হয় না। মনে উদিত হইলে যদি দমনের চেষ্টা করি তাহা হইলে পাপ হয় না। তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দে যোগ দেওয়াই পাপ।

সংগ্রাম করিতে গিয়া পরাস্ত হইলে তাহাতে অপরাধ নাই। যত দিন ত্রিগুণের অধীন থাকিব, ততদিন গুণানুসারে বাধ্য হইয়া আমাকে চলিতে হইবে।

যদি ভগবানের নাম অবলম্বন থাকে, ক্রমে ত্রিগুণ নষ্ট হইয়া শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইতে থাকিবে। ধর্ম্ম অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধি-অনুসারে। মনুষ্য-সমাজে যাহা পাপ পুণ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে ভগবান্ তদ্দ্বারা বিচার করেন না; তিনি মানুষের হৃদয় দেখিয়া বিচার করেন।

মারিলেই যে হিংসা হয় তাহা নহে। হিংসা যদি অন্তরে থাকে এবং ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা স্বীয় তৃপ্তির জন্য বধ করিলে হিংসা হয়। অন্তরে হিংসা থাকিলে লীলাদর্শন হয় না। যদি কিছু সময়ের জন্যও হৃদয় হিংসাশূন্য হয় তখন লীলাদর্শন হইতে পারে।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম ভাল না লাগিলেও ঔষধ গিলার মত করিলে ক্রমে রুচি জন্মে। নামে

অরুচি হইলে তাহার ঔষধ নামই। যেমন পিত্তরোগে মুখ তিক্ত হইলে মিশ্রীও তিক্ত লাগে। ঐ রোগের ঔষধ মিশ্রী। খাইতে খাইতে মিশ্রী মিষ্ট লাগে।

প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নানান্তে একঘণ্টা কাল প্রাণায়াম ও নামজপ, পরে একঘণ্টা কাল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, তৎপর বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গের সেবা অর্থাৎ বৃক্ষে জল, ও প্রাণিদিগকে কিছু কিছু আহার দেওয়া এবং পরে গৃহকর্ম্ম করা উচিত। আহারের পর নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া অধ্যয়ন করিবে। অপরাহ্ণে কিঞ্চিৎ ভ্রমণ, সন্ধ্যার পর নাম গান, প্রাণায়াম, পরে পরিমিত আহার করিয়া শয়ন করিবে। ইহা অভ্যস্ত হইলে সহজে ধর্ম্মজীবন লাভ হয়।

ক, খ অভ্যাস করিয়া পড়িতে শিখিলাম, পরে যে পুস্তক পড়ি প্রত্যেকের মধ্যে ক, খ আছে ; ক, খ ত্যাগ করিয়া পড়িতে পারি না! ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রথম একটি প্রণালী ধরিয়া চলিতে হইবে। প্রথমে যে এই দেহই আমি এই জ্ঞান ভেদ করিয়া শরীরতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতি করিতে হয়। যিনি না করেন তিনি দেহ, আত্মা যে কি তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। দেবতাসকলের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য দেবোপাসনা, সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। আমি এবং ব্রহ্ম এক কি ভিন্ন তাহা জানিবার জন্য যোগ করা ; এ যোগ প্রাণায়াম প্রভৃতি নহে -আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন। যথার্থ যোগ সাধিত হইলে ভগবান্ জগতে কিরূপে বিরাজ করেন তাহা প্রত্যক্ষ হয় ; তখন ইহলোক পরলোক এক হয়।

পূর্ব্বকালের ঋষিগণ অনেক পরিশ্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধনপ্রণালী লাভ করিয়াছেন। ক্রম অনুসারে না হইলে যেটুকু সাধন করিবে তাহারই ফল পাইবে, পরের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না।

কাম শারীরিক গুণের সহিত মিশ্রিত থাকিলেই কাম, শরীর হইতে ভিন্ন

হইলে প্রেম। তখন ইহা আত্মার অংশ বা আত্মা। শারীরিক গুণ সহজে যায় না। আহারসংযম একমাত্র ব্যবস্থা। যাহারা বিষয় কর্ম্ম করে তাহারা এ নিয়ম পালন করিতে পারে না—বিষয় কর্ম্ম না থাকিলে পারা যায়। স্বহস্তে পাক করা ভাল। আহার কমাইয়া ক্রমে ফলমূলে পরিণত করিতে হয়। নিদ্রা যতদূর সম্ভব কমাইয়া দেওয়া ভাল। গ্রাম্য আলাপ ত্যাগ ও নিম্নদৃষ্টি দ্বারা শারীরিক গুণের পরিবর্ত্তন হইলে কাম নিস্তেজ হয়।

আমার নিজের জীবনের বিষয় চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে আমি বিশেষভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করি নাই। যখন টোলে পড়ি তখন গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। সংস্কৃত কলেজে গিয়া অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক হইলাম। পরে মেডিকেল কলেজে গেলাম, ব্রাহ্মসমাজে গেলাম, প্রচার করিলাম, চিকিৎসা করিলাম; আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পড়িয়াছি। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। যখন চিকিৎসা করিতাম, মনে হইত এই ঔষধ দিলেই ঐ রোগ আরাম হইবে। ক্রমে দেখিতাম তাহাতে কিছু হয় না। এইরূপ দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারিলাম যে ঔষধ কিছুই নহে, ভগবানের কৃপা চাই।

প্রচার করিতে গেলাম, যেখানে যাই সমস্ত লোক প্রথম সব কথা শোনে, সাহায্য করে। ক্রমে দেখি লোকদের সেভাব নাই। আর আমার কথায় কিছুই হয় না! তখন বুঝিলাম আমার শাস্ত্রজ্ঞান ও বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নহে। ভগবানের কৃপাই সমস্ত—ভগবানই সর্ব্বকর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক বিধাতা।

মনুষ্যের সহস্র দোষ থাকা কিছুই অসম্ভব নহে; কিন্তু তাহার মধ্যে যেটুকু গুণ আছে তাহাই ধরিয়া প্রশংসা করিতে হইবে। সরল মনে লোকের প্রশংসা করিলে ঈশ্বরোপাসনার কার্য্য হয়। গুণকীর্ত্তন করিলে নিজের

দোষ দুর হয়, শক্তিলাভ হয়, আনন্দ হয়। নিন্দা করিলে নিজের সদ্‌গুণ নষ্ট হয়।

মনের সংকল্প বিকল্প নষ্ট না হইলে যথার্থ একাগ্রতা হয় না। ভগবান্ আছেন একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একাগ্রতালাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

মনুষ্য ভগবানের দিকে যতই অগ্রসর হইবে ততই বিষয়ী মনুষ্য হইতে দূরে পড়িবে। তাহারা তাঁহাকে পাগল বলিবে। গুরু নানকের দুই পুত্র শেষকালে তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। ঋষিবাক্যই সার।

ভগবৎকৃপালাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন। চিত্তমধ্যে যে প্রবৃত্তি আছে তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়া যদি অক্ষম হই তাহাতে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় না—কেবল আত্মা মলিন হয়, স্ফূর্ত্তি পায় না। সম্পূর্ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে অধর্ম্ম হয়। সাধন অবস্থায় প্রবৃত্তি প্রবল হইলে দমন করিতে চেষ্টা করা উচিত। যতদিন সংগ্রাম থাকে ততদিন আত্মাতে পাপস্পর্শ হয় না, কেবল আত্ম-দুর্ব্বলতার জন্য মলিনতা আসে। শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে যোগ থাকিলে সব ঠিক হইবে।

মনুষ্যের স্বভাবের যত বিকাশ হয় ততই আনন্দ প্রকাশ হয়। যাহারা পাপ চিন্তা দ্বারা বিকৃত করিয়াছে তাহারা কখনও আনন্দ পায় না; পাপে শরীর রুগ্ন হয়, মন অপবিত্র হয়। সাধনদ্বারা পুণ্যলাভ করিয়া স্বভাব (অবিকৃত অবস্থা) লাভ না করিলে আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

দাস্যভাবের আদর্শ মহাবীর। যাহারা নামও করে অথচ পাপও করে, ভগবান্ তাহাদিগকে ভয়ানক অপরাধী বলিয়াছেন। নামাপরাধের মত পাপ আর নাই। তৃণের মত নীচ হইয়া, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হইয়া, অমানীকেও মান্য করিয়া, নিজের অভিমান ত্যাগ করিয়া নাম করিলে তৎক্ষণাৎ নামের

ফল পাওয়া যায়। ঐ সকল অবস্থা লাভ করিবার জন্য সৎসঙ্গ, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, গুরুর আজ্ঞা পালন, মাতাপিতা গুরুজনদিগের ও ভগদ্ভক্তদিগের সেবা করিতে হয়।

কোন একখানা গ্রন্থ পড়িলে উপকার হইবে না, প্রথমে বাছিয়া বাছিয়া পড়া উচিত—যথা: মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল, অধ্যাত্ম রামায়ণ, এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বাছিয়া নিজের রুচি-অনুসারে পাঠ করিতে হয়। যখন শাস্ত্রে একটু রুচি জন্মিবে তখন বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ পাঠ করিলে উপকার হইবে। হিন্দী ভক্তমাল আরও ভাল।

নেপোলিয়নের শেষ অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অতিদুঃখেও মহত্ত্ব যায় নাই। নেপোলিয়ন দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। নেপোলিয়ন ও অর্জ্জুনের শেষ অবস্থা এক প্রকার।

ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব বেদ এক। শিক্ষার জন্য চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সমস্ত চারিবেদ শিখিতে হইলে বহু বৎসরের প্রয়োজন হয়। সমগ্র বেদ পড়া সকলের জীবনে কুলায় না, কাজেই কেহ এক ভাগ, কেহ দুই ভাগ অধ্যয়ন করেন।

ব্যাসদেব লিখিয়াছেন—'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং'—গুহা শব্দের অর্থ মানুষের হৃদয়। চতুর্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এ সমস্ত অপরা বিদ্যা। যদ্দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাই পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা।

টাকা, ঘর, বাড়ী কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। স্বাধীনতা কিছু আছে। যেমন গলায় দড়িবাঁধা গরু ; দড়ি যতদূর লম্বা ততদূর ঘুরিতে ফিরিতে পারে, কিন্তু দড়ির দীর্ঘতা অতিক্রম করিতে পারে না। মানুষের স্বাধীনতাও তদ্রূপ। মনুষ্য আপন প্রকৃতির বিষয় যতটুকু, ততটুকু স্বাধীনভাবে করিতে পারে।

শ্রীমতীর প্রতি কৃষ্ণ বিশেষ কৃপা দেখাইলে, তিনি গর্ব্বিতা হন। তাহাতে কৃষ্ণ চলিয়া যান। তখন সখীগণ ও শ্রীমতী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন, রাসলীলা করিলেন। শ্রীমতী সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সুখী হইলেন, আবার সখীরা শ্রীমতীর সহিত কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। গুরুশিষ্য সম্বন্ধও এইরূপ। গুরু শিষ্যকে তুচ্ছ করিলে ভগবান্ গুরুকে ত্যাগ করেন। তখন গুরুশিষ্য একত্র হইয়া ক্রন্দন করিলে ভগবান্ প্রকাশিত হইয়া রাসলীলা করিতে থাকেন। তখন গুরু শিষ্যকে ভগবানের সহিত এবং শিষ্য গুরুকে ভগবানের সহিত দেখিয়া কৃতার্থ হন।

প্রতিদিন সাধনের জন্য উপবেশন করা উচিত। এক সময় নির্দ্ধারিত থাকা ভাল। প্রথমে ১০ মিনিট, আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা করিয়া বসিবে। ক্রমে সময় বাড়াইয়া দিবে।

সুখ কিসে হয়? 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। নিত্যবস্তু লাভেই সুখ হয়। সান্ত বিনশ্বর বস্তুতে আসক্ত হইলে নিশ্চয়ই দুঃখ পাইবে।

বালকদিগকে ক্রোধপূর্ব্বক শাসন করিলে শাসনের ফল হয় না। ধীরভাবে বিচার করিয়া শাসন করা কর্ত্তব্য। বালকের বিরুদ্ধে কিছু শুনিলে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে।

কাম, ক্রোধ ইত্যাদি অপেক্ষা হিংসা ও অভিমানই ধর্ম্মসাধনের প্রধান শত্রু। ধর্ম্মাভিমান হইলে মানুষের সমস্ত পণ্ড ও সর্ব্বনাশ হয়। অভিমান বিভীষণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া ভগবানের সিংহাসনের নিকট পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে।

সংসারসর্ব্বস্ব মনুষ্যের অর্থ-লালসা যেরূপ, ঔদরিকের মিষ্টান্ন-লালসা যেরূপ এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোকের ইন্দ্রিয়চরিতার্থতালালসা যেরূপ হয়; আরূঢ় ভক্তের ভগবৎ-সঙ্গ-লালসাও সেইরূপ বা ততোধিক হয়। অতএব

সংসারী মানব, ঔদরিক ব্যক্তি ও কামুক পুরুষ নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধির প্রতিকূল বাক্য শুনিলে যেরূপ অবস্থা হয়, ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রতিকূল বাক্যে ভক্তেরও ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক কষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ঘোর সংসারী, অর্থপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধে আমাদের যেরূপ মর্ম্মান্তিক চিন্তা হইয়া থাকে, আরূঢ় ভক্তের ভগবানের জন্য তাহা শতগুণ অধিক হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

যাহাদের পশ্বাদির ন্যায় দেহাভিমানের আবরণ অত্যন্ত ঘনীভূত, তাহারা স্বার্থপর। ন্যায়, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি সৎ প্রবৃত্তি তাহাদের নিকট মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মোহমেঘে সর্ব্বদা আবৃত।

পরব্রহ্ম যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার লোকবৎ লীলা অর্থাৎ খেলা মাত্র। শাস্ত্রানুসারে যদি সৃষ্টি কার্য্য তাঁহার খেলাই হয়, তবে জগৎ সংসারে যাহার যাহা কিছু বিপদ, বিভীষিকা, বা কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটে, তাহাও সেই লীলাময়ের পরীক্ষা বা খেলা। তিনি অনুক্ষণ আনন্দের আকর্ষণরূপ চিত্তমোহন রবে জীবগণকে আত্মসমীপে আহ্বান করিতেছেন—আবার নানা প্রকার পরীক্ষায় ফেলিয়া চিত্ত শুদ্ধ করতঃ নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া ব্যাকুল করিতেছেন। সুদারুণ বিভীষিকার ভিতরেও তাঁহার অসীম দয়া, কুশলময় আশ্বাস, নিগূঢ় সুমধুরভাব রহিয়াছে। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রদর্শিত বিভীষিকা দর্শনে সাধন পথে পশ্চাৎপদ না হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকে, সেই আনন্দবিগ্রহের আনন্দলাভে সমর্থ হয়।

একটী বাগানে কত ফল ফুল ঔষধির গাছ আছে। যে মালিক সেই তাহার ব্যবহার ও প্রয়োজন জানে। তুমি যদি তাহা হইতে একটীকে উৎপাটিত কর তবে তাহা তোমার অজ্ঞানতার ফলে অন্যায় হইবে। দেখ এই সংসাররূপ বাগানে কত রকমেরই মানুষ রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেকেরই

কোন না কোন প্রয়োজন রহিয়াছে, নিরর্থক কোন একটী সৃষ্টি হয় নাই। এই বিচিত্র জগতে ইহা সেই সৃষ্টিকর্ত্তার গলে বা পদতলে দেখিতে কি সুন্দর! যিনি তাহা দেখিতে না পাইয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও মর্ম্মবেদনা দিয়া সমূলে নষ্ট করিতে চান, তিনি নিতান্তই দুর্ব্বুদ্ধিপরবশ ও কৃপার পাত্র। তিনি কোন কালেও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারেন না। উৎপাটিত করাও দূরের কথা, অবজ্ঞা বা ঘৃণা করিলে ও কাহারও প্রাণে ব্যথা দিলে এবং কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে তাহার জন্য এ রাজ্যের দ্বার অর্গলবদ্ধ। এ রাজ্যে প্রবেশের পথ প্রত্যেক নর-নারীর পদতলে।

দেখ এখনকার কালের বাবুরা বা লোকেরা মিরাকল দেখিতে চায়। তাহা না দেখিলে তাহারা ভোলে না বা পসন্দ করে না। মিরাকেল দেখিতে ইচ্ছা করিলে জগতে ভগবানের মত মিরাকেল কে জানে বা করিতে পারে? কিন্তু তাহা কেহ দেখিতে চায় না। তিনি গাভীকে ঘাস খাওয়াইয়া দুধ করেন। তোমার কোন্ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তাহা করিতে পারেন বল ত? মানুষকে ঘাস খাওয়াইয়া দুধ কর ত? ইহা লোক দেখে না ও বুঝে না। কেবল মিরাকেল মিরাকেল করে ও তাহা দেখিতে চায়। কেহ দম্ভ করিয়া কিছু বুজরুকি দেখাইলে তবে তাহাকে সাধু বা মহাপুরুষ বলিয়া তাহাদের মনঃপূত হয়, নচেৎ নয়। মহাপুরুষেরা কখনও বুজরুকি করেন না বা দেখান না। তাঁহারা কোন প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেন না। অষ্টসিদ্ধি আসিয়া তাঁহাদের নিকটে সাধা-সাধী করিলেও তাহাদের তাঁহারা চান না। তাঁহারা কেবল ভগবানকেই চাহেন। অন্য কিছুতেই বাসনা কামনা রাখেন না ও করেন না। এই পৃথিবীর সম্রাট্ হইলেও তাঁহারা সন্তুষ্ট নন। জগতের আর কোন পদার্থেই তাঁহারা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না, সেই রসস্বরূপ ভূমা পুরুষ ব্যতীত।

এ দেশের জল বায়ুরই কি দোষগুণ আছে যে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা

কত অসাধ্যসাধন, ত্যাগস্বীকার, কষ্টভোগ করিয়া যাহা তাঁহারা সাধনবলে লাভ করিয়া নিজের জীবনে আচরণে ও ব্যবহারে দেখাইয়াছেন, কেহ কেহ বা জীবের কল্যাণের জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে রাখিয়া গিয়াছেন ; পরবর্ত্তী কালে কতকগুলি স্বার্থপর ও প্রতিষ্ঠালুব্ধ জনগণের হাতে পড়িয়া তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়া অকল্যাণ সমুৎপন্ন করিয়াছে। নির্ম্মলতা, অকলঙ্ক ও পবিত্রতার স্থানে কলঙ্ক ও অপবিত্রতার পূতিগন্ধ, আদর ও সম্মানের পরিবর্ত্তে ঘৃণা ও অনাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে সেই পবিত্রধর্ম্ম উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। যেমন বৈষ্ণব ও শাক্ত। ৺কাশীধামে শাক্তদের ভৈরবী চক্র, বৈষ্ণবদের শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ ; তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশ ও রাঢ়দেশ। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, কিশোরীভজা, ও সহজীয়া প্রভৃতি বহুবিধ শাখা প্রশাখায় দেশ উৎসন্ন যাইবার পথে অগ্রসর। ইহাদের ভিতরের বীভৎস কাণ্ড শ্রবণ করিলে লজ্জা, ঘৃণা ও দুঃখে নিশ্চয়ই ম্লান হইতে হয়। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে ধর্ম্মের নামে এমন জঘন্য ব্যাপার সংঘটিত হইলে সমাজের লোকেরা তাহার বিশেষ শাসন ও দমন চেষ্টা করিতেন। এখন আর সে সম্বন্ধে কোথাও সাড়া-শব্দ নাই ও শুনিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের ব্যভিচার আর কাহাকে বলে ?

মূর্ত্তিপূজার বহু পদ্ধতি আছে। এক প্রকার পদ্ধতি আছে যাহাতে কেবল বেদি প্রস্তুত করিয়াই তদুপরি পূজা হয়, কোন মূর্ত্তি স্থাপিত হয় না।

কার্ত্তিক মাসে ব্রজমায়ীরা প্রাতঃস্নান করিয়া যমুনার কূলে বালি দিয়া বেদি প্রস্তুত করিয়া কাত্যায়নীর পূজা করেন। পূর্ব্বে গোপীগণও ঐরূপ কাত্যায়নীব্রত করিতেন। শাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজার ঐরূপ নিয়ম লেখা আছে।

প্রঃ—গোপীগণ কাত্যায়নীব্রত কেন করিতেন ?

উঃ—কৃষ্ণলাভ করিবার নিমিত্ত। শক্তির কৃপা না হইলে ত কিছুই পাবার জো নাই।

প্রঃ—ব্রজমায়ীরা যে এখনও কাত্যায়নীব্রত করেন উহা কি ব্রজগোপীদের সেই সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—শ্রীরামচন্দ্র কি কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন ?

উঃ—হাঁ! শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপূজা করেন, বাল্মীকি রামায়ণে উহার উল্লেখ নাই। কালিকা পুরাণে আছে।

প্রঃ—শ্রীরামচন্দ্র সমস্তই জানিতেন; তিনি ভগবান্; তবে এরূপ কেন করিতেন ?

উঃ—এ যে নরলীলা। জানা, না জানার কথা এখানে খাটিবে না। যদি তিনি পূর্ণব্রহ্মের ভাবেই আচরণ করিবেন, তবে আর অবতীর্ণ হইলেন কেন ? সেখান থেকেইত সব করিতে পারিতেন তাঁহার অসাধ্য কি আছে ? যাঁহার ইচ্ছার উপর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ভর করে তিনি কি না করিতে পারেন ? যখন যে ভাবে অবতীর্ণ হন, তখন ঠিক সেভাবে আচরণ করেন। তাঁহার লীলা কি বুঝিবার সাধ্য আছে ? যখন লীলা অবলম্বন করেন তখন তাঁহার আপন মায়া আপনাকে আচ্ছন্ন করে; যেমন গুটি পোকা আপন সূতায় আপনি আবদ্ধ হয়।

প্রঃ—শ্রীরামচন্দ্র যে বালীকে বধ করেন এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন।

উঃ—যাহারা শাস্ত্র জানে না ও বুঝে না তাহারা'ই ওরূপ কথা বলে। উহাদিগের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নহে। যাহারা শাস্ত্র বিশ্বাস করে না তাহারা মনে নানা কুআলোচনা ও কুতর্ক করে। শাস্ত্রে যাহা

আছে তাহা সমস্তই বিশ্বাস করিতে হইবে। আধাআধি বিশ্বাস করিলে চলিবে না।

শাস্ত্রকর্ত্তারা কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। সমস্ত বিষয়েরই মীমাংসা করিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, যাঁহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে তাঁহারা বুঝিবেন। কোন শাস্ত্রগ্রন্থের আগাগোড়া বিশ্বাসপূর্ব্বক পাঠ করিলে উহার অর্থ বোধ হয়। যাঁহারা শাস্ত্র হইতে ঐরূপ কুতর্ক উত্থাপিত করেন, তাঁহারা ইংরাজী কুকুরের ও বাঘের গল্প পড়িবেন।

—o—

শুকদেব।

প্রঃ—শুকদেব কাহার গর্ভজাত ?

উঃ—বেদব্যাসের স্ত্রীর গর্ভজাত।

প্রঃ—তিনি কে ?

উঃ—এসম্বন্ধে বিশেষরূপে দেবীভাগবতে আছে। শুকদেব বৈবস্বত মন্বন্তরে চিরকুমার ছিলেন, আর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিবাহ করিয়া সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সন্তানাদিও হইয়াছিল।

একই ব্যক্তি দুই সময়ে দুই প্রকার আচরণ করিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সংসারাদি করিয়া কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বলিয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে এই বর নিয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন যে জন্মগ্রহণের পর তাঁহার মায়া থাকিবে না এবং জন্মগ্রহণ করিয়াই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

আগম ও নিগম।

আগম ও নিগম দুই তন্ত্র। আগমে মহাদেব বক্তা, পার্ব্বতী প্রশ্নকর্ত্রী। এবং নিগমে মহাদেব প্রশ্ন করেন, আর পার্ব্বতী উত্তর দেন। পার্ব্বতী

মহাদেবকে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। মহাদেব বলেন, "ইহার উত্তর আমি তোমাকে অতি গোপনে বলিব। তখন অন্য কোন প্রাণী তথায় থাকিতে পারিবে না।" তদনুসারে এক বনে গিয়া তাঁহারা সমস্ত প্রাণীদিগকে বাহির করিয়া দিলেন। দৈবাৎ একটি শুকপাখী তথায় লুকাইয়া থাকে।

মহাদেব বলিতে লাগিলেন—কিছুকাল পরে পার্ব্বতীর নিদ্রাবেশ হইল। তখন উক্ত শুকপাখী পার্ব্বতীর ন্যায় মহাদেবের বাক্যে সায় দিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে পার্ব্বতী জাগিয়া যতদূর শুনিয়াছিলেন তারপর হইতে শুনিতে চাহিলেন। মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এতক্ষণ শোন নাই?" পার্ব্বতী বলিলেন, "না, ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই নিদ্রাভিভূতা হইয়াছিলাম।" তখন মহাদেব বলিলেন, "তবে তোমার ন্যায় হুঁ, হুঁ কে করিল?" তখন খুঁজে দেখিলেন ঐ শুকপাখী লুকাইয়া শুনিয়াছে। তখন মহাদেব ত্রিশূল দিয়া তাহাকে মারিতে গেলেন। শুকপাখী প্রাণভয়ে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বেদব্যাসের পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করিল। মহাদেব ত্রিশূল লইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, বাহির হইলেই সংহার করিবেন।

বেদব্যাস স্তবস্তুতি করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন। তখন শুকদেবকে বাহির হইতে বলিলেন। শুকদেব গর্ভে দ্বাদশবৎসর ছিলেন। শুকদেব বলিলেন, "প্রভো, আমার ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই আর মায়া থাকিবে না যদি এই বর দেন, তবেই বাহির হইব।" মহাদেব দেখিলেন তাহা অসম্ভব। তৎপর বলিলেন, "হাঁ, তাই হবে। গোশৃঙ্গের উপর সরিষা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মায়া থাকিবে না।" শুকদেব জন্মগ্রহণ করিয়াই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিশ্বাসে কল্যাণ।

জগতে কাহাকে বা বিশ্বাস করা আর কাহাকেই বা অবিশ্বাস করা। ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠতাত। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভাই। পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবে এই স্থির করিয়া জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের বাসের জন্য নিরূপিত করিয়া দিলেন। পাণ্ডবগণ ইহার কিছুই জানিতেন না। বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় বলিলেন।

চরন্ মার্গান্ বিজানন্তি
নক্ষত্রে বিন্দতে দিশম্।

তৎপর পলায়নের জন্য নানাপ্রকার বন্দোবস্ত করিলেন। উক্ত গৃহ যে লাক্ষা, গন্ধক, পাট ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দুর্য্যোধন, শকুনি, ধৃতরাষ্ট্র ও কতিপয় ম্লেচ্ছ কর্ম্মকার প্রভৃতি জানিত। পোড়াইয়া মারিতে যে ব্যক্তি ঐ ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে আর পঞ্চপুত্রসহ এক নিষাদপত্নী মরিল। পাণ্ডবগণ রক্ষা পাইলেন।

পাণ্ডবগণ কিছু জানিতেন না। শেষে যখন বিদূর বলিয়া দিলেন তখন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই রক্ষা পাইলেন। লোকদিগকে বিশ্বাস করাই ভাল। বিশ্বাস করিলে যদি কোন বিপদ ঘটে, তবে তাহা হইতে ভগবান্ রক্ষা করেন। ভগবান্ রক্ষা না করিলে যুধিষ্ঠির শত চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিতেন না।

ব্রহ্মজ্ঞান।

সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব।

প্রঃ। নিষ্কাম ভক্ত যাহাঁরা, মহাপ্রলয়ে তাঁহারাও কি ভগবানে লীন হন?

উঃ। হাঁ, মহাপ্রলয়ে আর কি থাকে? ব্রহ্ম অদ্বয়। যত কিছু দেখা যাচ্ছে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই অদ্বয় ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়। তাই শ্রুতি বলেছেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ *প্রত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম*" "যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়েছে যাহা দ্বারা জীবিত রয়েছে, প্রলয়ে যাহাতে প্রবেশ করিবে তিনি ব্রহ্ম, তাহাকে জান। যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়েছে ইহা বলেছেন, কিন্তু যাহা কর্ত্তৃক হয়েছে এরূপ বলেন নাই। যাহা হইতে—যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট, স্বর্ণ হতে কুণ্ডল, সমুদ্র হতে তরঙ্গ, ঊর্ণনাভ হতে জাল—মৃত্তিকা এবং ঘট একই বস্তু, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, এইরূপ স্বর্ণ ও কুণ্ডল একই বস্তু, স্বর্ণের পরিণাম কুণ্ডল, ; তদ্রূপ সমুদ্র এবং তরঙ্গ একই বস্তু ; কিন্তু ঘটকে মৃত্তিকা বলা যায় না, ঘটকে ঘটই বল্‌তে হবে, তরঙ্গকে সমুদ্র বল্‌তে পারা যায় না তরঙ্গই বল্‌তে হবে ; যদিও একই বস্তু তবুও ভিন্ন দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্ম অদ্বয়, চরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই পরিণাম ; তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। কুম্ভকার এবং ঘট এই প্রকার দৃষ্টান্ত দেন নাই। যত কিছু সমস্তই ব্রহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, সমস্ত পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতা, আমার এই লাঠি খানি, আমার এই মালাটি, আমার এই অস্থি, মাংস আমার সব ব্রহ্ম। ইহাকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না হইলে কি সগুণ সাকার বুঝিবার সাধ্য আছে? সাকার কি এতই সোজা কথা? তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"বদন্তি তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে।"

এই অদ্বয় নির্গুণ পরব্রহ্ম আবার সগুণ সাকাররূপে লীলা করেন।

কাকভূষণ্ডি বলিয়াছেন—সেই নির্গুণ অদ্বয় পরমব্রহ্ম কি এই দশরথ তনয় রামচন্দ্র ? ইনি অযোধ্যায় দশরথের ঘরে রামরূপে লীলা করিলেন ?

সগুণ লীলাতত্ত্ব।

রামলীলা কাক ভূষণ্ডি } আঙ্গিনায় রামচন্দ্র হাতে করিয়া খাবার খাইতেছেন। তাহা হইতে কণিকা মাটিতে পড়িতেছে। কাক ভূষণ্ডি কুড়াইয়া খাইতেছে। রামচন্দ্র তখন বালক। কাকভূষণ্ডকে দেখিয়া একটু হেঁসে তাহাকে ধরবার জন্য শ্রীহস্ত বাড়াইয়া দিলেন। ভূষণ্ডি ভয়ে পলাইলেন। হাত তাহার পিছনে পিছনে গেল, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাকভূষণ্ড ঘুরে এলেন। শ্রীহস্ত তাহার পিছনে পিছনে রহিল। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পেয়ে পুনরায় দশরথের আঙ্গিনায় সে স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখে রামচন্দ্র একটু হাঁসলেন। তখন ভূষণ্ড তাঁহার শ্রীমুখে প্রবেশ করিলেন; তথায় দেখিলেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক, লোকান্তর, চৌদ্দ ভুবন, সমস্ত বর্ত্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কত শত রামলীলা হচ্ছে। নিজকে পর্য্যন্ত ঐরূপ একস্থানে দেখলেন। এ সব দেখে ভূষণ্ড বড় বিস্ময়ান্বিত হলেন। শ্রীরাম আবার একটু হাঁসলেন, ভূষণ্ড তখন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইলেন। প্রত্যক্ষ দেখলেন তবুও সন্দেহ দুর হ'ল না। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে কৃপা করলেন এবং নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও সগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন ভূষণ্ড সমস্ত বুঝিলেন। খণ্ড প্রলয়ে হয় ত একটিমাত্র ব্রহ্মাণ্ড লয় হইলে আরও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড থাকিয়া যায়। মহা-প্রলয়ে একমাত্র ব্রহ্ম থাকেন। ব্রহ্ম ভিন্ন যখন দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই নাই তখন তাহারা থাকে এরূপ বলা যায় না, থাকে না এরূপও বলা যায় না। ব্রহ্ম নিত্য সুতরাং তাহারাও নিত্য।

শক্তিপূজা।

কালীপূজা দুই রকম আছে। একরকম রাত্রে হয়, অন্যরকম দিবাভাগে হয়। তন্ত্রমতে রাত্রে, বৈদিকমতে দিনে দুর্গাপূজা হয়। হিমালয়ের ঘরে প্রথমে শ্যামবর্ণা দ্বিভুজা কালী জন্মগ্রহণ করেন, তারপর পার্ব্বতী।

গোঁসাই এক সময় বৈরাগ্য সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

কাহারও মৃত্যু ঘটিলে আত্মীয়েরা তাহার দেহ লইয়া গিয়া শ্মশানে দাহ করিয়া থাকে। তখন তাঁহাদের মনে স্বভাবের প্রভাবে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যোদয় হয়, কিন্তু বাড়ী আসিয়া কিছু দিন পরে আর তাহা থাকে না। এরূপ বৈরাগ্যকে গোস্বামিপাদেরা শ্মশান-বৈরাগ্য বলিয়াছেন।

২য় দৃষ্টান্ত, যেমন স্নেহের পুতলী পুত্রের বিয়োগে নিদারুণ শোকে জননী নিতান্ত অধীরা হইয়া পরিণামে সকলেরই মৃত্যু ভাবিয়া তখন তিনি স্বামী সহবাসে ইচ্ছা করেন না। কিছু কাল পরে স্বভাবের নিয়মে যখন পুত্র-শোকাগ্নি কতকটা নির্ব্বাণ হইয়া আসে, তখন আর তাহা মনে থাকে না। ইহাকেও গোস্বামিপাদেরা শ্মশান-বৈরাগ্য বলেন। ইহা স্বামী স্ত্রী উভয়েরই হইতে পারে।

৩য় দৃষ্টান্ত, গর্ভবতী নারী প্রসবের ক্লেশ মনে করিয়া আর স্বামী সহবাস করিব না মনে করেন। তিনি ত সন্তান প্রসবের কয়েক মাস পরে স্বভাবের নিয়মে সুস্থতা লাভ করতঃ তাহা ভুলিয়া যান। ইহাকে মর্কট-বৈরাগ্য বলে।

এরূপ দেখা যায় কোন ব্যক্তি সমাজে গর্হিত কার্য্য করিয়া সমাজের উৎপীড়নভয়ে দেশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন; কেননা দেশে থাকিতে গেলে সমাজের লোকেরা অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। এই প্রকার অবস্থায় পতিত হইয়া তাহার বৈরাগ্যোদয় হয়। তখন সে সকলকে পরিত্যাগ করিয়া দেশ ছাড়িয়া গিয়া ভেক্ লইয়া বাবাজী হয়; কিন্তু যেজন্য আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া

দেশত্যাগী হয় তাহা তখন আর তাহার মনে থাকে না। সে পুনর্ব্বার বৈষ্ণবী বা মাতাজী গ্রহণ করিয়া থাকে এবং আবার সংসার পাতিয়া বসিয়া সে সকল ভুলিয়া বসে। বাবাজীর সাজে সজ্জিত হওয়ায় লোকের নিকট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। ইহাকেও গোস্বামিপাদেরা মর্কটবৈরাগ্য বলিয়াছেন।

কীর্ত্তন দ্বারা প্রচারের বিশেষ সুবিধা; সুতরাং প্রচারের এমন শ্রেষ্ঠ উপায় জগতে আর কিছু এ যাবৎ আবিষ্কার হয় নাই। কীর্ত্তনের দ্বারা মানুষের হৃদয়, মন ও প্রাণে যে ক্রিয়া হয়, শুধু কথায় ও উপদেশে তেমনটী কখন হয় না। সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদেরা কীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু শুধু কীর্ত্তন লইয়া থাকিলে কখনও অবস্থা লাভ হয় না।

রথ মনুষ্যদেহ, তিন তলা। উপর তলায় সহস্রদল পদ্মে শ্রীশ্রীবামনদেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাজ করেন। বামন অবতারে ত্রিভুবন অধিকার করেন, এজন্য জগন্নাথ। এই রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। মধ্য তলায় সমস্ত দেবদেবী এক পদ্মে ও কুটীরে বিরাজ করেন। সমস্ত অবতার ও তাঁহাদের কার্য্য এখানে দেখা যায়। নীচের তলার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ তাঁহাদের পরিবারগণের সহিত বিরাজ করেন। বামনদেব রথে উঠিবামাত্র চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে থাকে। নীচের তলায় সিড়ি পড়ে। চারিদিক্ হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া ভিড় করেন। তখন কামক্রোধগণ পরিবার লইয়া পলায়ন করেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গাছা প্রকাণ্ড কাছি রথে বাঁধিয়া টানিতে থাকে। সুখ-দুঃখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুরের মন্দিরের নিকটস্থ হইলে কাছি খসাইয়া লয়। জগন্নাথদেবের মন্দিরটীও তদনুভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

গোস্বামী প্রভুর শেষ জীবনের ঘটনাবলী ও কতিপয় উপদেশ দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইল। আমি যতদূত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। আর দুই একটী অতীব প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট নানাশ্রেণীর লোক আগমন করিতেন এবং স্ব স্ব ধর্ম্মমত উল্লেখ করিয়া আলোচনা করিতেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সাধকদিগকে সমাদর করিতেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না বলিয়া এইরূপ করা সম্ভব হইয়াছিল। সময়ে সময়ে ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার নিকট যে প্রকার সঙ্গীত করিতেন তাহার কতিপয় নিদর্শন দিতেছি ঃ—

গৌরাঙ্গলীলা।

(১)

পরম করুণ পঁহু দুহুঁ জন নিতাই গৌরচন্দ।
সব অবতার সার শিরোমণি কেবল আনন্দ কন্দ॥
যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মেনে হইত কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দাবিপিনমাধুরী প্রবেশচাতুরী সার।
বরজ যুবতী রসের আরতি শকতি হইত কার॥
কহ কহ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন।
ভেবে দেখ ভাই ত্রিভুবনের মাঝে এমন দয়াল কোন জন॥

গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেল গলিয়া কেমনে সেধেছে সিধি।
বাসুদেব হিয়া কোন্ পাষাণ দিয়া কেন বা গড়ল বিধি॥

(২)

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, ন'দেপুরে অবতীর্ণ।
একাধারে বিরাজিত রাধাশ্যাম, গোরার মুখে সদা হরিনাম ;
আহা কিবা মনোলোভা, কোটি চন্দ্র যিনি শোভা,
আহা কিবা মুখ-আভা ত্রিজগতে ধন্য ধন্য।
চূড়াধড়া মোহন বাঁশী কে নিলে, গোরায় দণ্ড কমণ্ডলু দিলে,
যাচে প্রেম দ্বারে দ্বারে, বলে কে নিবি নে রে ;
হরিনামসুধা বিনে জীবের গতি নাই রে অন্য।

রাধাকৃষ্ণলীলা।

(১)

বিনোদনাগর রায় রে সখি বিনোদ নাগর রায়।
বিনোদ চূড়ায় বিনোদ বরিহা উড়িছে বিনোদ বায়॥
বিনোদ ললাটে বিনোদ চন্দন বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলী বিনোদ বিনোদ বাজে॥
বিনোদ গলে বিনোদ মালা বিনোদ বিনোদ দুলে।
কোন্ বিনোদিনী বিনোদ গাঁথনি গেঁথেছে বিনোদ ফুলে।
বিনোদ কটিতে বিনোদ ধটিতে বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর বিনোদ বিনোদ বাজে॥
কহে শ্যামানন্দ বিনোদ নাগর বিনোদ কদম্বতলে।
হেরি এ বিনোদে কত বিনোদিনী কলসী ভাসাল জলে॥

(২)

আর ত যাব না সখি যমুনার কাল জলে।
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নসলিলে॥
যাইতে যমুনার জলে, সে কালা কদম্বতলে,
হাসি হাসি বাজায় বাঁশী রাধা রাধা রাধা ব'লে॥
যে শুনিলাম শ্যামের বাঁশী, প্রাণ যে হ'ল উদাসী,
বিনিমূলে হই গে দাসী চরণকমলে॥

শ্যামাবিষয়ক।

(১)

তাই কালরূপ ভালবাসি, জগমনমোহিনী এলোকেশী।
যতগুলি সঙ্গী মায়ের তারা সবাই এক বয়সী;
তার মাঝে কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমাশশী।
কালবরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী;
হ'লেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি।
প্রসাদ ভনে আনন্দ মনে কালরূপে সব মেশামেশী;
একে পাঁচ পাঁচে এক মন ক'রোনা রেষারেষী॥

(২)

নটবরবেশে বৃন্দাবনে কালি হ'লি মা রাসবিহারী।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে একথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা গুণবতী রাধা আপনি পুরুষ আপনি নারী;
ছিল বিবসন কটি এবে পীতধটী এলোচুলে চূড়া বংশীধারী।
ঘন ঘন হাস ত্রিভুবনত্রাস, এবে মৃদুহাস ভুলে ব্রজকুমারী;
আগে শোনিতসাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনাবারি।

প্রসাদ ভাষিছে সুরসে ভাসিছে, জেনেছি জননি হৃদে বিচারি ;
মহাকাল কানু শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকলি বুঝিতে নারি।

গুরুতত্ত্ব।

(১)

আমার মন ভোলা চঞ্চলা হ'য়ে ঘুরে মোরো না।
গুরুপদ নেহাল কর অভাব রবে না।
আত্মতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব, জানলে পরে হয় মহত্ত্ব,
সব'র উপর গুরুতত্ত্ব তাও কি জান না।
ক্ষেপাচাঁদ বাউলের বাণী, ভজ গুরু চিন্তামণি,
গুরুপদ পরশমণি (অঙ্গ) ঠেকলে হয় সোণা।

(২)

কে দরদী ভাবের ভাবী আপনার খেয়ে আমার হবে।
বিশুদ্ধ প্রেম সেই জেনেছে নিহেতু যে জন ভাবে।
যে ছেড়েছে সুখের আশা, (তার) নিহেতু প্রেম ভালবাসা,
নিস্পৃহ তার নাইক আশা সেই আশায় ব'সে রবে।
চাতক ধর্ম্ম গোঁসাই দোষে, চার মেঘের জল খায় সন্তোষে,
ব্যভিচারী ধর্ম্ম হয় সে গ্রন্থকারে কয় তবে।
ক্ষেপাচাঁদ বাউলে বলে, ও প্রেম না সাধলে কি আপনি মিলে,
দরদিনীর কৃপা হ'লে জ্ঞানকপাট খুলে যাবে।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে যে, যিনি উপরিলিখিত গানগুলির ভাবের সহিত সমানভাবে যোগদান করিতেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায় ছিল না ; কিন্তু তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক স্ব স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত

মনে করিতেন। তিনি গেরুয়াবসন পরিধান এবং স্ফটিকের মালা ও জটাজূট ধারণ করিতেন; এই নিমিত্ত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় তাঁহাকে সন্ন্যাসী মনে করিতেন। তিনি তিলক ও তুলসীমালা ধারণ করিতেন; এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব মনে করিতেন। তিনি তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেন, এই নিমিত্ত রামায়েৎ বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে রামায়েৎ মনে করিতেন। তিনি রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতেন, এই জন্য শৈবগণ তাঁহাকে শৈব মনে করিতেন। তিনি গ্রন্থসাহেব পাঠ করিতেন, এই নিমিত্ত নানক-পন্থিগণ তাঁহাকে নানকপন্থী মনে করিতেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর মহাশয় তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেক সম্প্রদায় তাঁহাকে স্ব স্ব ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া দাবী করিতে পারেন; কারণ, তিনি প্রচলিত সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টান, মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকেও তিনি শিষ্য করিতেন।

প্রচলিত সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানকে তুচ্ছ মনে করিয়া থাকেন; আবার যাঁহারা জ্ঞানপথ আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিকে হৃদয়ের অসংযম বা দুর্ব্বলতা মনে করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব এই উভয়কেই সমান মর্য্যাদা অর্পণ করিতেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ বিচার করিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রথমতঃ জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ। আমরা সর্ব্বদাই প্রকাশিত বস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতেছি, কিন্তু প্রকাশকে ইন্দ্রিয়-গোচর করিতে পারি না। এইজন্য ভাষা প্রকাশকে প্রকাশ করিতে পারে না। সূর্য্য প্রভৃতি যত প্রকাশক বস্তু আছে তাহারা কেহই স্বপ্রকাশ নহে, জ্ঞানবস্তু বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব তাহাদিগকে প্রকাশ করিলে তবে তাহারা

প্রকাশিত হইতে পারে, নতুবা নহে। এ সম্বন্ধে শ্রুতি অতি পরিষ্কাররূপে ঘোষণা করিতেছেন ;—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"

অর্থ।

সূর্য্য, চন্দ্র, তারা তাঁহার (আত্মার) প্রকাশকরূপে দীপ্যমান নহে ; এই সকল বিদ্যুৎ সেখানে দীপ্তি দিতে পারে না, এই অগ্নি কোথা হইতে পারিবে ? আদিতে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন, তাহার পর সকলে প্রকাশ পাইতেছে ; তাঁহার দীপ্তিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দীপ্যমান হইতেছে।

এতদ্দ্বারা বোধগম্য হইবে যে, এই প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তুর পশ্চাদ্ভাগে অধিষ্ঠানরূপে, ভিত্তিরূপে রহিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ;—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

অর্থ।

তত্ত্ববিদ্গণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীধর স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, ঔপনিষদগণ অর্থাৎ জ্ঞানমার্গিগণ এই তত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম বলেন, হৈরণ্যগর্ভগণ অর্থাৎ যোগিগণ ইহাঁকে পরমাত্মা বলেন এবং সাত্বতগণ অর্থাৎ ভক্তগণ ইহাঁকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন। ইনি যখন্ নিরুপাধি অখণ্ড জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হন, তখন ইহাঁর

নাম ব্রহ্ম, যখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে প্রকাশিত হন, তখন ইহাঁর নাম পরমাত্মা, এবং ইনি যখন প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে লীলাবিহারিরূপে প্রকাশিত হন, তখন ইহাঁর নাম ভগবান্। ইহাতে ইহাই স্পষ্ট অনুভূত হইবে যে, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন বস্তু নহেন, একই বস্তু; কেবল সাধকের ধ্যানভেদে ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ তাঁহারা সাধনপথে চলিতে চলিতে কোন একটী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়েন এবং তাহার ফলে নানা মতবাদ, দলাদলি প্রভৃতি আসিয়া পড়ে।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ এই তত্ত্ববস্তুসাক্ষাৎকার করিয়া বেদাদি শাস্ত্রে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ইহাঁকে সচ্চিদানন্দ বলিয়াছেন। এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের আলোচনায় আমরা ভক্তি ও প্রেমের সন্ধান পাইয়া থাকি। সত্তা তিন প্রকার,—প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক। রজ্জুতে সর্পের, শুক্তিতে রজতের, অথবা মরুভূমিতে মরীচিকার অস্তিত্বকে প্রাতিভাসিক সত্তা কহে। যতক্ষণ ভ্রম, ততক্ষণ সর্পাদির অস্তিত্ব; ভ্রম চলিয়া গেলে সর্পাদির অস্তিত্ব থাকে না। এই যে সম্মুখে মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা, নদী প্রভৃতি অসংখ্য বস্তু দেখিতেছি এবং ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, এই অস্তিত্বের নাম ব্যাবহারিক সত্তা। যতক্ষণ নির্ব্বিকল্প সমাধি না হয়, ততক্ষণ ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, সমাধি হইলেই ইহাদের অস্তিত্ব চলিয়া যায়। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া গেলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহার সত্তাই পারমার্থিক সত্তা। যাঁহার এইরূপ সত্তা তিনি সৎ। চৈতন্য স্বপ্রকাশ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশী ইহাঁকে স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ বলিয়াছেন। ইহাঁরই নামান্তর চিৎ।

আমরা সচরাচর যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহা আপেক্ষিক। একজনের যাহা সুখ অপরের তাহা দুঃখ; আবার একজনের যাহা দুঃখ,

তাহা অপর একজনের সুখ। যদি এইরূপ সুখ দুঃখের পারমার্থিক সত্তা থাকিত, তাহা হইলে একই বস্তু যুগপৎ একজনের সুখদায়ক ও অপরের দুঃখপ্রদ হইতে পারিত না। অভাববোধের নাম দুঃখ; সুতরাং সুখকেও দুঃখ বলা যাইতে পারে; কারণ, সংসারিক কোন সুখই ধারাবাহিক তৃপ্তি দিতে পারে না। অধিক সুখের জন্য লালসা জন্মে; সুতরাং সুখে অভাব বোধ থাকায় উহাও দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখানে কোন অভাববোধ নাই, সেখানে পরমা তৃপ্তি বা চিরশান্তি। এই শান্তির নাম আনন্দ।

একমাত্র তত্ত্ববস্তুই আছেন, আর কিছুই নাই; সুতরাং ইনি সৎ। ইহাঁতে কোন অভাব নাই; কারণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইহাঁর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহাঁতে চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে; এইজন্য ইনি আনন্দময়। অতএব সচ্চিদানন্দ তিন বস্তু নহে, একই বস্তুর অখণ্ডস্বরূপ। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি অসংখ্য জ্ঞান ঔপাধিক। যতক্ষণ ঘট পট, ততক্ষণ জ্ঞানের ভিন্নতা; ঐ সকল উপাধি নষ্ট হইলেই এক অখণ্ড চৈতন্য। যাঁহারা জ্ঞানমার্গে সাধন করেন, তাঁহারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই একই চৈতন্য অবিলুপ্তভাবে বিরাজিত আছেন ইহা অনুভব করিয়া তুরীয় নির্বিকল্প সমাধিতে স্থিতি করতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন। চিৎ বা চৈতন্য হইতে যেরূপ অসংখ্য জ্ঞানের প্রকাশ হয়, আনন্দ হইতে সেইরূপ অসংখ্য ভাবের প্রকাশ হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন;—

"সৎ, চিৎ, আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

তিনি কৃষ্ণের স্বরূপনিরূপণপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

"কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

অর্থ।

কৃষ্ ধাতুর অর্থ সত্তা ও ণ প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ। এই উভয়ের সহিত অভিন্ন পরব্রহ্ম অর্থাৎ অখণ্ড চৈতন্য কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকার্থের সাহায্যে পূর্ব্বোদ্ধৃত পয়ারের অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সৎ হইতে সন্ধিনী শক্তি বা রচনা শক্তি, আনন্দ হইতে হ্লাদিনী অর্থাৎ সমস্ত ভাবের মূলীভূতা শক্তি এবং চিৎ হইতে সম্বিৎ বা জ্ঞানশক্তির প্রকাশ হইয়াছে।

যাঁহারা ভক্তিপথ আশ্রয় করেন, তাঁহাদেরও এই সচ্চিদানন্দস্বরূপই একমাত্র লক্ষ্য। জ্ঞানীরা যেমন জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া সাধন করেন, ভক্তেরাও সেইরূপ ভাবকে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন। জ্ঞানীর যেরূপ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটী থাকে, ভক্তেরও সেইরূপ উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা এই ত্রিপুটী থাকে। ভক্তগণ তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা ভগবানে কোন একটী ভাব অর্পণ করেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ ভাবের কোন একটী ভাবে ভক্ত ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। তত্ত্ববস্তু যেমন জ্ঞানীর নিকট অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন, সেইরূপ তিনি ভক্তের নিকট একজন ব্যক্তি অর্থাৎ পরমাত্মীয়রূপে প্রকাশিত হন। ভক্তের ধ্যানভেদে ভগবান্ অসংখ্য মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন ;—

"ত্বং ভক্তিপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আসম্বে শ্রুতেক্ষিতপথো নমু নাথ পুংসাম্।
যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"

অর্থ

হে নাথ, শ্রুতি তোমার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। যাঁহারা বেদজ্ঞ তাঁহাদের ভক্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃৎপদ্মে তুমি অবস্থিত থাক। আর যে সকল ভক্ত বেদেজ্ঞ নহেন, হে উরুগায়, (যিনি প্রভূতরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন) তাঁহারা ধ্যানযোগে তোমার যে যে মূর্ত্তি ভাবনা করেন, তুমি তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই সেই মূর্ত্তি প্রকটিত কর।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ;—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থ।

হে অর্জ্জুন, যাঁহারা যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হন, আমি তাঁহাদিগকে সেই ভাবে ভজনা করি; মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পন্থাই অনুসরণ করিতেছে।

এই সকল শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ভগবান্ ভক্তের ভাবানুসারে অপ্রাকৃত অর্থাৎ অপাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া তাঁহার ভাবের প্রতিদান করিয়া থাকেন। যে পথে ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহাই ভক্তিপথ। নারদভক্তিসূত্রে ভক্তির এইরূপ লক্ষণ আছে :—

"তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্‌বিরহে পরমব্যাকুলতেতি"

অর্থ।

অখিল আচার তাঁহাতে অর্পণ করা অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যের ফল ভগবানে অর্পণ করা এবং তাঁহার বিরহে অর্থাৎ ভগবানের বিরহে পরম ব্যাকুল হওয়াই ভক্তির লক্ষণ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ঃ—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥"

অর্থ।

হে অর্জ্জুন, যে কার্য্য কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, সে সমস্তই অর্থাৎ তাহার ফল আমাকে অর্পণ কর।

যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবযোগে ভগবানের ভজনা করেন। শান্ত ও দাস্য ভাবে কিছু সঙ্কোচবুদ্ধি থাকে, এইজন্য উহা ভক্তির অন্তর্গত। যখন সঙ্কোচবুদ্ধির লয় হইয়া যায়, তথাবিধ ভাবকে প্রেম কহে। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে প্রেমের অধিকার। যখন প্রেমিক ভক্ত সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তিনি ভুবনমোহন অতিমনোহর আনন্দময় ভগবান্‌কে লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। ভগবান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানী জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া চৈতন্যস্বরূপ সাক্ষাৎকার করতঃ সচ্চিদানন্দে নিমগ্ন হন। ভক্তও ভাবকে আশ্রয় করিয়া আনন্দস্বরূপ সাক্ষাৎকরতঃ সচ্চিদানন্দে নিমগ্ন হন। সচ্চিদানন্দ তিন বস্তু নহে, একই বস্তু, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব এই পরম রহস্য হস্তামলকবৎ অধিগত করিয়াছিলেন বলিয়া সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন, অথচ স্বয়ং অসাম্প্রদায়িক ভূমিতে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন।

জ্ঞানমার্গীর প্রয়াস কিসে দ্বৈত বিলুপ্ত হয়; ভক্তের প্রয়াস কিসে ভগবানের অসংখ্য বিচিত্র লীলারস সম্ভোগ করা যায়। ভক্তিপথে যেরূপ নানাবিধ লীলাবৈচিত্র দর্শন ও সম্ভোগ করা যায়, জ্ঞানপথে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্রহ্মা কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিতেছেন :—

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপিহ্যুপনিষদ্‌দৃশাম্‌॥"

অর্থ।

তোমার মূর্ত্তিসকল একরস এবং একমাত্র সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ। যাঁহারা উপনিষদ্‌দৃক্‌ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌, তাঁহার তোমার ভূরি মাহাত্ম্য অর্থাৎ অসংখ্য লীলাবৈচিত্র স্পর্শও করেন নাই।

প্রেম সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই ত্রিবিধ রূপে প্রকটিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেব অধিকাংশ সময় একাসনে সমাধি-নিমগ্ন থাকিতেন, এবং সময়ে সময়ে সংকীর্ত্তনে লীলারস সম্ভোগকালে আনন্দে বিহ্বল হইতেন। লক্ষণ নির্দ্দেশ দ্বারা প্রেমকে পাঠকের হৃদয় গোচর করা যায় না, এইজন্য কয়েকটী মহাজনী পদ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি পাঠ করিলে প্রেমের কিঞ্চিৎ আস্বাদন সম্ভব বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা।

(১)

নদীয়া উদয়গিরি শশধর গোরা।
উদয়া কনয়া তনু বয়স কিশোরা॥
রাধার বরণ ধরি বিভাবিত চিত।
সে গুণে গাঁথল তনু পুলকে পূরিত॥

রাধা-অনুরাগে আঁখি অরুণ কমল।
সে রস অমিয়া ধারা ঝরে প্রেমজল॥
সে নাট নাচয়ে গোরা না জানে আপনা।
সে রস রঙ্গিয়া মনে মরম বেদনা॥
রাধা গানে গায় পঁহু সে হাসিতে হাসে।
সে ভাবে ঠেকিল মনে যদুনাথ দাসে॥

(২)

যো শচীনন্দন, ভুবন-আনন্দন, করু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুককেলি কলারসে নিমগণ, সতত রহত মুখে হাস॥
সজনি, ইহ বড় হৃদয়ক তাপ॥
অব সোই বিরহে বেয়াকুল অন্তর, করতহি কতই প্রলাপ॥
গদগদ কহত, কাঁহা মঝু প্রাণনাথ ব্রজজন নয়ন আনন্দ।
কাঁহা মঝু জীবন-ধারণ-মহৌষধি, কাঁহা মঝু সুধারস কন্দ॥
পুন পুন ঐছন, পুছত নিজজনে, রোয়ত করত বিষাদ॥
রাধামোহন দুখী, ভকত বচন দেখি, পায়ে করত অনুবাদ॥

(৩)

আরে মোর গৌর কিশোর।
নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি,
মনের ভরমে পঁহু ভোর॥
ক্ষণে উচ্চ স্বরে গায়, কাহে পঁহু কি সুধায়,
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে দেহ কম্প, ক্ষণে-ক্ষণে দেই লম্ফ,
কাঁহা পাঁউ যাঁউ কার সাথ॥

ক্ষণে ঊর্দ্ধ বাহু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি,
ক্ষণে ক্ষণে করত প্রলাপ।
ক্ষণে আঁখি যুগ মুদে, হা নাথ বলিয়া কাঁদে,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ ॥
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌর হরি,
রাধার পীরিতে হইল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে,
বঞ্চিত হৈনু মুঞি কেন ॥

(৪)

আরে মোর গৌর কিশোর।
সহচর কাঁধে পঁহু ভুজযুগ আরোপিয়া,
দশমী দশায় ভেল ভোর ॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে, মুখে বাক্য নাহি সরে,
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোণার গৌরহরি, কাহে হায় মরি মরি,
তন্তুক দোসর ভেল দেহ ॥
থির নয়ন করি, মথুরার নাম ধরি,
রোয়ে পঁহু হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে, গৌরাঙ্গ এমন কেনে,
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা।

(১)

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
বচন অমিয়া রস অনুখন শুনলু
শ্রুতিপথ পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাঁহু না পেখি।
কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিকে একি।

(২)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥
সই লো কি আর বলিব।
যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি করিতে পারোঁ যত মনে উঠে॥

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহুঁ লহুঁ হাসে পঁহু পীরিতির সার।
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখীসঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলকে ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

৩

দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় সে মরিয়া॥
জল বিনু মীন কবহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দৈয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না অহৈসে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

৪

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপগোয়ালিনী হাম অতি দীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মম নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমার বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম
তোমার চরণ দুখানি॥

৫

কীর্ত্তনের সুর—ঝাপতাল।

যেওনা যেওনা নাথ রাখ রথ মিনতি করি।
তুমি পূর্ণিমক চাঁদ বিনে আঁধার এ ব্রজপুরী॥

তুমি পূর্ণমিক—(আজ ব্রজ আঁধার হ'লো রে)
একবার দাঁড়াও হে (ভাল ক'রে তোমায় দেখি)
যত যুবতী গোপিকারে, ভাসারে অকূল পাথারে
(ওহে আর তাদের কেহ নাই) তারা তোমা বই আর জানেনা হে।
কোথা যাও ব্রজ পরিহরি প্রাণ হরি (প্রাণ হরি হে প্রাণ হরি)
একবার দাঁড়াও হে ভাল ক'রে তোমায় দেখি)
তোমার অন্তরে কি নাই দয়া, পাষাণে বেঁধেছে হিয়া
রাধা রথতলে কাঁদিতেছে ব'লে হরি রাখ হরি।
(রাখ হরি হে রাখ হরি।)

শেষোক্ত গানটী একটী গুরু ভ্রাতার রচিত। যদিও এটী কৃষ্ণলীলার গান, তথাপি এ গানটীর একটী রহস্যার্থ আছে। গোস্বামী প্রভু যখন পুরী যাত্রা করেন, তখন ভক্তগণের প্রগাঢ় বিরহ বেদনা এই গানটী প্রকারান্তরে প্রকাশ করিতেছে।

যে সকল মহাজনী পদ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে যে অলোকসামান্য সুগভীর প্রেমের সমাচার আছে তাহা পাঠক মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। গোস্বামী প্রভু এই লীলারসসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইতেন। কত প্রকার অনুভাব যে প্রকাশ হইত, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে যেন শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাঁহারা তাহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন ধন্য হইয়াছে।

গোস্বামী প্রভুর রচিত কয়েকটী গান গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত আর কয়েকটী গান বঙ্ক বাবুর পুস্তক ও অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১

তিনি পরমাত্মা পরম ধন, পরব্রহ্মে ভুল না রে মন।
ব্রহ্ম নামটী বলরে রসনা, কথা শোন্ রে মন।
এই বেলা দিন ত ব'য়ে যায়।
ঐ দেখ্ শিয়রে বসিয়ে শমন,
করিছে বন্ধনেরি আয়োজন।

২

ও দিন গেল দয়াল বল না মন রসনা।
ও মন দয়াল নাম সাধন হ'লে শমন ভয় আর রবে না।
ওরে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার,
যদি ভবে হবে পার,
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে কুপথগামী হ'য়ো না।
ওরে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কার নয়;
মিছে আমার আমার আমার বল আমার কে তা চিন্‌লে না।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান।
ভুলনা তাঁহারে মন ভুলনা কখন।
রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বলসুতে নাহি করেন গমন।
হৃদয় কপাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি,
দাও প্রীতি অঞ্জলি কর দরশন।

৪

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অবশ্য মরিতে হবে কিছু দিনান্তর।
হলে দেহ প্রাণ হীন, কোথা রবে অভিমান,
ভূমিতে পড়িয়ে রবে হ'য়ে শবাকার;
পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন,
গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার।
এখন প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথগমন,
কুৎসিতভাবে দর্শন নরনারীচয়;
সর্ব্বলোক অপমান, অনাথ-অর্থহরণ,
পরনিন্দা পরপীড়া কর পরিহার।

৫

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ,
হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে।
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ পথ পরিহরি,
কেমন প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে।
কোথা হে দীনশরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপযাতনা ঘুচাও হে।

৬

আমার এই বাসনা করহে পূরণ,
ওহে অনাথনাথ অধমতারণ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি,
হৃদয় মন্দিরে সদা দেও দরশন।

না চাহি বিষয় সুখ, চাহি তব প্রেম-মুখ
তা হ'লে যাইবে দুঃখ আনন্দে হব মগন

৭

নির্ম্মল হইবে যদি মুখে দয়াল বল রে,
নির্ম্মল হইবে যদি (রসনা রে)
প্রভুর নামরসানে মাজ হৃদি রে।
ঐ দয়াল নাম সুধাসিন্ধু,
এ নাম কর্ণে লও রে এক বিন্দু (ওরে রসনা)
ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ, শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ,
(ওরে রসনা)।

৮

শান্তি কোথা আছে আর অমৃতসাগর বিনা ;
ভুলে সে অমৃতে যেই, বিষয়বিষের কুণ্ডে,
করে শান্তি-অন্বেষণ ভ্রমবুদ্ধি তার।
ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হ'য়ে শান্তিহারা ;
অমৃত-সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি,
সকলের তরে আছে মুক্ত তাঁর দ্বার।

পুরবী—আড়া।

প্রেমগিরিকন্দরে যোগী হ'য়ে রহিব।
আনন্দ নির্ঝরবারি দুহাতে পান করিব।

মিটাতে বিষয় তৃষা, সংসার কূপজলে,
আর যাব না—
হৃদয়-করঙ্গ ভরি শান্তিবারি পান করিব।

১০

ভৈরোঁ—একতালা।

বৃন্দাবিপিনে মঙ্গল-আরতি হের রে নয়ন-আনন্দে।
মঙ্গল আরতি হ'তেছে, নাচিছে সখীবৃন্দে।
কুঞ্জ কুঞ্জ হ'তে ধাইছে সবে হেরিতে শ্রীগোবিন্দে।

গোস্বামী প্রভুর কোন কোন শিষ্য তাঁহার সম্বন্ধে গান রচনা করিয়াছেন। কতিপয় গান পাঠকগণকে উপহার দিতেছি ঃ—

১

তুঁহি ভক্তসখা জগবন্দন ও, তুঁহি যোগিজন চিতরঞ্জন ও।
তুঁহি মুনিজন মনোমোহন ও,
তুঁহি দীনদরদত্নখভঞ্জন ও,
তুঁহি শরণাগতজন প্রতিপালন ও।
তুঁহি তুঁহি নাথ ভুবনৈকবন্ধু,
করুণৈকসিন্ধু দীনবন্ধু দয়াঘন ;
আশ্রিতজন দুখহরণ ও,
চরণাশ্রিত জন ভয় হরণ ও।
অধম তারণ কারণ ও, বিচিত্র দিব্য তনু ধারণ ও ;
পীতাম্বর জটাজুট শোভন ও,
বর যাচে চিত তুয়া চরণ ও।

২

বেহাগ—একতালা।

জয় জয় হে দেব অভীষ্ট জয় তব ভক্ত একান্ত নিষ্ঠ,
যেন প্রাণ মন চির আকৃষ্ট, আবিষ্ট হইয়া তোমাতে রয়।
তব পাদপদ্মে মতি যার নাথ, সংসারে শমনে কিবা তার ভয়।
মীমাংসিত সেই অমিয় বচন, শ্রবণ মানস প্রাণ রসায়ণ,
মধুর শ্রীমূর্ত্তি অপূর্ব্বদর্শন করি স্মরণ হিয়া আপনি জুড়ায়।
সংকীর্ত্তনফল সাক্ষাৎ কীর্ত্তনে, মিটেছে কুতর্ক হেরিয়া নয়নে,
রাধাপ্রেমমত্ত ভঙ্গিমনর্ত্তনে, রসবরিষণে স্বয়ং রসময়।
জটা দিয়ে কারে করহে আরতি, কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণতি কাকুতি,
মরি মরি এযে গুপ্ত পীরিতি সেই মাধুর্য্যরতির শুভ পরিচয়।
অকড়ম চক্রে নাহি মন্ত্রোদ্ধার, সম্বৎসর শিষ্যপরীক্ষাবিচার
সেই অনর্পিত প্রেমে শক্তির সঞ্চার, অধিকারী করি আপনি লয়।
সুলভ সুমার্গে শক্তির প্রভাবে, জীব শিবতুল্য সর্ব্বার্থ সম্ভবে,
দুরারাধ্যসিদ্ধ ব্রজগোপীভাবে হেসে কেঁদে নেচে গেয়ে পড়ে পায়।
চোখের কাছে মাণিক নাচিতে লাগিল, যে নেত্র মিলিল সকলি মিলিল,
বহিরঙ্গে সে মূক বধির সমতুল, নীরব প্রারব্ধ ভোগ অপেক্ষায়।
ধন্য কলিযুগ গূঢ় অবতারে, কত কৃপা তব পতিত উদ্ধারে,
রাধাঋণ বুঝি শুধিলে এবারে ধন্য ধন্য ধন্য গোরা দিগ্‌বিজয়।
কত বাচালতা তব সন্নিধানে, কত বাতুলতা বহিরালোচনে,
কত ত্রুটি যে ভজনে সাধনে, অপরাধ ক্ষমা কর দয়াময়।
নিত্যধামে তব ভক্তগণ সঙ্গে, গাইব নাচিব প্রেমের তরঙ্গে,
এই ভাবে যাবজ্জীব নিরখি শ্রীঅঙ্গে, তোমায় প্রসঙ্গে যেন দিন যায়॥

বাউলের সুর—একতালা।

তোমরা কি কেউ দেখেছ
আমার সেই হারাধনে।
ও কেউ জানে না, কেউ বুঝে না, রে,
অন্ধের কত জ্বালা নয়নমণি বিনে॥
মানুষতনু-আশ্রিত, পরমানন্দ অদ্ভুত,
মনোমত শ্রীসংযুত ;———
তাঁর প্রসন্ন মুখ অমিয় হাসি,
স্বরে ক্ষরে সুধারাশি,
শোভে জটাজূট শিরে, দণ্ড কমণ্ডলু করে,
আহা আলা করে অরুণ বসনে।
প্রাণারাম কি এক স্বরে,
হরি বলে নৃত্য করে,
শ্রীপদভরে কলুষ হরে ;—
এমন দরদী ত আর হবেনা,
জীবের জন্য কেউ কাঁদ্‌বে না,
তড়িৎ এল আর গেল,
কি দিল প্রাণ নিল,
পথের কাঙ্গাল কাঁদে
তাই রাত্রি দিনে॥

৪

বেগাহ্—একতালা।

স্মর রে রূপ অতি অপরূপ
প্রাণ মন রসায়ণ।
তব কৃপালব গোলোকবৈভব
ভবকারাগারমোচন॥
অতি সুশীতল চরণ কমল,
যার ছায়ে নিভে ভবদাবানল,
ভকত ভ্রমর পিয়ে পরিমল
সুখের সায়রে মগন ;
কাটিতে গৈরিক অতি পরিপাটী,
বিনোদ শ্যামের যেন পীতধটী,
সান্ধ্যগগনে যেন শ্যামঘনে
কনক বিজুরী মিলন।
দক্ষিণ বাহুতে বলয় শোভিছে,
শ্রীবক্ষে মালিকামালা দুলিছে,
ললাটে চন্দনতিলক শোভিছে
কটাক্ষ ভুবনমোহন ;
অধরে সুস্মিত অমিয়ার ধার,
চিদানন্দ তনু প্রেমের পাথার,
আদি গুরুমূর্ত্তি শিরে জটাভার,
সারাৎসার বিশ্বপাবন ;
প্রেমে ঢল ঢল শ্রীমুখমণ্ডল,
অকলঙ্ক শশী করে ঝলমল,

তাহে ঝলকিছে লাবণ্য তরল,
বিষয়গরল নাশন ;
নৃত্যামোদরসে রসিকশেখর,
পিককণ্ঠ জিনি বাণী মনোহর,
ভাবভূষণে-পূর্ণ কলেবর,
জগজনচিতরমণ ।

প্রভুর অন্তর্ধানের পর পুরী সমাধি-আশ্রমের কিছু বিবরণ আছে। তাহা বৈষয়িক ও অপেক্ষাকৃত নীরস বলিয়া পরিশিষ্ট নামে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে মুদ্রিত হইল। যদি কেহ ইতিহাসরসজ্ঞ থাকেন, তিনি অবসর মত পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। প্রভু আমাদের ক্ষীণ শক্তিকে যতদূর চালাইলেন, সে ততদূর চলিল। এক্ষণে শক্তি নিঃশেষ হইয়াছে ; অতএব বিনীত হৃদয়ে পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট বিদায় লইলাম।

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুংতং নমামি॥"

হরিঃ ওঁ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর দিকে মোহন্তজীর স্থানটী সমাধির জন্য আমার মনোনীত হয় এবং আমি মুন্সেফ বাবুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত কুলমণি চৌধুরী মহাশয়ের সমীপে যাই একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আমরা উক্ত প্রস্তাব করাতে অমনি শ্রীযুত কুলমণি চৌধুরী মহাশয়ের লোক মোহন্তকে ডাকিতে গেল। মোহন্ত সংবাদ পাইয়া আসিলেন। তাঁহাকে উহাঁরা ঐ স্থান বিক্রয় করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ বিক্রয় করিব। তখন তাঁহাকে মূল্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন ৮০০৲ আট শত টাকা মান (এক একার জমি)। তখন পুঃ ইঃ শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু মোহন্তজীকে বলিলেন, আপনার সহিত মূল্য স্থির করিতে আমরা ইচ্ছা করি না ; কেন না, তাহাতে অনেক কথার কাটাকাটি করিতে অধিক বিলম্ব হইবে ; সুতরাং আমরা ইচ্ছা করি, উভয় পক্ষে শ্রীযুক্ত কুলমণি চৌধুরী মহাশয়কে মান্য করিয়া লইলে তিনি যে মূল্য স্থির করিয়া দিবেন তাহাতেই উভয় পক্ষ সম্মত হইবেন। কেননা তাঁহারা রোজ দুই শত পাঁচ শত বিঘা জমি খরিদ বিক্রয় করেন, তিনি মূল্য স্থির করিয়া দিলে তাহাই স্থির হইবে। তখন মোহন্তজী সে কথায় সম্মত হইয়া চৌধুরী মহাশয়ের নিকট গেলেন। কিছুকাল পরে মূল্য স্থির হইলে তাঁহারা আসিয়া আমাদিগকে মূল্যের কথা বলিলেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় বলিলেন ৩৫০৲ সাড়ে তিন শত টাকা মান সাব্যস্ত হইল। বায়নানামা লেখা পড়া করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মুন্সেফ বাবু আমাকে বায়নার টাকা আনিতে বলিলেন। তখন বেলা প্রায় ১০টা। আমি বায়নার টাকা আনিতে বাসায় চলিলাম। একবার ঘরে প্রবেশ করিয়া

গোস্বামী মহাশয়ের দেহ দর্শন করতঃ বুক ফাটিয়া কান্না পাইতে লাগিল। তখন তাঁহার মুখের জ্যোতি এমনই উজ্জ্বল হইয়াছে যে তিনি দেহে থাকিতেও তদ্রূপ কখনও দেখিয়াছি কিনা মনে হয় না।

তথা হইতে বাহির হইয়া যোগজীবনের নিকট বায়নার টাকার জন্য গেলাম এবং যোগজীবনকে ঐ স্থানই সমাধির জন্য সাব্যস্ত হইল বলিলাম। যোগজীবন শুনিয়া বলিল, তা বেশ হইয়াছে, বেশ করিয়াছেন। আমি বলিলাম এখন বায়নার টাকা দেও, বায়নানামা লেখা পড়া হইবে। যোগজীবন বলিল কত টাকা দিব? আমি বলিলাম সাড়ে তিন শত টাকা একরের মূল্য স্থির হইয়াছে। এখন দুই শত টাকা দাও। সে আমাকে দুই শত টাকা দিল। তখন আমার ও মুন্সেফ বাবুর মনের ভাব সমাধির জন্য এক একরের অধিক জমি কিছুতেই লওয়া হইবে না। এখন হাতে টাকা থাকিতে বায়নার সময় যত অধিক টাকা দিয়া রাখিতে পারি তাহাই ভাল। এই মনে করিয়া টাকা কোঁচার কাপড়ে বাঁধিয়া যোগজীবনের নিকট হইতে বাহির হইলাম। গোস্বামী মহাশয়ের ঘরের নিকটে সদর দরজার সন্মুখে যে স্থানে দ্বারবান্ থাকিত, সেই স্থানে আসিবামাত্র কে যেন আমার ভিতরে তখন বলিয়া দিল—মনে হইল তাইত, যে স্থানে গোস্বামী মহাশয়ের দেহ সমাধিস্থ করিব, তাহার চতুর্দ্দিকে যদি অপরের স্থান থাকে, তাহা হইলে ত বড় উদ্বেগের কারণ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে তথায় মুসলমান, মদের দোকান ও বাউরী প্রভৃতি নানা জাতি ও নানা শ্রেণীর লোক রহিয়াছে। চারিদিকে অপরের জায়গা থাকিলে আরও কত কি উদ্বেগের কারণ হইবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল চিন্তা আমার মাথায় ঢুকিল। আমি টাকা লইয়া চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় গিয়া শ্রীযুক্ত মুন্সেফ বাবুকে বলিলাম, মহাশয়, একটী কথা, বায়নানামা লিখিত পড়িত করিতে এই সর্ত্তটী তাহাতে লেখাইয়া লইবেন। তিনি বলিলেন কি সর্ত্ত? আমি তাঁহাকে বলিলাম,

বায়নানামার লিখিত চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থান যাহার প্রতি একর যে মূল্য সাব্যস্ত হইল যদি আমরা সমস্ত স্থানটাই লই, তবে যেন মোহন্তজী ঐ হারে উহা আমাদিগকে দিতে বাধ্য হন। ইহা শুনিয়া মুন্সেফ বাবু বলিলেন, তাহা হইলে যে অনেক টাকা হইবে?' আমি বলিলাম, তা সত্য, উপরোক্ত কারণটা তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বলাতে তিনি বুদ্ধিমান্ লোক সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তখন বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়কে ঐ ভাবে বায়নানামা লিখিত পড়িত করিতে বলিলেন। তিনি তদ্রূপ বায়নানামা আট আনার ষ্টাম্পে লিখিত-পড়িত করিয়া দুই শত টাকা বায়না বাবদে মোহন্তকে দিয়া তাঁহার দস্তখত করাইয়া লইলেন এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সকলকে বায়নানামায় সাক্ষী করিয়া লইলেন। তৎপর বায়না-নামা আমাকে দিলেন। সর্ব্বত্রই প্রজাবসতি; কোন্ স্থানে মোহন্তজী সমাধির স্থান দিবেন তাহা দেখাইয়া দিতে তিনি আমাকে লইয়া স্থান দেখাইতে চলিলেন। আমি মনে করিলাম সমাধির স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে একজনকে সঙ্গে লওয়া ভাল। এই ভাবিয়া বায়নানামা লইয়া যোগজীবনের নিকটে গেলাম। বায়নানামা তাঁহাকে দিয়া কাহাকেও সমাধির স্থান দেখিতে আমার সঙ্গে দিতে বলিলাম। যোগজীবন শ্রীযুত জগবন্ধু মৈত্র মহাশয়কে আমার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। তখন তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন। আমি মোহন্তজীকে লইয়া স্থান দেখিতে আসিলাম। দুখা নামক বাউরীর বাড়ীর ঘর সরাইয়া সেই স্থানে মোহন্তজী সমাধি দিতে বলিলেন এবং তদ্বাবত তাহাকে দশটাকা দিতে বলিলেন। তাহা আমরা তাঁহাকে দিয়াছিলাম; কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম মোহন্তজী তাহা তাহাকে দেন নাই। আমরা দুইজনে পরামর্শপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম এস্থান সমাধি দেওয়ার পক্ষে মন্দ নয়, সুতরাং তাহাই স্থির হইল। মেথরকে ডাকাইয়া স্থান পরিষ্কার করিতে বলিয়া গেলাম। অতঃপর ঐ স্থানে গর্ত্ত খুড়িয়া

ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া সমাধিস্থান প্রস্তুত করিতে, বিমান প্রস্তুত করিতে ও তাহা বস্ত্র ও ফুল মালা দ্বারা সুসজ্জিত করিতে রাজমিস্ত্রি, ইট চূণ প্রভৃতি সমস্ত ভার মুন্সেফ বাবু চৌধুরী মহাশয়ের উপর অর্পণ করিলেন। তিনি লোকজন দ্বারা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া সকলই সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

সমাধির স্থান গর্ত্ত করাইতে আমার প্রতি ভারার্পণ করিলেন। তিনি যে লোক ঠিক করিয়াছিলেন; আমি তাহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য করাইতে চলিলাম। কথা ছিল ৫ ফুট লম্বা, ৩।৪৷৷ ফুট চওড়া, ৫ ফুট গভীর করিতে হইবে। তৎপর রাজমিস্ত্রীগণ চূণ সুরকী ইট দ্বারা গাঁথিয়া দিবে। কিন্তু সে সময়ে এমনি রৌদ্র ও মাটী এত কঠিন হইয়াছিল যে, সেই লোকেরা কিছুতেই আশানুরূপ গর্ত্ত খুঁড়িতে পারিতেছে না। তাহারা পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া থাকে ও কাজেও গাফিলি করিতেছে। আমার কথা মত তাহারা কাজ আর করে না দেখিয়া আমি বাসায় যাইয়া শ্রীযুক্ত মুন্সেফ বাবুকে তাহা কাঁদিয়া বলিলাম। বেলা প্রায় অবসন্ন হইয়া আসিল। তখন শ্রীযুত মুন্সেফ বাবু নিজেই চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথায় তখন তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া দিল। রাজমিস্ত্রিরাও কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিল।

যখন গোস্বামী প্রভুর দেহ বিমানে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সকলে প্রস্তুত, এমন সময় উকিল হরিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে বড় দাণ্ডের রাস্তায় একধারে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলাম। তিনিও সমাধিস্থানে সঙ্গে যাইবার জন্য আসিয়াছেন। তখন এইরূপ বিস্তর ভদ্রলোক আসিয়াছেন। আমি যেমনি উকিল হরিশবাবুকে দেখিলাম, অমনি যেন কে আমাকে বলিয়া দিল, মিউনিসিপালিটীর এলাকার মধ্যে ঠাকুরের দেহ সমাধিস্থ করিতে যাইতেছ, তোমাদের পার্‌মিশন্ কোথায়? অমনি আমি ছুটিয়া গিয়া সেই লোকারণ্যের মধ্যে হরিশবাবুকে বলিলাম, মহাশয়, সমাধির স্থান কি

মিউনিসিপালিটীর এলাকার ভিতর? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন আমি বলিলাম তবেত এক খানা পার্মিশন্ চাই। তিনি বলিলেন চলুন্, আমিইত সঙ্গে যাইতেছি! তখন তিনি মিউনিসিপালিটীর অস্থায়ী চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম আজ্ঞা, না, এমন কথা ঠিক নয়। আপনি আজ আছেন, হয়ত কাল থাকিবেন না; এ অবস্থায় আমাদের লিখিত পার্মিশন দেওয়া আপনার উচিত। তিনি বলিলেন, বেশত আপনারা দরখাস্ত করুন। তখন অমি তথা হইতে বাসার দিকে মুখ ফিরাইয়া সিঁড়ির উপর শ্রীযুত মুন্সেফ্ বাবুকে দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, ঠিক কথাইত আপনি মনে করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি একখানা দরখাস্ত লিখিয়া দিন, শ্রীযুত হরিশবাবু ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, এখনই তাঁহার দস্তখত করাইয়া লই। তিনি কালি, কলম, কাগজ চাহিলেন, সে সময়ে বাসায় তাহা পাওয়া দুর্ঘট, বাসার নিকটে পুলিসের থানা ছিল, কাজেই তাঁহাকে লইয়া সেই স্থানে গেলাম। তথায় তিনি দরখাস্ত লিখিয়া মঞ্জুর করাইতে আমার সঙ্গে হরিশবাবুর নিকটে চলিলেন। তিনি উহা দস্তখত করিয়া দিলেন। পরদিন দরখাস্ত দিয়া উহার সহি মহরের নকল লইয়া রাখিলাম। এই পার্মিশনের কথা কে আমাকে মনে তখন উদয় করিল জানি না। অত বড় বড় বিজ্ঞ লোক থাকিতে আমার মত মূর্খ লোকের দ্বারা কেন এ কাজ করাইলেন পরে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তখন পার্মিশন না হইলে ঠাকুরের সমাধিই এখান হইতে উঠাইয়া লইতে আমরা বাধ্য হইতাম। এই সকল ঘটনায় মনে হইল, ঠাকুর, "তোমার কার্য্য তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।" অতঃপর যেরূপে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

কিছুদিন পরে আমরা প্রায় ৪০৲ টাকা ব্যয় করিয়া সমাধির উপর এক খানা চৌচালা ঘর ও বেদী প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে সমাধির উপরে

তাল পত্রের ঘর ছিল। খড়ের চৌচালা ঘর হওয়ায় চৌকাট কপাট করিয়া তালা বন্ধ করিয়া রাখার সুবিধা হইয়াছিল। সেই হইতে আমরা প্রহরী রাখা প্রয়োজন বোধ করিলাম না। এ দিকে আমি দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতঃ যথাসাধ্য জঙ্গল সাফ্ করিয়া এখানকার প্রজাদিগকে কিছু কিছু দিয়া কয়েকজন প্রজা উঠাইয়া দিলাম।

কোন একটী গুরুভ্রাতা বাড়ী করিতে গিয়া প্রজাকে জবরদস্তি করিয়া ভিটামাটী উৎসন্ন করিয়া গলাধাক্কা দিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তাহা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন, এ অতি অন্যায় কাজ করা হইয়াছে, তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেওয়া তাঁহার উচিত ছিল। এজন্য তাহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে। তজ্জন্য পরলোকে তিনি যে ক্লেশে ছিলেন, সে কথাও তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমরা প্রজাদিগকে জোর করিয়া উঠাইতে চাহি নাই। ঝিঙ্গারপুরের শ্রীযুক্ত কুলমণি চৌধুরী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করিয়া নরেন্দ্র সরোবরের পশ্চিম পাড়ে তাঁহার জায়গায় প্রজাদের অনেকের থাকিবার স্থান করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি যাহাকে যাহা দিতে বলিলেন, তাহা দিয়া ঐ সকল প্রজাদিগকে উঠাইয়াছিলাম। ডেঃ মাঃ জগৎ-বাবু, শশীবাবু প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রজাদিগকে অর্থ দিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রজাদিগকে উঠাইতে আমাদের প্রায় ছয় শত টাকা ব্যয় হয়।

ইতিমধ্যে একটী বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা সমুদ্র স্নান করিতে গিয়াছি। তখন যোগজীবন গোস্বামী এখানে ছিলেন না, অর্থের অভাবে ইনি স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। কতকগুলি দুষ্টলোক কুবুদ্ধির বশে পরামর্শ করিয়া দরজা ভগ্ন করতঃ রাত্রিযোগে সমাধি খুঁড়িয়াছিল। এই সংবাদ মুকুন্দা (ভৃত্য) সমুদ্রতীরে যাইয়া আমাকে বলে। ইহা শুনিয়া আমার চক্ষুস্থির হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আর কিছুই জানিতে পারিলাম না। তখন বাসায় আসিয়া তাড়াতাড়ি সমাধিতে গেলাম। তখনও সমাধিতে প্রজা

ছিল; কিন্তু ভয়ে তাহারা কিছুই বলিল না। অতঃপর আমি শ্রীযুত সরল নাথ গুহের দ্বারা থানায় এজাহার দেওয়াইয়া যথাবিহিত তদন্তের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলাম। পুলিসের নিকট ও সাধারণের নিকটে ঘোষণাদ্বারা জানাইলাম যে কেহ অপরাধীকে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, আমরা তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিব। একজন সবইন্‌স্পেক্টর তদন্তে আসিয়াছিলেন। তিনি কিছুই কুলকিনারা করিলেন না। আমরা শুনিতে পাইলাম, পুলিশের প্রতি লোকে যে জন্য কলঙ্কারোপ করে এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল। অজ্ঞ দুষ্ট লোকেরা মনে করিয়াছিল, যিনি জীবিত অবস্থায় কত সহস্র সহস্র টাকা বিতরণ করিয়াছেন, কত হাজার হাজার লোককে বস্ত্র, ঘটী, কলসী দিয়াছেন ও মহাপ্রসাদ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু ভোজন করাইয়াছেন এবং ইহার দেহ সমাধি দিবার কালেও বহু সিকি, দুয়ানি ও পয়সা ইহাঁর পুত্র বিতরণ করিয়াছেন, তখন না জানি ইহাঁর সমাধি স্থানে ইঁহারা কত ধন রত্ন দিয়া থাকিবেন। এই অসম্ভব আশায় প্রলোভিত ও প্রতারিত হইয়া সেই সমস্ত অজ্ঞ দুষ্ট লোকেরা এই অতিশয় গর্হিত ও অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।

আমি পুলিস তদন্তের বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত মুন্‌সেফ বাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, এই অপকর্ম্মকারীর পশ্চাতে বড় লোক রহিয়াছে, আপনি আর অধিক চেষ্টা করিয়া হায়রাণ হইবেন না; ইহার পরিণাম সুবিধাজনক হইবে না। এমন কি একটা মিছামিছি করিয়া আপনাকে ফেসাদে ফেলিতেও পারে, সুতরাং আমার বিবেচনায় ক্ষান্ত হওয়াই ভাল। যখন অর্থের বলে লোকে অন্যায় কর্ম্মকে ন্যায় করিয়া তুলিতে পারে, এবং তাহার বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের সুবিচারের প্রত্যাশা করা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক ও অসম্ভব, তখন তাঁহার কথায় কাজেই ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

একাদশ দিবসে যোগজীবন গোস্বামী তাঁহার পিতৃদেবের তিরোধানের

মহোৎসব প্রায় চারি হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া ও কাঙ্গালীদিগকে ঢেণ্ডারা দিয়া আনাইয়া প্রচুর উৎকৃষ্ট বস্তুর আয়োজনে ৺জগন্নাথ দেবের ভোগ দিয়া সকলকে ভোজন করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে এক আনা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। ভোগের মহাপ্রসাদ প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালিরা আনন্দে ভোজন করতঃ দুই হস্ত তুলিয়া যোগজীবনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সকলের ভোজনান্তে বহু সামগ্রী উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। তখন উহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে তিরোভাবের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। যেমনি বাপ তেমনি বেটা। অর্থব্যয়ে যোগজীবনের ভ্রূক্ষেপ নাই, যাহা করিতে হইবে তাহা সুন্দররূপেই করা চাই। তিনি পিতৃদেবের এই সুশিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময় আমাকে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার ফলে আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। যোগজীবন এখানে নাই, সমাধির বহু কার্য্যই অসম্পন্ন রহিল ইত্যাদি ভাবিয়া অসুস্থ শরীর লইয়াও এখানে থাকিতে বাধ্য হইলাম।

এদিকে ভূমিবিক্রেতা মোহন্তজীর নিকটে আনাগোণা করি, কিন্তু তিনি অগ্রসর হইয়া কোবালা করিয়া দিতেছেন না। কেবল এখন তখন করিয়া আসিতেছেন। শেষে নিজে না গিয়া দ্বারবানের দ্বারা তাগাদা করিতে লাগিলাম; তাহাতেও কোন ফল হইল না. কেবল সেই গড়িমিশি বই আর কিছুই নয়। আমরা লোকপরম্পরায় জানিতে পারিলাম, মোহন্তজী এখন সমুদয় স্থান কোবালা করিয়া দিতে সম্মত নহেন। কোন কোন লোক তাঁহাকে সমুদয় স্থান আমাদিগকে কোবলা না করিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছে। তাঁহারা ততোধিক মূল্য দিয়া সেই স্থান লইতে চাহিতেছে ইত্যাদি। ইহার মধ্যে যোগজীবন রিক্ত হস্তে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার

গাড়ীভাড়ার পয়সা পর্য্যন্ত এখান হইতে দেওয়া হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যোগজীবন, তুমি কি কিছুই পাও নাই! যোগজীবন আমার নিকট কান্দ কান্দ মুখে বলিল, আমি সাত শত টাকা পাইয়াছিলাম, কিন্তু শান্তিরা তাহা সমস্তই রাখিল। আমি বলিলাম, এখানকার সমাধির কার্য্য আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না, অন্ততঃ তোমার কয়েক শত টাকা আনা উচিত ছিল। যোগজীবন বলিল, কাকাবাবু, আমি চেষ্টা করি নাই? তাহারা চাবি লইয়া ট্রাঙ্ক হইতে সমস্তই লইয়া গেল। পরে আমি একদিন মোহন্তজীকে পাইয়া খুব জোরের সহিত তাঁহাকে বলিলাম, আপনি কেন দুষ্ট লোকের কুপরামর্শে আমাদিগকে সমাধিস্থান এ যাবৎ কোবালা করিয়া দিতেছেন না? তিনি বলিলেন, আমি সমুদয় স্থান দিব না। আমি বলিলাম বটে? দেখুন মোহন্তজী, আমাদের এক প্রাণীর শরীরে যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত থাকিবে ততক্ষণ দুষ্ট লোকের কুপরামর্শ মতে চলিয়া তুমি কখনই প্রতারণা করিয়া আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবে না। আমরা আদালত দ্বারা তোমার ঘাড়ে ধরিয়া কাজ আদায় করিয়া লইব, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। নিজে হাতে তোমার ঘাড় ধরিব না। শুধু জমির কবালা করিয়া লইয়া তোমাকে ছাড়িব না। ক্ষতিপূরণ এবং খরচের টাকাও আদায় করিয়া লইব। তাহা তোমার অপর কোন সম্পত্তি ধরিয়া আদায় করিতে হইবে না। এই সম্পত্তির মূল্যের টাকা হইতেই তাহা আদায় করিয়া লইব। এখনও তোমাকে বলিতেছি, তুমি যদি সদ্ভাবে চলিয়া ভদ্রলোকের মত আমাদের কবালা করিয়া দাও, তবে ইহার কিছুই আমাদের করিতে হইবে না ও তোমারও ক্ষতি হইবে না। তুমি যে বায়নানামা লিখিয়া দিয়াছ, জান তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ লোক সাক্ষী? আদালতে তোমার কথা অপেক্ষা তাঁহাদের কথাই অধিক মান্য হইবে। আর ইহাও জানিও তাঁহারা কখনও মিছা কথা বলিবেন না। ষ্টাম্পে বায়নানামা লিখিত-পড়িত হইয়াছে, দুই শত টাকা বায়না

বাবদে লইয়াছ, তাহাতে তোমার দস্তখৎ আছে। তাহার অন্যথা করিলে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইয়া জেলে যাইতে হইবে। ঐ স্থানের মূল্যের টাকা আমরা বায়নানামা হওয়ার পরেই, শ্রীযুক্ত কুলমণি চৌধুরী, উকীল হরিশ্চন্দ্র ঘোষ ও এমার মঠের মোহন্তের নিকটে জমা দিয়াছি, তাঁহারা কখনই মিথ্যা বলিবেন না, সুতরাং আমাদের ক্ষতিপূরণ পাইতেও কোন বাধা হইবে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখ, আমরা আদালতে গেলে তোমার কত ক্ষতি হইবে। বিশেষতঃ তোমার ঐ সম্পত্তি তোমার অন্যান্য সম্পত্তির সহিত বন্ধকে আবদ্ধ আছে। এই সাত মাস যাবৎ তুমি প্রতারণা করিয়া আসিতেছ, তাহাতে তোমার কত লোকসান হইতেছে!

আমি তোমাকে এখন একটী সুপরামর্শ দিই, তুমি এখানকার দুষ্ট লোকের পরামর্শ না শুনিয়া আমার কথা মতে কটক চলিয়া যাও, তথায় তুমি যাহাদিগকে নিরপেক্ষ ভাল লোক বলিয়া জান ও মনে কর, তাঁহাদিগকে বায়নানামায় তুমি যে সকল সর্ত্ত লিখিয়া দিয়াছ তাহার কোন কথা গোপন না করিয়া সত্য সত্য সকল কথা বলিয়া পরামর্শ চাহিও যে আমি এখন ঐ স্থান সমস্তই কবালা না করিয়া দিয়া কতক অংশ দিয়া তাঁহাদের হাত হইতে মুক্ত পাইতে পারি কি না। তাঁহারা যদি তোমাকে বলেন, হাঁ না দিয়া পার, তাঁহারা আদালত করিয়া তোমার নিকটে ঐ স্থান কবালা করিয়া লইতে পারিবেন না, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে দিও না। তখন আমরা যাহা জানি করিব। তোমার নিকটে লোক পাঠাইব না বা তোমাকে ডাকিব না। এই সকল কথার পর মোহন্তজী কটকে চলিয়া গেল। ২।১ দিন পরে তথা হইতে আসিয়া আমাকে বলিল এখন আপনারা কোবালা করিয়া নিন, আমার আপত্তি ভঞ্জন হইয়াছে। তৎপর, সাত মাস মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসে আমি যোগজীবনের নামে উকীল হরিশবাবুর দ্বারা কবালা লিখিত-পড়িত করিয়া লইলাম। মুন্সেফ শ্রীযুক্ত কিশোরী বাবু প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক তাহাতে সাক্ষী হইলেন।

যোগজীবন আমার নামেই কোবালা লিখিয়া লইতে বলিল। অভিপ্রায় এই যে এই জমি লইয়া মিউনিসিপালিটির সহিত মোকর্দ্দমা হইতে পারে। তাহাতে আমি বলিলাম আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কোন্ দিন মৃত্যু ঘটিবে; তখন আমার উত্তরাধিকারী ভাগিনেয়েরা উক্ত সম্পত্তির দাবী করিতে পারে। তোমার মোকর্দ্দমার জন্য ভয় নাই, আমি বাঁচিয়া থাকিলে আমিই সমস্ত তদ্‌বির করিব, তোমার কোন উদ্বেগ পাইতে হইবে না। ফলে তাহাই আমাকে করিতে হইয়াছিল।

ঐ সম্পত্তি যাঁহার নিকটে বন্ধক ছিল, শ্রীযুক্ত উকীল হরিশবাবু দ্বারা তাঁহাকে আনাইয়া ঐ সময়েই তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ টাকা ষ্টাম্পে একখান ফারকতি লিখাইয়া উভয় দলিলই এক সঙ্গে রেজেষ্টারী করিয়া লইলাম। মূল্যের টাকা সমস্তই মোহন্তের নিকট হইতে বন্ধকআলা নিয়াছিলেন।

যদিও ঠাকুরের কৃপায় আমি সমস্ত কার্য্যই চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া সম্পন্ন করিয়াছি, তথাপি মুন্সেফ শ্রীযুক্ত কিশোরী বাবুর খাতির, সম্মানে অনেক সাহায্য হইয়াছিল।

এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া অগ্রহায়ণ মাসেই অসুস্থ শরীরে আমি কলিকাতা ঝামাপুকুর শান্তিসুধাদের বাসায় আসিলাম। তথায় কয়েকদিন থাকিয়া শ্রীমতী শান্তিসুধাদের সঙ্গে ৺কাশী গমন করিলাম। তথায় ৫।৬ মাস থাকিয়া একটু সুস্থ হইয়া গয়া হইয়া পুনঃ কলিকাতার শ্রীযুক্ত অভয় বাবুদের বাসায় আসিলাম।

কাশীতে থাকিতেই আমার মনে হইল ও মাথায় খেলিতে লাগিল যে পুরীধামে গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমটী শান্তিরসাস্পদ করিতে হইবে। ঋষি-মুনিদের তপোবনের কথা যেমন শুনি যে তাহা সৌন্দর্য্যপূর্ণ আনন্দ ও শান্তির আলয়, আমরাও গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রম সেইরূপ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিব। গোস্বামী মহাশয়র নিকটে যেমন সকল শ্রেণীর ও সকল

অবস্থার লোক আসিয়া শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিত, তাঁহার সমাধি-আশ্রমও তদ্রূপই করিব, যেন এখানে সকলে আসিয়া শান্তি, আরাম ও তৃপ্তি লাভ করেন। কলিকাতা আসিয়াই মনে করিলাম এবার কতগুলি ফুল ও ফলের গাছ পুরী লইয়া যাইব, আর ঠাকুরও দেহ রাখার পূর্ব্বে পুরীতে ফল ফল করিয়া দেহ রাখিয়াছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেত আর এ জীবনে উহা তাঁহাকে দিতে পারিব না; যদি তাঁহার ইচ্ছা ও কৃপায় সুফল হয়, তবে উদ্দেশ্যে উহা নিবেদন করিয়া দিব, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যে দেবালয়ে দেবালয়ে ব্রাহ্মণ কাঙ্গালীদিগকে উহা বিতরণ করিয়া দিব, তাহা করিতে পারিলেই ইহাতে তিনি তৃপ্তিলাভ করিবেন এইরূপ মনের খেয়াল হইল। কিন্তু টাকা পাব কোথায়? তৎপরে মনে হইল, গুরুভাইদের নিকটে যাইয়া তজ্জন্য ভিক্ষা করিব। যিনি যাহা সন্তুষ্ট হইয়া এতদর্থে দান করিবেন, সংপ্রতি তদ্দ্বারাই ফুল ফলের গাছ লইয়া গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিব। এই সকল ভাবিয়া গুরুভাইদের নিকটে গমন করতঃ ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। ঠাকুরের কৃপায় অনেকেই কিছু কিছু দিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, আমাদের একটী পরিচিত মালি আছে, আমি আপনাকে তথায় লইয়া গিয়া যাহা যাহা আপনার প্রয়োজন তাহাই তথা হইতে আপনাকে লইয়া দিব। অপরিচিত লোকের নিকটে লইলে কি জানি খাঁটি ও ভাল জিনিষ নাও দিতে পারে।

আমি তাঁহার কথা ভাল মনে করিয়া তাঁহাকে লইয়া সেই মালির নিকটে গেলাম। তথায়ই পরামর্শ করিয়া ফল ফুলের গাছের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহারা ক্রমে ক্রমে সকলগুলি উক্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে আনিয়া দিল। মালির সহিত হিসাব করিয়া দেখা গেল সে যত টাকার ফল ফুলের গাছ দিয়াছে, তত টাকা আমি ভিক্ষায় পাই নাই, প্রায় ২৫৲ টাকা বাকী থাকে। তাহা আমি পুরী পঁহুছিয়া পাঠাইয়া দিব, এই কথা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ঘোষ

মহাশয়ের সমক্ষে মালিকে বলিয়া অভয় বাবুদের বাসায় ঐ ফুল ফলের গাছ সকল লইয়া আসি, কারণ সেই দিনই ট্রেণে আমাকে পুরী যাইতে হইবে।

আমি পুরী পঁহুছিলে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহাশয়ের এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, আপনি পুরী হইতে টাকা পাঠাইবেন না। আমরা এখানেই অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিব। তৎপর কলিকাতা আসিয়া শুনিতে পাইলাম, সেই মালি মারা গিয়াছে, শ্রীযুত রেবতীবাবুরা টাকা সমস্তই দিয়াছিলেন। আমি এখানে আসিয়া ৩।৪ বারে কলিকাতা নার্শরী হইতে ফল ফুলের গাছ ও নানাপ্রকার শাক শবজির বীজ অনেকগুলি আনাইয়া এখানে রোপণ করিয়াছিলাম। সে সময়ে এখানে নানাবিধ কপিশাক, আলু, পটল, বেগুন ও অন্যান্য তরিতরকারী যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত। প্রাণ ভরিয়া দানও করা যাইত। যোগজীবনের এ সকলে খুব উৎসাহ ছিল। কোন কাজে অর্থের জন্য তাঁহার নিকটে বেগ পাইতে হয় নাই। প্রাণ খুলিয়া মনের মত কাজ করিতে পারিতাম। এখন সে সকল ফল ফুলের গাছের অর্দ্ধেকও নাই। একজনে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা যাহা উৎপন্ন করিয়াছিল, আর একজনের শৈথিল্য, অমনোযোগ ও ত্রুটীতে তাহা নষ্ট হইতে লাগিল। ঠাকুরের কৃপার কথা এখানে না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি যত প্রকার ফল ফুলের গাছ করিয়াছিলাম, তাহার প্রায় সকল গুলিরই ফলফুল ঠাকুরের সেবায় পূজায় লাগিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সকল আঁটি ও বীজ রোপন করিয়াছিলাম তাহারও প্রায় অনেকগুলিই ৩।৪ বৎসরে ফল প্রদান করিয়াছে। তাহা ঠাকুরের ভোগে লাগাইয়া আমি আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিয়াছি। তখন এক আমই প্রায় ১০ হাজার হইত, এখন তাহার তুলনায় কিছুই হয় না বলিলে হয়। অন্যান্য ফল ফুল ত অনেকই নাই।

ঠাকুরের সমাধি-মন্দির দুষ্ট লোকের দ্বারা খোদিত হওয়ার পর এখানে

আমাদের থাকা এখন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া একখান দোচালা ঘর প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। তখন পণ্ডিত মহাশয়, শ্রীধর ঘোষ, সরলনাথ গুহ এখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সে সময়ে এখানে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। আমি শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রম করিয়া আসিয়া এখানেই থাকিতাম। শ্রীযুত অমৃতলাল সেন সমাধিতে একখানা ঘর করিয়া বাস করিতেছিলেন।

আমি যে সকল ফল ফুলের গাছ লাগাইয়া গিয়াছিলাম তাহা সে বারে অতি বর্ষা হওয়ায় শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় তাহা স্থানচ্যুত করিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তিনিও এখানে থাকিতেন। আমি এখানে আসিয়া ঘরগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে গুরুভাই ভগিনীদের এখানে আসিয়া থাকিবার বা দাঁড়াইবার ঘর ছিল না। অমৃতের সে ঘর এখন আর নাই।

একবার বানরীপাড়া যাইয়া তথা হইতে কতকগুলি নারিকেলের চাঁরা লইয়া আসি; তৎপর আরও কয়েকটী চারা তথা হইতে আসিয়াছিল। সাক্ষী গোপাল হইতে গণেশ ঠাকুরের দ্বারাও কিছু নারিকেলের চারা আনাইয়া লাগাইয়াছিলাম। এখন অনেকগুলিতেই নারিকেল হয়।

যোগজীবন গোস্বামী শ্রীযুত মঙ্গলী ঘোষের দ্বারা ডেঃ মাঃ জগৎ বাবুর মাতব্বরিতে শ্রীযুতা বুড়া ঠাকুরাণীর কোঠা ও মন্দিরের সম্মুখ দিকের দালান প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপর আমি এখানে আসিবার পরে সমস্ত প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বে এখানে পায়খানা পৃথক ছিল না, তাহাতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ হইত। মেয়েরা এক প্রকোষ্টে থাকিতেন, পুরুষেরা এক প্রকোষ্টে থাকিতেন। কেবল উৎসবের সময়ে টাট্টি দিয়া পুরুষদের জন্য পৃথক কাঁচা পায়খানা প্রস্তুত করা হইত, তাহাতে যারপর নাই সকলেই অসুবিধা

বোধ করিতেন। পরে পুরুষদের জন্যও অন্য স্থানে এখন পাকা পায়খানা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই সময় ৺গম্ভীরানাথ বাবা পুরীতে আগমন করেন। তিনি এক পাণ্ডার বাড়ীতে সঙ্গীয় দলবল সহ উঠিয়াছিলেন। ইহা যোগজীবন জানিতে পারিয়া তথায় তাঁহার নিকট যাইয়া অনুনয়পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করতঃ ঠাকুরের সমাধিতে আনয়ন করেন। তাঁহারা প্রায় ২০।২৫ জন সকলেই আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনে খুব আনন্দ হইয়াছিল। যে কয়দিন বাবা এখানে ছিলেন, আমরা ঠাকুরের নিকটে থাকিয়া যে আনন্দ লাভ করিতাম, যেন তদ্রূপ বোধ হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে তাঁহারা দাইল, তরকারী ও রুটি প্রস্তুত করিতেন। বৈকালে মহাপ্রসাদ ও মিষ্টান্ন পাইতেন। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া মধ্যাহ্নে আহার করিতেন। রুটী ও দাইল তরকারী এমন উৎকৃষ্ট হইত যে তাহা ভুলিতে পারি না। এই সময় যোগজীবন আমাকে এক শত টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিতে বলিল, আমি তাহা আনিয়া তাঁহাকে দিলাম।

এক দিন বজ্রংকারোট্ প্রস্তুত করিয়া সকলকে খাইতে অনুরোধ করা হইল। ইহা গয়াতে থাকাকালীন তিনি গোস্বামী মহাশয়, দেবপ্রতিপালক বাবাজী ও আমাকে তাঁহার আশ্রমে যাওয়ায় দিয়াছিলেন। তাহা যে কি অপূর্ব্ব বস্তু তাহা না খাইলে বুঝা যায় না। এই অনুরোধে তিনি বলিলেন উহা এখানে সেরূপ প্রস্তুত হইবে না। কারণ এখানে সে সমস্ত জিনিষ পাওয়া যাইবে না, তবে একরূপ হইতে পারে। আমরা তাহাই করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় যাহা যাহা দরকার আমাদের সঙ্গে লোক দিয়া যতটা পাওয়া গেল তাহাই আনিয়া উহা প্রস্তুত করাইলেন এবং সকলকেই তাহা দিলেন। সকলেই তাহা খাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ইহা খাইতে উত্তম হইলেও গয়ার মত হয় নাই। তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন এখানে সেরূপ

হইবে না। যাহাঁরা সে জিনিষ খান নাই তাঁহাদের নিকট ইহা অপূর্ব্বই বোধ হইল।

তিনি প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যা-আরতির সময় সমাধিস্থানে যাইতেন ও প্রণাম করিতেন। আরতির সময় দাঁড়াইয়া থাকিতেন, বসিতেন না। একদিন আমাদিগকে বলিলেন "বাবা ত হিয়াই বর্ত্তমান হ্যায়"। আমি বলিলাম আমরা ত দেখিতে পাই না। তিনি বলিলেন, "কৃপা হোনেসে আল্‌বৎ দর্শন মিলেগা। হাম্‌কো বাবা কৃপা কর দর্শন দিয়া।"

আর একদিন সমাধিস্থানে বাবা মহারাজ যাওয়ায় যোগজীবন তখন তথায় যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সমাধির উপর মন্দির কি প্রকার করিতে হইবে? তখন সমাধির উপর খড়ের চৌচালা ঘর ছিল। তিনি তাহাই দেখাইয়া বলিলেন, "যেসা ইয়া ঘর হায়, এত্‌না বড়া কর্‌না, বহুত্‌ বড়া নাহি কর্‌না, উস্‌মে উপাধি হো যায়েগা।"

কিছু দিন তিনি এখানে অবস্থিতি করিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া যোগজীবনের ও আমার ক্লেশ হইল। ঠাকুরের তিরোভাবের পরে তাঁহাকে পাইয়া আমরা বেশ্‌ আনন্দে আছি। তাঁহাকে কৃপা করিয়া আরও কয়েক দিন থাকিবার ইচ্ছা নিবেদন করিবার জন্য যোগজীবন ও আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া তাহা বলিলাম। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন "ফের্‌তো যানেই হোয়েগা?" এই কথা মৃদু ও গম্ভীরভাবে বলিলেন, যেন ভালবাসিয়া প্রবোধ দিতেছেন। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, ঠাকুরের অপ্রকট অবস্থার পর আপনার দর্শন পাইয়া যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাইতেছি, তাহা আর আমাদের ঘটে নাই, তাই আপনাকে কাতরে বলিতেছি দয়া করিয়া আর কয়েকদিন থাকুন্। তখন তিনি বলিলেন, "হামারা সাথ বহুৎ আদ্‌মি, তোম্‌ লোকন্‌ কো উপাধি হোয়েগা।" আমি বলিলাম, মহারাজ, আপনাদের দর্শন, স্পর্শন ও সেবাতে যদি উপাধি হয়, তবে শান্তি হবে

কোথায়? তখন তিনি দয়া করিয়া আরও কয়েকদিন থাকিবেন বলিলেন।

তখন শীতের সময়, ধূনির নিকটে তাঁহারা বসিয়া গান করিতেন, তাহা বড়ই মধুর বোধ হইত। মাঝে মাঝে দালানের কোঠায় ও বারেন্দায় গভীর রজনীতে সেতার বাজাইতেন, তাহা যেন মধু বর্ষণ করিত। যখন যখন অধিক রজনীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি তিনি শান্ত গম্ভীরভাবে স্থির হইয়া আসনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন। অপর সকলে ঘুমাইতেছেন। দালানের পূর্ব্বদিকের কোঠায় আমি যখন থাকিতাম সেই সময় তিনি আগমন করেন। আমি সেই কোঠা তাঁহাকে দিয়া দোচালা খড়ের ঘরে শয়ন করিতাম। মাঝে মাঝে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকটে বসিতাম। তিনি কত আদরই করিতেন, প্রাণকে যেন কাড়িয়া লইতেন। অতঃপর তিনি গমন করিলেন।

পান্নার দিদিমা ও মাতা ঠাকুরের সমাধিমন্দিরের কাঁচা ঘর কয় শত টাকা ব্যয় করিয়া পাথর দ্বারা পাকা করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। যোগজীবনের দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে পূর্ব্ব মন্দির ভগ্ন করিয়া শ্রীযুত নগেন্দ্র সামন্ত মহাশয়ের দ্বারা এক বৃহৎ ও সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখনও তৎসম্বন্ধে অনেক বিষয়ের অভাব লক্ষিত হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে আশা করি কালে পূর্ণ হইবে।

যোগজীবন বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীযুত নগেন্দ্র বাবুকে এখানে আনেন। তিনি সে সময়ে মন্দিরের ভিত্তির জন্য স্থান গর্ত্ত করাইয়া কলিকাতা চলিয়া যান। ৮ হাত গভীর, বেদির চতুর্দ্দিকে ৮ হাত করিয়া গর্ত্ত করাইয়াছিলেন। আমি তাহা দেখিয়া তখনই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, মহাশয়, এ যে পুকুর আপনি খনন করাইলেন। এখানে



শ্রীশ্রীজটিয়া বাবার

৺পুরীধামস্থ সমাধিমন্দির

বালি মাটী একটু বৃষ্টি হইলেই সব ধসিয়া পড়িয়া যাইবে। তখন ঠাকুরের সমাধি স্থান রক্ষা করা বিষম কষ্ট সাধ্য হইবে। এখানে এখন তক্তা বা টিন পাওয়া যাইবে না, যাহা দ্বারা আপনি সমাধি স্থান রক্ষা করিতে পারিবেন। তখন আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। লোকে বলে কাঙ্গালের কথা বাসী হইলে লাগে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। একদিন এমন ভয়ানক বৃষ্টি হইল যে আর কিছুতেই সমাধি স্থান রক্ষা করা যায় না। সমাধির চতুর্দ্দিকে ভাঙ্গিয়া ধসিয়া পড়িতে লাগিল। গেল, গেল, সর্ব্বনাশ হইল, সকলের মুখেই এই একই কথা। ঠাকুরের সঙ্গে যে কমণ্ডলু দিয়াছিলাম তাহা বাহির হইয়া পড়িল।

যোগজীবন তখন শ্রীযুত মাধি মহাপাত্রকে আনাইয়া, মজুর ও রাজমিস্ত্রি দিগকে ডবল রোজ দিয়া কপাট তক্তা যাহা ছিল ও পাওয়া গেল তদ্দ্বারা কোন রকমে ঠেস দিয়া রাতা-রাতি কংক্রট্ ফেলিয়া পাথর দিয়া গাঁথুনি আরম্ভ করিল। মাধি মহাপাত্র তখন যে পরিশ্রম করিয়াছে তাহার ঋণ পরিশোধ হয় না। নিজে কাঁধে করিয়া বড় বড় পাথর বহিয়া লইয়া দিতে লাগিল। কয়েকদিন অহোরাত্র এইরূপ চলিল। কয়েক শত টাকা সেবারে বৃথা ব্যয় হইয়াছিল। যোগজীবন ব্রাহ্মণ দ্বারা যাগ যজ্ঞ হোম করতঃ ঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর তদন্তে এখানে আসিলেন। তিনি মিউনিসিপালিটীর ও স্থানীয় কোন কোন লোকের পরামর্শে এস্থানের সমাধির বিরুদ্ধে এক লম্বা চওড়া সুদীর্ঘ রিপোর্ট কলিকাতা বোর্ড অফিসে দাখিল করিলেন। রিপোর্টারের অভিপ্রায়, ঐখানে সমাধি দেওয়া সর্ব্ব-সাধারণের অত্যন্ত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। যে হেতু একদিকে নরেন্দ্র সরোবর ও অন্যদিকে আঠারনালা নামক জলাশয়, লোকে ইহার জলে স্নান ও জল পান করে। ইহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়

ইত্যাদি। তদনুসারে তথা হইতে আমাদের প্রতি এক নোটিশ জারি হইল। তাহার মর্ম্ম—যেহেতু তোমাদের প্রদত্ত সমাধি কেন ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইবে না, শীঘ্র তাহার কারণ প্রদর্শন করিবে। আমরা বোর্ডের সেই নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া মিউনিসিপালিটীর অর্ডার মতেই ঐ স্থানে পাকা গাঁথনি করিয়া সমাধি দিয়াছি, অজ্ঞাতে বা বেআইনিমতে সমাধি দিই নাই, এই কারণ দেখাইয়া এবং সেই হুকুমের নকল ও দরখাস্ত বোর্ডে দাখিল করিলাম। তাহা প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে কর্ত্তৃপক্ষের এক নোটিশ মিউনিসিপালিটীতে এই মর্ম্মে আসিল "দেখা গেল ইহাঁরা অর্ডার পাইয়াই সহরে মিউনিসিপালিটীর এলাকায় সমাধি দিয়াছেন। অতঃপর ওখানের মিউনিসিপালিটীকে সাবধান করিয়া দেওয়া যায়, ভবিষ্যতে যেন আর কখনও মিউনিসিপালিটীর এলাকার ভিতর টাউনের উপরে কাহাকেও সমাধি দিতে হুকুম না দেওয়া হয়।"

এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, কেন আমার মত অজ্ঞ লোকের দ্বারা ঠাকুর সেই সমাধি দিবার সময়ে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে হুকুমনামা লওয়াইয়া ছিলেন। তাঁহার কৃপার এ মর্ম্ম এখন উদ্‌ঘাটিত হইল। সমাধিস্থান সম্বন্ধেও ঠাকুর চন্দনযাত্রার সময়ে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। সকলের মনোনীত স্থান অগ্রাহ্য করতঃ আমার এই স্থানই পছন্দ হইল। ইহার ভিতর যে সকল বাধা বিঘ্ন রহিয়াছিল তাহা জানা সত্ত্বেও আমরা সে সময়ে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তাহা মনে থাকিলে অন্তরায় হইত, সুতরাং তখন বিস্মৃতিই মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল।

আমি ত বায়নানামা লেখাপড়া করিবার সময়ে সমস্ত স্থানই লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। এই সমাধি-স্থানের দুই একর জমি আমাদের সমাধি দেওয়ার অনেক পূর্ব্বে কটকনিবাসী কানাইলাল পণ্ডিতের ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণার্থ গেজেট হইয়াছিল। তখন আমরা

উহা অবগত থাকিলেও বিস্মৃত ছিলাম। তাহা ঘটিলে সমাধিতে আমরা অতি সামান্য স্থানই প্রাপ্ত হইতাম, কিন্তু ঠাকুরের অন্যরূপ ইচ্ছা।

উক্ত কানাইলাল পণ্ডিত ধর্ম্মশালানির্ম্মাণার্থ দশ সহস্র টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। তখন গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ জমি দুই একর লইবার জন্য গেজেটে বাহির হয়। এখানে তৎকালে ডেঃ মাঃ জগচন্দ্র রায় মহাশয় ঐস্থানে ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিবার জন্য হিসাব করিতে ভার প্রাপ্ত হন। তিনি হিসাব করিয়া দেখেন যে ঐ টাকাতে এখানে কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে পারে না, সুতরাং আরও ৪।৫ হাজার টাকা না দিলে হইবে না। তিনি তৎকালে ইহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইলে গবর্ণমেণ্ট হইতে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে জানান হয়, আপনি আরও ৪।৫ হাজার টাকা না দিলে ঐ স্থানে ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইতে পারিবে না। তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় আর টাকা দিতে পারিবেন না এবং ঐ টাকাতে গবর্ণমেণ্টের যেস্থানে ইচ্ছা ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিতে পারেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থান নামঞ্জুর করিয়া দিলেন, সুতরাং এখন নিরাপদে আমাদের অভিপ্রায় ও ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। জগৎবাবু, যদিও শিষ্য না হউন, কিন্তু প্রার্থী ছিলেন। ঠাকুর কলিকাতা যাইয়া দীক্ষা দিবেন আশা দিয়াছিলেন। যদিও তাহা ভাগ্যে ঘটিল না, তথাপি তিনি কোন শিষ্যাপেক্ষা ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ভক্তি কম করিতেন না। তাঁহার দ্বারা আমরা এই স্থানে বহুতর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুর কোন্ সূত্রে কাহার দ্বারা কি কার্য্য করান তাহা কে বুঝিবে?

এখানে বানর মারার প্রতিবাদ করা অবধি মিউনিসিপালিটী আমাদের প্রতি সদয় নয়। এই সমাধিস্থান লইয়া এন্‌ক্রোচ্‌ ও ফৌজদারী প্রভৃতি ৩নং মোকদ্দামা আমার উপর চাপাইয়া জেরবার ও হয়রান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের

ফলে তাহাদের ইচ্ছা বিফল হইয়াছিল। তখন এখানে আমাকে একাকী ঠাকুরের ভোগ, পূজা ও আরতি প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য করিতে হইত, এখানকার কার্য্যাদি দেখিতে, জমা খরচের হিসাব রাখিতে, আবার উকীল, মোক্তার ও কাছারিতে আনাগোনা করিতে হইত। সাক্ষীদের নিকটে যাতায়াত করিতে হইত, কেননা, এখানকার লোকেরা সত্যকথা জানিয়া শুনিয়াও মিউনিসিপালিটীর ভয়ে বলিতে সাহস করিত না, এইরূপ নানাপ্রকার বিপদ। কোন দিন কার্য্য শেষ করিয়া আসিতে রাত্রি ৮।৯টা হইয়া যাইত। তদ্ভিন্ন সমাধির নিকটস্থ নূতন খরিদা জায়গার নাম জারি লইয়া আর ১নং মোকদ্দমা চলিল। এই প্রকারে কিছুতেই মিউনিসিপালিটী বেগ দিতে ক্রটি করে নাই। সামান্য কারণ লইয়া কেবল নোটীশের উপর নোটীশ জারি করিতে লাগিল। প্রথম কিছুই ট্যাক্স্ ছিল না, পরে ৬৲ টাকা, অবশেষে পঁচিশ টাকা ধার্য্য হইল। আমাদের আবেদন নিবেদন সকলই বিফল হইল। এখনও বৎসর বৎসর বৃদ্ধি করিবার প্রয়াসী। কিছুতেই আমাদের যেন শান্তি নাই। মিউনিসিপালিটী সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু এরূপ দৌরাত্ম্যকারী আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

যাহা হউক, যে সমস্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করায় হয়রান করিতেছিল, ভগবৎকৃপায় বিচারে তাহা সমস্তই বিফল হইয়া গেল ; আমাদের পক্ষেই জয় হইল। এক্ষণে প্রার্থনা, প্রভু তাঁহার সমাধি আশ্রমকে নির্ব্বিঘ্ন করিয়া রাখুন যেন ভক্তগণ তথায় যাইয়া শমগুণপ্রধান ঋষিগণের আশ্রমপদলভ্য শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

সমাপ্ত।